

কৃষ্ণচূড়া

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো



দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৭৩

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৭২

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :

বিভূতিভূষণ রায়

বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩৫-এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

অজিত গুপ্ত

ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ডাক্তার শ্রীসোমেন্দ্রকুমার ঘোষ

অনুজপ্রতিমেষু

॥ এক ॥

প্রকাশক বন্ধু বললেন, আমি বলছি আপনি যান। আপনার ভালো লাগবে।

—নির্জন ?

—একেবারে।

—কেউ এসে বিরক্ত করবে না ?

—দিনের বেলায় অন্তত নয়।

—তা হলে রাতের বেলায় নাকি ? —কিরণ চমকে উঠল : ডাকাত পড়বে ?

প্রকাশক হাসলেন : কুড়ি বছরের ভেতর ওদিকটায় কোনো চুরি-ডাকাতি হয়েছে বলে শুনি নি। সেজন্যে নয়। তবে নির্জন বাড়িতে মশাই যদি রাত দুপুরে ভূতের উপদ্রব সুরু হয়, সেজন্যে আমি দায়ী নই।

—তবে কি একটা ভূতুড়ে বাড়িতে পাঠাচ্ছেন আমাকে ?

—না-না, তা-ও নয়। কিন্তু মাঝরাতে আপনাকে একা পেয়ে হঠাৎ যদি কেউ—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কিরণ বললে, এসেই পড়ে, তা হলে ভালো করে আলাপ করা যাবে। পরলোক সম্পর্কে আমার প্রচুর কৌতূহল আছে।

চা এসেছিল। এক পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে প্রকাশক বললেন, আর বেশ একটা ভূতুড়ে উপন্যাস লিখে ফেলবেন। কন্ট্রাক্ট করা যাক,—অ্যাডভান্স দিচ্ছি, বইটা আমাকেই দেবেন।

আসবার সময় স্টেশনের কাছাকাছি কিছু সাজানো বাড়িঘর চোখে পড়েছিল বটে, কিন্তু লোকজন বড়ো কেউ আছে বলে মনে হয় নি। চেঞ্জারের জায়গা। এক সময় অনেকে হয়তো আসতেন হজমের গোলমাল সারিয়ে নেবার আশায়, কিংবা সস্তা দুধ-মুরগীর সন্ধানে। কিন্তু সে-সব দিন আর নেই। মুরগীর দাম বেড়েছে, দুধে জল বেড়েছে। তা ছাড়া যে বাঙালী এক সময় সাঁওতাল পরগণার সীমায় পা দিয়েই অনেক দূর পশ্চিমে চলে আসা হয়েছে বলে বিশ্বাস করত, তারাও আর নেই; এখন বাঙালী চেঞ্জারের বেড়ানোর পরিধি আলমোড়া থেকে উটকামণ্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। নিতান্তই পেন্‌শন-পাওয়া বুড়ো মানুষ ছাড়া কলকাতার অতি কাছে এই সাঁওতাল পরগণা কারো আর চোখেই পড়ে না—ঝড়ের মতো উড়ে-চলা মেল ট্রেনের জানলা দিয়ে ছোট স্টেশনের দু-তিনটি আলো বদ্‌বুদের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়।

সুতরাং কিরণের মনে হল, নিজেকে নিয়ে চমৎকার থাকা যাবে এখানে। বন্ধু নেই, আড্ডা নেই, সাহিত্যচর্চা নেই, দশজন সাহিত্যিক একসঙ্গে জড়ো হয়ে পরনিন্দাও নেই। বারান্দায় দুটো ডেক চেয়ার পাতা ছিল, তারই একটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে কিরণ খুশি হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে রইল সেদিকেই যেখানে কৃষ্ণচূড়ার আরক্তিম আনন্দের উচ্ছ্বাস নির্মল আকাশের দিকে অঞ্জলি তুলে ধরেছে।

কৃষ্ণচূড়া।

তার ছেলেবেলার ফুল। দূর উত্তর বাংলার গ্রামে তাদের সেই ছোট বাড়িটি। দরজার সামনেই মস্ত একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। কতদিন সকালে সেই গাছটার নীচে মাদুর পেতে তারা পড়তে বসত, সে আর তার ছোট বোন সবিতা। সবিতা স্লেটের ওপর গোটা কয়েক ‘বল’ ‘চল’, ‘কর’ লিখেই পেন্‌সিল চুষতে থাকত, তারপর ঘাসের ভেতরে সোনা পোকা খুঁজত। আর দুলে দুলে

'এ বিগ ফিগ', 'এ ক্যাট অন দি ম্যাট' পড়তে পড়তে কিরণ ধমক দিত : 'এই লিখছিস না ?'

'লিখছি তো'

'লিখছি তো ! পেন্‌সিল মুখে পুরে দিয়ে খুব লেখাপড়া হচ্ছে তোর ! হয় লেখ্‌—নইলে উঠে যা এখান থেকে।'

'বা-রে, কেন উঠব ? আমিও তো পড়ছি।'

'ছাই করছিস ! উঠে যা এখান থেকে, নইলে চড় মারব একটা।'

মারবার দরকার হত না। তার আগেই চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠত সবিতা : 'মা—দাদা আমাকে মারছে।'

মা দেখা দিতেন দোরগোড়ায়।

'কী হচ্ছে খোকন ? আবার হাত তুলেছিস ওর গায়ে ?'

'কখন হাত তুললাম ? কী লক্ষ্মীছাড়া এই মিথ্যুক মেয়েটা।'

'তুমি যে বললে, চড় মারবে ?'

'মেরেছি নাকি ?'

মা হেসে ফেলতেন : 'থাক, গোলমালে দরকার নেই। উঠে আয় বুলু—তোকে পড়তে হবে এখানে।'

বুলু সবিতার ডাকনাম। স্লেট-পেন্‌সিল নিয়ে উঠে যাবার সময় ভেংচি কেটে যেত দাদাকে। কিরণ লাফিয়ে উঠবার উপক্রম করত, কিন্তু তার আগেই মা-র নিরাপদ আঁচলের ছায়ায় বুলু বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'এ ডগ র‍্যান এ রেস'। 'এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন—'

একটু পরেই বুলু বেরিয়ে আসত আঙুল চাটতে চাটতে। মন-মেজাজ ভারী খুশি। স্লাই ফক্সের কথা ভুলে গিয়ে কিরণ উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করত 'এই—কী খাচ্ছিস রে ?'

গম্ভীর হয়ে বুলু বলত, 'আমের আচার।'

'আমাকে দিবি ?'

'আর বকবে না আমাকে ?'

'কক্ষণো না।'

সন্ধি হয়ে যেত। সেই মাহুরে বসে আচার খেত ভাইবোনে, বক বক করে গল্প করত, আশে পাশে শালিক নেচে বেড়াত আর দু-জনের মাথায় টুপটাপ করে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি ঝরে পড়ত।

বুলুর বিয়ে হল কিরণ যখন ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারের ছাত্র। মোটর দুখানা দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচেই। কান্না উলু আর শাঁখের শব্দের ভেতর দিয়ে বুলু যখন মোটরে গিয়ে উঠল, তখনো তার গায়ে কৃষ্ণচূড়ায় ক'টা পাপড়ি ঝরেছিল—সে-কথা কিরণের আজও মনে আছে।

ঠাকুরমাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তাঁর নামাবলীর ওপর দু-তিনটি ফুল পড়েছিল। আর—

আর সেই বিকেল। পশ্চিমের আকাশ জুড়ে কালবৈশাখী মেঘ ডানা মেলেছে। হাওয়া উঠল তারপর, দেখা দিলে ধুলোর ঘূর্ণি, রাশি রাশি শুকনো পাতা উড়ল আর হাওয়ার ঝাপটায় পাগলের মত হাহাকার করে কৃষ্ণচূড়া গাছটা যেন তার সব কিছু একসঙ্গে উজাড় করে দিতে চাইল।

এখন আর ফুল ঝরছে না—একটা লাল ঝড় বয়ে চলেছে, ফুলের ঝড়ে। তার ভেতরে জ্যোৎস্না যে কেমন করে তার বুকের ভেতরে এসে পড়ল সে-কথা আজ আর মনে পড়ে না।

'জ্যোৎস্না, তোমাকে আমি ভালোবাসি। তুমি?'

'আমিও বাসি। ছাড়ো—ছাড়ো—কেউ এসে পড়বে—'

সেই ফুলের ঝড়ের ভেতরে ডুরে শাড়িপরা কিশোরী মেয়েটি হারিয়ে গেল।

হারিয়েই গেছে। সে বাড়ি এখন পাকিস্তানে। জ্যোৎস্না যে কোথায়—কোন ভাগ্য যে তাকে কত দূরে নিয়ে গেছে, সে কথার উত্তরই বা কে দেবে! শুধু জানতে ইচ্ছে করে, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা এখনো আছে কি না, এখনো বসন্তের হাওয়ায় হাওয়ায়

আগুনের শিখার মতো তার পাতায় পাতায় ফুল জ্বলে ওঠে কি না, এখনো এক-একটা চৈতালি বাতাসের ঝাপটায় তার ফুলগুলো লাল ঝড়ের মতো বয়ে যায় কি না।

কৃষ্ণচূড়া!

স্বপ্নেভরা ছেলেবেলা, বিয়ের সানাই, মৃত্যু, প্রেম। কিরণের সব দিগন্তগুলোকে ঘিরে যেন কৃষ্ণচূড়ার একটা বৃত্ত দাঁড়িয়ে আছে। যেন মাথার ওপর রক্তাক্ত ফেনা নিয়ে তার চারদিক ঘিরে একটা সবুজের ঘূর্ণি ঘুরছে, ঠিক একদল সাঁওতাল মেয়ে খোঁপায় কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী সাজিয়ে নাচের তালে তালে প্রদক্ষিণ করছে তাকে।

কিরণের ধ্যান ভাঙল।

বাড়ির মালী শম্ভু ডাকল, বাবু!

—কি হে?

—চা দিয়েছি।

কখন সামনে একটা টিপয় এনে দিয়েছে, সাজিয়ে দিয়েছে চা আর জলখাবার। কৃতজ্ঞ হয়ে কিরণ খাবারের থালাটা হাতে তুলে নিলে।

—কী খাবেন বাবু এ বেলায়?

—তোমার যা খুশি রান্না করো।

শম্ভু মাথা চুলকোল। বললে, তা হলে স্টেশনের কাছ থেকে তো কিছু বাজার করে আনতে হয়। যাবেন আপনি?

—পরে হবে। আজ তুমিই যাও, যা হয় কিনে আনো।

পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে দিয়ে শম্ভুকে বিদায় করল।

চা খাওয়া হলে আর বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। নেমে এল বারান্দা থেকে, গেট পার হল, সবুজ ঘাসের ভেতর দিয়ে পা ফেলে ফেলে গিয়ে হাজির হল সেখানে—যেখানে তার ছেলেবেলার

রকম জায়গায় এমন একটি চোরের আশঙ্কা মনেও ছিল না। এখন দয়া করে যদি ডায়েরীটা ফেরৎ দেন—

কুকুরের মুখ থেকে ভদ্রমহিলা এর আগেই ডায়েরীখানা উদ্ধার করেছিলেন। কিরণের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন, কিছু মনে করবেন না। সব সময় এদিক-সেদিক থেকে এটা-ওটা কুড়িয়ে এনে কুকুরটার এমনি বদ্ অভ্যেস হয়ে গেছে, যে শেষে আমাদের পর্যন্ত চোর বানিয়ে ছাড়ল!

ছোট মেয়েটি বললে, পরশু আবার কোত্থেকে একটা ছেঁড়া জুতো মুখে করে এনে বাবার ইজি-চেয়াবের ওপর রেখে দিয়েছিল। বাবা দারুণ চটে গিয়ে—

সবাই হেসে উঠল আবার, কিরণও বাদ গেল না। আসামী কুকুরটা কী ভেবে খুশি হয়ে খানিকক্ষণ ল্যাজ নাড়ল, তারপর কিরণের গা শোঁকবার জন্যে এগিয়ে এল।

কিরণ চমকে তিন পা পিছিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

কিশোর ছেলেটি অভয় দিয়ে বললে, ও কাউকে কামড়ায় না।

—কামড়াবার কথা ভাবছি না, কিন্তু পকেট মারতে পারে তো?

আরো একবার হাসির ঢেউ ভাঙল। ছেলেটি কুকুরটাকে ছোট্ট একটা চড় কষিয়ে বললে, এই ডগলাস—শুনছিস? তোর জন্যে আমাদের কী দারুণ বদনাম হয়ে যাচ্ছে?

—ওর নাম ডগলাস নাকি?

মেয়েদের ভেতরে বড়টি জবাব দিলে বাবা, নাম দিয়েছেন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্। কুকুরকে অত বড়ো নামে ডাকা যায় নাকি? আমরা তাই ছোট করে বলি—ডগলাস।

কিরণ বললে, কিন্তু নামটা সার্থক। থিফ্ অব বাগদাদ মনে পড়িয়ে দেয়।

ছেলেমেয়েরা রসিকতাটা বুঝতে পারল না, কিন্তু ভদ্রমহিলা

মৃদু হাসলেন। বললেন, আপনাকে অনর্থক ডিসটার্ব করা হল—, কিছু মনে করবেন না। আর পারেন তো অবোলা জীব কুকুরটাকে ক্ষমা করবেন।

—কুকুর অবোলা জীব?—কিরণ হাসল: বলেন কি! আমাদের পাড়ার কুকুরগুলোর চিৎকারে তো রাতে ঘুমুনো যায় না! তা ছাড়া ডগলাসের ওপর রাগই বা করব কেন, ওই তো আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।

ভদ্রমহিলা বললেন, আলাপ আর কোথায় হল, আপনি আমাদের চেনেন না। আর আপনিও তো এখানে নতুন।

—একেবারে নতুন। আজই ভোর রাতে এসে পোঁচেছি।

—কোথায় উঠেছেন? রজনীবাবুর বাংলোতে?

—কী করে জানলেন?

—এদিকে তো এ ছাড়া আর কোনো বাড়ী নেই। আর স্টেশনের কাছে কোথাও উঠলে আগেই আমরা জানতে পারতুম। আমাদের এখানে লোকজন খুব কম, কাজেই কারো বাড়িতে গেস্ট এলে তিন দিন আগে থেকেই খবর পাই আমরা।

—আপনারা—

—স্টেশন থেকে বেরিয়েই ডান দিকে বাড়িটা। সামনে ঢেউ তোলা প্রাচীর, বাগানে তিনটে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছ আছে। ডাক্তার এ কে রায়চৌধুরীর বাড়ি। এরা তাঁরই ছেলেমেয়ে—বাসব, লেখা আর কেকা। —ছোট মেয়েটির মাথার লাল রিবনটি আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে খেলা করতে করতে ভদ্রমহিলা বললেন, আর আমি এদের কাকিমা। শর্মিলা।

শর্মিলা! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কিরণ তাকিয়ে দেখল শর্মিলার দিকে। একটা সময়ের পরে মেয়েদের বয়েস আন্দাজ করা শক্ত, তবু মনে হল সাতাশ-আটাশের বেশি নয়। আর চোখে পড়ল পরণে সাদা

জরিপাড় শাড়ি, পায়ে সাদা জুতো, বাঁয়ের মণিবন্ধে একটি সোনালী ঘড়ি ছাড়া শাদা হাতদুটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ, কুমারীর মত সাদা সিঁথি। অনুমান করতে দেরী হল না—শর্মিলা বিধবা।

ছোট একটা ধাক্কা লাগল মনের ভেতরে, সকালের হাওয়ায় এমন করে রং ছড়ানো কৃষ্ণচূড়ার পটভূমিতে এই মেয়েটির শুভ্র-বৈধব্য কোথায় যেন তার কাটল। কিরণ সহজ হয়ে পরক্ষণেই বললে, নমস্কার। আমার নাম কিরণ বসু।

—কিরণ বসু? —চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল শর্মিলার: যিনি লেখেন?

—অকীর্তি খানকতক আছে বটে। কিন্তু আপনারাও খবর রাখেন সে আশা করিনি।

শর্মিলা হাসলেন: বলেন কি! আপনি রীতিমত নামকরা লেখক—খবর রাখব না? আমরাই তো আপনাদের বই পড়ি।

—শুনে আশ্বস্ত হবো কিনা বুঝতে পারছি না।—কিরণ আবার শর্মিলার মুখের দিকে তাকালো, চোখের দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল মাথার উজ্জ্বল শাদা সিঁথিটার ওপর। আস্তে আস্তে বললে, পাঠক-পাঠিকার মুখোমুখি না পড়াটাই লেখকের পক্ষে নিরাপদ। বই পড়ে তাঁরা যা বলেন সেটা কানে শুনতে পাই না বলেই সুখে থাকি, কিন্তু একেবারেই সামনা-সামনি—

শর্মিলা এবার শব্দ করে হেসে উঠলেন।

—আশ্চর্য বিনয় আপনার। আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম ছিল। একবার পুরীতে একজন লেখকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর কোন্ কোন্ বই আমি পড়েছি—তাঁর লেখা আমার ভালো লাগে কি না, কতখানিই বা ভালো লাগে।

—ওঁরা ভালো লেখেন তাই আত্মবিশ্বাস আছে।

—আপনি বুঝি ভালো লেখেন না?

—একেবারেই না। বই ছাপা হয়ে বেরুলেই আমার কান্না পায়। আর সেটা দ্বিতীয়বার পড়তে গেলেই মনে হয়—এমন একটা বাজে বই লেখবার অর্থ কী, আর লোকেই বা সেটা পয়সা খরচ করে পড়তেই বা যাবে কেন?

শর্মিলা প্রসন্ন মুখে বললেন, আপনার বই সম্পর্কে আপনার সঙ্গে পাঠকদের মতভেদ আছে। কিন্তু আপনিও কি নিজের থিয়োরী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন? তা হলে পর পর বই লিখে যান কী করে?

—ওইটেই তো কন্ট্রাডিকশান। বই লিখে খারাপ লাগে—আবার বই লেখার লোভও সামলাতে পারি না। কী করা যায় বলুন তো?

—কিছু করতে হবে না, আপনি বই-ই লিখুন।

বাসব লুকিয়ে নভেল পড়তে শিখেছে। কিরণের বইও না পড়েছে তা নয়। কান পেতে সে আলোচনা শুনছিল। কিন্তু মেয়ে দুটি অধৈর্য হয়ে উঠল। কেকা বললে, কাকিমা, যাবেন না?

কিরণ বললে, ঠিক কথা। মাঠে দাঁড়িয়ে এ-ভাবে গল্প হয় না। যদি সময় থাকে, আমার বাংলোতে বরং কিছুক্ষণ বসবেন চলুন। যদিও আমার সবেধন নীলমণি শ্রীমান শঙ্কুকে আপাতত বাজারে পাঠিয়েছি, কিন্তু আপনাদের এক পেয়ালা চা করে আমি খাওয়াতে পারব।

—কেন, মিসেস বসু সঙ্গে আসেন নি?

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল কিরণ। সে নেপথ্য-যন্ত্রণাটাকে সব সময়ে ভুলে যেতে চায়—চকিতের জন্যে সেটা চেতনার উপর বিদ্যুৎ হানল। মাঠের ওপর দিয়ে ঢেউ তুলে বাতাস বয়ে গেল, কৃষ্ণচূড়ার বীথি থেকে হরিয়ালের ডাক কানে এল, গাঢ় লালের সঙ্গে হলুদ মেশানো কয়েকটা ঝরা পাপড়ি উড়ে এল এদিকে।

তারপর কিরণ বললে, না।

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যে একটা ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, শর্মিলা সেটা বুঝতে পারলেন। অল্প একটু হেসে, সব সহজ করে নিয়ে বললেন, তা হলে ফাঁকা বাড়ির আতিথ্য নিয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে আজ সন্ধ্যায় আপনিই বরং আসুন না আমাদের এখানে। চা খাবেন। ডক্টর রায় চৌধুরী এক সময়ে কবিতা লিখতেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেও আপনি খুশি হবেন।

—দেখি।

—দেখি নয়, নিশ্চয় আসতে হবে? —শর্মিলা বাসবের দিকে তাকালেন: বাসু, তুমিও রিকোয়েস্ট করো ওঁকে। বড়ো লেখক— সাধাসাধি না করলে আসবেন কেন?

বাসব বললে, আসবেই বইকি। না এলে জোর করে ধরে নিয়ে যাব।

কিরণ বিব্রত হয়ে বললে, আমাকে অত সম্মান করবার দরকার নেই, আমি এমনিতেই যেতে পারি। কিন্তু আজই—

—কোনো কাজ আছে আপনার?

—একটু।

—তা হলে কাল সকালে?

—আচ্ছা, আসব।

নমস্কার-বিনিময়ের পালা শেষ হল, আবার এগিয়ে গেল দলটা। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কিরণ চেয়ে রইল সেদিকে। শর্মিলার শাদা শাড়ির জরি-পাড়টা রোদে চিকচিক করছে, খুব সম্ভব কুকুরটার ডায়েরী চুরির ব্যাপারটা নিয়ে হেসে উঠছে বাসব আর লেখা, ডগলাস কেকার চারদিকে একবার পাক খেয়ে দৌড়ে গেল সামনের দিকে, কেকা ছুটল তার পেছন পেছন। একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিরণ—ধীরে ধীরে আবার সেই তিনটি কৃষ্ণচূড়ার তলায়— সেই লাল মাটি ঢিবির সিংহাসনে এসে বসে পড়ল। মাথার ওপর ডেকে চলল হরিয়াল, তার সর্বাঙ্গে ফুল ঝরতে লাগল।

নীল ডায়েরীটার পাতা খুলল একবার। আজকের এই ঘটনাটুকু লিখে ফেলা যাক।

তারপরেই মনে হল, কী হবে লিখে?

এই সকালে, এই ঘাস-পাহাড়-হাওয়া আর কৃষ্ণচূড়ার ভেতরে এই যে ছোট্ট ব্যাপারটুকু ঘটল—এর কি এমন কোনো রূপ আছে যাকে কথা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যায়? এ একটা রঙের ছোপের মতো, ঘন মেঘের পর্দা ছিঁড়ে মাটিতে হঠাৎ ঝরে পড়া খানিক আলোর মতো, চলন্ত ট্রেনে দেখা কোনো নববধূর মুখ থেকে হঠাৎ চেলির ঘোমটাটি সরে যাওয়ার মতো। ডায়েরী লেখা যায় না, স্বরলিপি সাজানো চলে; কথা গোছানো যায় না—ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে, আর সেই ছবিতে ব্রাশের টানগুলো যেন ফ্রেমের সীমা ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে চায়।

এখানে সবাই যেন নিজেকে ছাড়িয়েছে। দূরের পাহাড় যেন ঢেউ তুলতে তুলতে পৃথিবী পার হয়ে চলে গেছে, এই মাঠটাকে মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত তৃণভূমির শেষ প্রান্তে পৌঁছে কোনো মেরুর তুষার রেখায় গিয়ে নিস্তব্ধ হয়েছে, এই কৃষ্ণচূড়ার বীথি সময়ের সীমা ছাড়িয়ে স্মৃতির দিগ্বলয়ে বিলীন। এরই মাঝখানে আজকের এই ছবি, এই রঙ, এই আলোটা এল। এ তার লেখার মধ্যে ধরা দেবে না।

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া: এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তো সব কিছু। যাওয়া যায় ছাড়িয়ে? ছেলেবেলায় একদা কবিতা লিখত কিরণ, অনেক দিন সে-সব কোথায় মুছে গেছে, তবু দুটো-একটা লাইন মনের ভেতরে ধরা পড়ে আছে এখনো।

আকাশ ভাবে আপনাকে সে ছাড়িয়ে চলে যাবে
হাঁসের মতো মেলবে ডানা দিগন্তরের পারে—
মেঘের মুঠি বাড়িয়ে সে কোন্ বজ্র-মাণিক পাবে
বুকের তিমির উঠবে জ্বলে আগুন উপচারে—
আকাশের স্বপ্ন। বজ্র-মাণিকের আকৃতি।

আর তখনি মনে এল শর্মিলার কথা : মিসেস বসু আসেন নি ?

মিসেস বসু। প্রতিমা। হৃৎপিণ্ড কুঁকড়ে এল কিরণের। নেপথ্য-যন্ত্রণার ওপর থেকে আবরণটা সরে গেল।

একটা দড়ি দিয়েবারান্দার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে প্রতিমাকে। মাথার চুল উড়ছে ঝড়ের মেঘের মতো। ধারালো নখ দিয়ে পরণের শাড়িটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে—ফেনা পড়ছে মুখের পাশ দিয়ে, বিকৃত বীভৎস গলায় চিৎকার করতে করতে বলছে, 'জানি, জানি, তোমরা সবাই মিলে আমাকে বিষ খাওয়াতে চাও।'

প্রতিমা পাগল।

॥ তিন ॥

গ্যারেজে গাড়িটা নেই, তার মানে ডাক্তার রায়চৌধুরী বেরিয়ে গেছেন। দলটা দুপদাপ করতে করতে লনে ঢুকে পড়ল। বড়ো হলটিতে তখন মেজের ওপর একরাশ গরম কাপড় ছড়িয়ে বসেছেন কল্যাণী, শীত চলে গেছে, এবার এগুলো ধুতে পাঠাবেন হাজারীবাগে।

শর্মিলা হেসে বললেন, শাল-রিপেয়ারিঙের দোকান খুলেছ না কি দিদি ?

কল্যাণী বললেন, অবস্থাটা সেই রকমই বটে। কাল এ-গুলো ধুতে পাঠাব। তোর দেবার আছে কিছু ?

—না। আমি তোমায় সাহায্য করব দিদি ?

—দরকার নেই। তুই বোস আমার কাছে।

একটা চামড়াবাঁধানো মোড়া টেনে নিয়ে শর্মিলা কল্যাণীর পাশে বসে পড়লেন।

কল্যাণী বললেন, কাণ্ডটি দ্যাখ্ একবার। তোর দাদার ট্রাউ-জারের পকেট থেকে এই চাবিটা বেরুল। অথচ সেদিন এই চাবি নিয়ে কী তুলকালামই না বাধালেন।

—কিসের চাবি ?

—কিসের আবার ? ওঁরই একটা আলমারীর। কোথাও খুঁজে পেলেন না—বাড়িশুদ্ধ সকলকে বকুনি। চাবিওলাও পাওয়া গেল না, শেষে তালা ভাঙতে হল। সেই চাবি রেখে দিয়েছেন এই ট্রাউজারটার পকেটে। সেই সঙ্গে দুটো দশ টাকার নোটও পেলুম।

শর্মিলা বললেন, ডবল লাভ দিদি। চাবিটা দেখিয়ে এবার গালাগালির শোধ নিতে পারবে ভালো করে, আর নোট দুটো তোমার অনেস্ট ইনকাম—দাদার কোনো দাবীই নেই।

বিরক্ত হয়ে কল্যাণী বললেন, তুই আর জ্বালাস নি। এদিকে দ্যাখ, বাস্তুর কীর্তি। কলকাতায় গিয়ে কতগুলো স্ট্যাম্প কিনে এনেছিল—সেগুলো হারিয়ে ফেলে তিন দিন ধরে সমান দাপাদাপি। এই সার্টটার পকেটে পাওয়া গেল। এদিকে কেকার কোটের পকেটে আধ খাওয়া লজেন্স্ আঠা হয়ে আটকে রয়েছে। পোকায় যে কেটে দেয় নি এত দিনে, এই ভাগ্যি। বলতো, এদের নিয়ে আমি কী করি ?

শর্মিলা হেসে উঠলেন, বললেন, তোমার কিন্তু কম্প্লেন করা উচিত নয়, দিদি। দাদা বোধ হয় ইচ্ছে করেই কমপেনসেশন হিসেবে দুখানা দশ টাকার নোট রেখে দিয়েছেন পকেটে।

কল্যাণী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই তাঁকে থেমে যেতে হল। বাইরে ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ লাফালাফি করছিল, কলধ্বনি, শোনা যাচ্ছিল তাদের, এইবার হলঘরে বাসবের আবির্ভাব ঘটল। ডগ্‌লাসের বক্‌লস ধরে সে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এসেছে সেই সঙ্গে মুখে আউড়ে যাচ্ছে স্বরচিত ছড়া :

ডগ্‌লাস দি ডগ

ওয়েন্ট টু ক্যাচ্ এ ফ্রগ

বাট্ ইট ভ্যানিশ্‌ড্ ইন এ বগ

হা-হা-হা—লাফড্ এ হগ—

কল্যাণী চেঁচিয়ে উঠলেন, আবার কুকুর এনে ঢোকালি এ ঘরে ? এখুনি কাপড়-জামার ওপর এসে পড়ে সব ছত্রাকার করে দেবে। দু চক্ষে দেখতে পারি না লক্ষীছাড়া কুকুরকে। বাম্ভু, শীগগির বের করে দে ওটাকে।

বাম্ভু গম্ভীর হয়ে বললে, ডগলাস, মাম্মি ইজ অ্যাংগ্রি। গো আউট।

ডগলাস কী বুঝল কে জানে, এক লাফে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কল্যাণী বললেন, এ এক আচ্ছা কুকুর বাপু! শুনেছিলুম অ্যাল্‌সেশিয়ান ওয়ানম্যান-ডগ—মনিব ছাড়া কাউকে মানে না, ভারভাত্তিক হয়। কিন্তু এ হতচ্ছাড়া নেড়ি কুত্তার ওপরেও এক কাঠি! যাকে দেখছে কাছে গিয়ে ল্যাজ নাড়ছে, রান্নাঘরের আশপাশে ছোঁক-ছোঁক করছে রাত দিন, আর হাড় লুকিয়ে লুকিয়ে উঠোনে লনে একরাশ কুয়ো খুড়ে ফেলল।

বাম্ভু হেসে উঠল, শর্মিলা হাসলেন। বাম্ভু বললে, ডগলাসের আজকের অ্যাচিভমেণ্ট কিন্তু সকলের ওপর। যাকে বলে একেবারে দিনে-দুপুরে ডাকাতি।

কল্যাণী ভ্রু কুঁচকে বললেন, তার মানে ?

—কাকিমা, মা-কে বলেন নি এখনো ?

শর্মিলার মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। মৃদু গলায় বললেন, সে একটা বিশ্রী কাণ্ড। এক ভদ্রলোকের একটা ডায়েরী চুরি করে এনেছিল।

—সে কি! কার ডায়েরী চুরি করল আবার ?

বাম্ভুর উৎসাহ বেড়ে উঠল: কাকিমা ভালো করে বলতে পারেন নি মা, আমি বলছি শোনো। মাঠের দিকটাতে ফাঁকা জায়গায় একটা বাংলো আছে না? সেই যে রাজেনবাবু, এখানে এলে বাবার কাছে ওষুধ-টষুধ নিতে আসেন? তাঁর সেই বাংলোয়

উঠেছেন একজন নামজাদা লেখক—কিরণ বসু। ভদ্রলোক সকালবেলা বেশ মশগুল হয়ে মাঠের ভেতরে গাছতলায় বসে কিছু একটা প্লট-ফ্লট ভাবছিলেন—আর ডায়েরীতে বোধ হয় নোট করছিলেন। হঠাৎ ডগলাস ছুটে গিয়ে তাঁর ডায়েরীটা মুখে করে—

কল্যাণী ব্যাকুল হয়ে বললেন, আমি আগেই জানতুম, একদিন লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটা কোথাও একটা কেলেঙ্কারী করবে। তা কী হল? ছিঁড়ে টিড়ে দেয় নি তো?

—না ছেঁড়ে নি। একটা দাঁতের আঁচড়ও পড়ে নি কোথাও। জানো মা, ডগলাস খুব কনসিডারেট আর তেমনি ইণ্টেলিজেণ্ট।

কল্যাণী ধমকে বললেন, হয়েছে, থাম। ছি-ছি, কী-ভাবলেন ভদ্রলোক?

বাসু বললে, কিছুই ভাবেন নি মা, খুব ভালো মানুষ। আমাদের সঙ্গে গল্পও করলেন একটু। আর জানো মা—আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের এখানে চা খেতে আসবেন। আমিও ঠিক করেছি, আমার অটোগ্রাফের খাতায় ওঁকে দিয়ে একটা কবিতা লিখিয়ে নেব।

বাসুর শেষ কথাটা কল্যাণী শুনতে পেলেন না। তার আগেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে শর্মিলার দিকে তাকালেন।

—সত্যিই চা খেতে আসবেন না কি ভদ্রলোক?

শর্মিলা চোখ নামালেন। আবার একটুখানি লালের ছোপ পড়ল তাঁর গালে।

—আমি নেমন্তন্ন করে ফেলেছি দিদি। কুকুর দিয়ে চুরি করানো যে আমাদের পেশা নয়, আসলে যে লোক আমরা ভালোই —এটাও ওঁকে বোঝাবার ছিল। অন্যায় হয়ে গেছে না কি?

কল্যাণী বললেন, না-না, অন্যায় আবার কী! ভদ্রলোক আসবেন, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু কী নাম বললি—কিরণ বসু?

নিউরোটিক—স্বামীর জীবনটাকে একেবারে অসহ্য করে তুলেছে। আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক মেয়েদের একেবারে শ্রদ্ধা করেন না।

শর্মিলা হাসলেন: কিন্তু দেখে শুনে তো সে-রকম বোধ হল না।

—কী আশ্চর্য, তোর সঙ্গে প্রথম আলাপের ঝগড়া শুরু করবে না কি? তা ছাড়া লেখকদের এমনিতে কিচ্ছু বোঝাও যায় না। বাইরে থেকে বেশ পরিপাটি, ছিমছাম, সাজানো ভালো ভালো কথা। কিন্তু কলম হাতে নিয়ে বসলেই ওদের মনের আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসে।

—লেখকদের তুমি এত চিনলে কী করে?—শর্মিলার মুখে হাসিটুকু লেগেই রইল: দস্তুরমতো গবেষণা করেছ বলে মনে হচ্ছে আমার।

—গবেষণার দরকার হয় না। পড়লেই বোঝা যায়।

—তা হবে। কিন্তু আমি তো সায়েন্সের ছাত্রী, এত কথা আমার মাথায় ঢোকে না।

ভেতরের দরজা দিয়ে ঠাকুর গলা বাড়ালো: মা!

—কী হল?

—মাছ-রান্নাটা দেখিয়ে দেবেন বলেছিলেন।

—সবাই মিলে পাগল করে তুলল!—কল্যাণী কাপড়ের ডাঁই সরিয়ে রেখে উঠে গেলেন শর্মিলা, ধীরে ধীরে চলে এলেন নিজের ঘরটিতে।

কাপড় বদলাতে যাচ্ছিলেন, তার আগে শেল্‌ফের দিকে চোখ পড়ল। কী আশ্চর্য যোগাযোগ, যেন আজকের দিনটিতেই বইখানাকে কে একেবারে সামনে এগিয়ে রেখেছে: 'ছায়াঘন দিন'—'কিরণ বসু'। আর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল বইটি পেয়েছিলেন তাঁর বিয়ের সময়—সাড়ে চার বছর আগে।

বিয়ের সময়। খেলকের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, মাঝপথেই থেমে দাঁড়ালো হাতখানা। বিয়ের তিনমাস পরেই এঞ্জিনীয়ার অমিতাভ চলে গেল ডেট্রয়েটে, স্কলারশিপ নিয়ে। আরো ছ'মাস পরে খবর এল অ্যাট্‌ল্যান্টিকে নিরুদ্দেশে একখানা বিমানে অমিতাভও যাত্রী ছিল। সে বিমানের আজও সন্ধান মেলে নি, অমিতাভেরও না।

একবার দেওয়ালের দিকে চোখ তুললেন শর্মিলা। অমিতাভর ছবি। প্রসন্ন দৃষ্টি জেগে আছে তাঁর দিকে। এই মানুষটাকে পৃথিবীর কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, একথা ভাবাই যায় না। অমিতাভ আবার ফিরে আসবে—এই বিশ্বাসেই এতকাল বুঝি বৈধব্যকে মেনে নিতে পারেন নি শর্মিলা।

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। ডাক্তার রায়চৌধুরী ফিরে এসেছেন।

॥ চার ॥

'প্রথমেই আপনাকে এইজন্যে সাধুবাদ জানানো যাক যে, আপনার বাংলো আমাকে নিরাশ করেনি। যদি আমি ত্রিশ বছর আগেকার বাঙালী কবি হতুম, তা হলে আপনার এই বাংলোতে বসে আমি দৈনিক অন্তত দশটি করে কবিতা লিখতে পারতুম। রঙের অভাব নেই, আলোর কৃপণতা নেই, আকাশটার সীমা কোথাও নেই। আর আপনার বাংলোর সামনেকার কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটি। রোমান্টিক মনকে নেশা ধরিয়ে মাতাল করে দেবার পক্ষে সে একাই যথেষ্ট।

বিকেলে গিয়েছিলুম নদীটার ওদিকে। কী নাম ওর জানি না, আমার কিন্তু নাম দিতে ইচ্ছে করল, মিতালি। রোমান্টিক শোনালো? তা হোক। একা অনেকক্ষণ বসে রইলুম ওখানে।

ঝিঁঝিরা তাদের ঘুম পাড়ানি গান শোনাতে থাকে। রাত ন'টা এখানকার মানুষের মাঝরাত।' নাঃ, মিছিমিছি শম্ভুকে কষ্ট দিয়ে কোনো লাভ নেই।

—আচ্ছা, খাবারের ব্যবস্থা কর, আমি আসছি।

চিঠিটা চাপা দিয়ে রেখে কিরণ উঠে পড়ল।

খাওয়া শেষ করে আরো আধ ঘণ্টা পরে সে এসে বসল বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে। সিগারেট ধরিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে সামনের দিকে। ঘুম তার এখন আসবে না, বারোটার আগে কোনোদিন আসে না।

একটু আগেও দেখেছিল, পশ্চিমের আকাশে একটুকরো রক্তিম বিবর্ণ চাঁদ লেপ্‌টে আছে, কিন্তু এখন আর সেটা নেই, অস্ত গেছে। তারায় ঝক্‌ঝক্ করছে আকাশ, দিকে দিকে তরল অন্ধকারের ঢেউ খেলছে। দূরের পাহাড় সেই অন্ধকারে হারিয়েছে, কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটার অত রং এখন আর দেখবার জো নেই, আরো খানিকটা নিবিড় তমিস্রার রূপ ধরে সে দাঁড়িয়ে। সব মিলে একটা সম্পূর্ণ রাত্রি—একটা অবিমিশ্র অন্ধকার।

'আমি ক্লান্ত—শতজন্মের শ্রান্তির ভার
অমার প্রতিটি রক্তকণাতে, শরীরের
প্রতিটি কোষে
আমার চেতনার অণুপরমাণুতে কি যন্ত্রণার
আর্তি!
দাও আমাকে অন্ধকার—নীবন্ধ্র এবং নিরন্তর
যে অন্ধকারে আদিম আত্মা ছিল মৃত্যুমগ্ন—'

কা'র যেন কয়েকটা কবিতার লাইন—ছাড়া ছাড়া হয়ে মনে এল। আকাশ আর নদী ঘুমিয়ে পড়ল, হারিয়ে গেল; তখন কিরণের যে চিন্তা-চেতনা একটা আদিম অন্ধকারের ভেতর মৃত্যুঞ্জয় মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে—এক মুহূর্তে সে সামনে এসে দাঁড়ালো।

প্রতিমা।

পাগল হয়ে গেছে। থেকে থেকে চিৎকার করে বলে, জানি, তুমি কী চাও। আমাকে বিষ খাইয়ে মারতে পারলেই তুমি বাঁচো, কিন্তু আমি মরব না, কিছুতেই মরব না।

রাঁচীতে রাখা হয়েছিল ছ'বছর। কোনো ফল হয় নি। ফিরিয়ে আনতে হয়েছে।

কেমন করে যে ঘটল তারও কোনো স্পষ্ট উত্তর মেলে না।

প্রতিমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে কোনো ভূমিকা ছিল না। বিয়ে করবার কথাও সে ভাবে নি। তখন স্কুল মাস্টারিটা ছিল, আড্ডা ছিল, যত্র তত্র হৈ হৈ করে বেড়ানো ছিল। বেশ কাটছিল দিনগুলো।

—তোর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

দাদা বয়সে ছু-বছরের বড়ো, বন্ধুর মতো ঠাট্টা-তামাসা চলত। কিরণ বললে, হঠাৎ আমার ওপর এই উপদ্রব কেন? নিজে মাথা মুড়িয়েছ বলেই না কি? আর কেউ ছু-দণ্ড শান্তিতে থাকবে, তা কি তুমি চাও না?

দাদা বললে, অনেক দিন তুমি শান্তিতে কাটিয়েছ। বয়েস নিতান্ত কম হয়নি তোমার।

—এ-যুগে ছাব্বিশ বছরে লোক নাবালক থাকে।

—কেউ কেউ সারা জীবনেও সাবালক হয় না, তার নমুনা হচ্ছিস তুই। বাজে কথা রাখ। সত্যিই বলছি, তোর বিয়ে ঠিক করেছি।

—আমি কি অরক্ষণীয় কন্যা?

—উঁহু, অরক্ষণীয় পাত্র।—দাদা মাথা নাড়ল: সত্যি, মেয়েটি সত্যি, মেয়েটি ভালো রে! তোর বৌদি দেখে এসেছে।

—তাই বলো, সবটাই হার ম্যাজেস্টিজ ভয়েস—তুমি কেবল দূত মাত্র।

দাদা মিটি মিটি হাসল।

—মেয়েটিকে দেখবি? গ্রাজুয়েট, চমৎকার চেহারা, বাড়ি ইস্টবেঙ্গলে ছিল, এখন—

—তোমাকে কিছু বলতে হবে না দাদা, আমি বোঝাপড়া করব বৌদির সঙ্গে। শনিবারে বাড়ি যাচ্ছি।

কিন্তু শনিবারে বাড়ি গিয়েও বিশেষ সুবিধে হল না। বৌদি উকিলের মেয়ে—আধঘণ্টার ভেতরে কিরণকে বিধ্বস্ত করে ফেললেন। রবিবারে শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরবার সময় রেল-লাইনের ধারে জোনাকিজ্বলা অন্ধকার ঝোপ-ঝাড়ের দিকে চোখ মেলে রেখে চলন্ত গাড়ির চাকার একটানা আওয়াজ শুনতে শুনতে মনে হল, মন্দ কী, জীবনে আসুক না একটি মেয়ে, তার সমস্ত রহস্য নিয়ে আবির্ভূত হোক, একটি অচেনা-অদেখা মানুষ কেমন করে দেখতে দেখতে দেহে মনে অচ্ছেদ্য একাত্ম হয়ে যায়—চিরকালের সেই পরমাশ্চর্য নাটকে এইবারে পটোন্মোচন হোক।

তারপর প্রতিমা এল।

একটা বছর কাটল যেন ঘুমের মধ্যে। প্রতিটি শনিবারের বিকেল কী প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল! নতুন গল্পে প্রতিমার মুখের ছবি পড়ত, নতুন উপন্যাসে ধরা দিত প্রতিমার মনের ছায়া। আর এই গল্প-উপন্যাসের পথ বেয়েই একটু একটু করে মেঘ ঘনিয়ে এল।

সেই সন্ধ্যাটা মনে পড়ছে। সেই প্রথম।

হঠাৎ প্রতিমা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বিয়ের আগে তুমি অন্য মেয়েকে ভালোবাসতে, তাই না?

সুরটা অন্যরকম ঠেকল। কিরণের একবার মনে পড়ল জ্যোৎস্নাকে—কিন্তু সে তো কিড্ লাভ,—ছেলেমানুষী খেয়াল। তা ছাড়া তো আর—তবে একলা মনে হল কেন প্রতিমার? যে পাণ্ডুলিপিটা কিরণ পড়ে শোনাচ্ছিল, সেটা নামিয়ে রেখে সে

প্রতিমার মুখের দিকে তাকালো। এতক্ষণ একটা টুলের ওপর বসেছিল প্রতিমা, সেখান থেকে উঠে পড়েছে সে, গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানালার পাশে। তার মুখের একপাশে ঘরের আলো, আর দিকে অন্ধকার।

—এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ প্রতিমা?

—বিয়ের আগে থেকেই তো বই লিখছ তুমি। কাউকে ভালো যদি না-ই বাসবে, মেয়েদের মনের এত খবর তুমি পেলে কোথায়?

—কী আশ্চর্য, কল্পনা বলে তো একটা জিনিস আছে। তা-ছাড়া এত মানুষের অভিজ্ঞতা আছে, এত চিন্তা আছে—

—জানি, জানি, আর বলতে হবে না।

আলোচনাটা সেখানেই থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল প্রতিমা!

আর একটা সন্ধ্যা। সেদিন শনিবার। কলকাতা থেকে ফিরে নিজের ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল কিরণ। খাটের তলায় পড়ে-থাকা তার একটা পুরোনো সুট্‌কেস বের করে তা থেকে কী যেন ঘাঁটাঘাঁটি করছে প্রতিমা।

—ও কী করছ?

প্রতিমা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। একটা তীক্ষ্ণ—বাঁকা হাসি ঝক্‌ঝক্ করছে তার ঠোঁটের কোণায়।

—তোমার পুরোনো চিঠিপত্রগুলো দেখছিলুম। আচ্ছা শুক্লা কে?

—শুক্লা!

—পরপর তিনখানা চিঠি দেখছি কি না। ‘আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লেগেছে’, ‘আমি আপনার একজন মুগ্ধ পাঠিকা’, ‘আবার কবে আসবেন আমাদের বাড়ীতে?’ খুব খাতির ছিল, তাই না?—প্রতিমার স্বরে কয়েক বিন্দু বিষ ঝরে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিরণ। প্রথমে হেসে উঠতে

ইচ্ছে করল, তারপর প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত-বিরক্তিতে সমস্ত মন তার অচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আবার কথা বলল প্রতিমাই।

—কী, জবাব দিচ্ছ না যে ?

—জবাব আবার কী দেব ? ও তো তিন বছর আগেকার চিঠি। দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল ফ্যামিলিটার সঙ্গে। ভদ্রলোক প্রফেসার, মেয়েটি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত।

—চমৎকার। একেবারেই আইডিয়াল!—আবার বাঁকা সুতীক্ষ্ণ হাসিতে ভরে উঠল প্রতিমার ঠোঁট : তাছাড়া দার্জিলিং খুব ভালো জায়গা—মেঘ, কুয়াশা, পাহাড়—ভালোবাসার একটা ড্রিমল্যাণ্ড। শুক্লাও দেখতে খুব ভালো ছিল আশা করি ?

সারাদিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত মস্তিষ্কে এবারে বিরক্তির বিদ্যুৎ ছুটে গেল খানিকটা। একটা প্রতিঘাত করবার লোভ কিরণ চেষ্টা করেও সামলাতে পারল না।

—হ্যাঁ, ভালো ছিল বই কি, চমৎকার ছিল দেখতে, তোমার বদলে তাকে বিয়ে করলে অনেক বেশি সুখী হতুম আমি।

—জানি, আমি জানি—বলেই একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চিৎকার করল প্রতিমা। তারপর হঠাৎ দাঁত দিয়ে নিজের শাড়ির আঁচলটাকে সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে আরম্ভ করল।

মেঘের ডাকে কিরণের ধ্যান ভাঙল। প্রতিমা নয়—দেশের বাড়িও নয় ; তার নির্জন বাংলোকে ঘিরে ঘুমন্ত পাহাড়, ঘুমন্ত নদী, ঘুমন্ত কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জ। মাথার ওপর তারাজ্বলা আকাশে কখন সারি সারি মেঘ ঘনিয়েছে—এখন অন্ধকার, ওপরে নীচে এখন কেবল নীরন্ধ্র আদিম রাত্রি।

আবার মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকাল। সেই বিদ্যুতের চমকে চোখে পড়ল বারান্দার কোত্থেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে।

ডগলাস ?

না—ভগলাস নয়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার চিরে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো তার দু-কান ভরে সকালের সেই কলহাসির সুর আবার যেন নতুন করে বেজে উঠল।

॥ পাঁচ ॥

সে কথা ঠিক, এক সময়ে ডাক্তার রায়চৌধুরী কবিতা-টবিতা লিখতেন। অনেকদিন পর্যন্ত বর্ষার মেঘৈর্মেদুর আকাশ তাঁকে কণ্ঠবিশ্লিষ্ট ? বিরহী-বিরহিণীর ব্যথায় আকুল করত, বসন্তে নন্দনের মন্দারমঞ্জরী দুলত তাঁর কবিতায়। অর্থাৎ পেশায় ডাক্তার হয়েও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন—অঞ্জলি পেতে রাখতেন কালিদাসের কাছে।

তারপরে প্র্যাকটিস বাড়ল, বাংলা কবিতায়ও যুগ বদলালো। নতুন কবিতা কিছু কিছু পড়লেন, ভালো লাগল না—বুঝতেও পারলেন না। প্রথমে লজ্জিত হলেন, তারপরে ক্ষুব্ধ হলেন। হাজারীবাগের ছোট একটি সাহিত্য সমিতির সঙ্গে যোগ ছিল, মাঝে মাঝে তাদের অধিবেশনে যেতেন, স্বরচিত কবিতাও পড়তেন। সেখানেই তরুণ কবিদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধল। রায়চৌধুরী বললেন, 'এরা কবি নয়, মেনিনজাইটীসের পেশেন্ট, ডিলিরিয়ম বকছে।' তরুণেরা পালটা জবাব দিলে, 'ডাক্তার রায়চৌধুরী কবিতার চাইতে ডাক্তারীটাই বোঝেন ভালো, তিনি তাঁর ফার্মাকোপিয়া নিয়েই থাকুন—অকারণে আর কবিতার সুস্থ শরীরে সার্জারীর ছুরি চালাবেন না।'

এক কথায় চটাচটি হয়ে গেল। ডাক্তার রায়চৌধুরী মুখ লাল করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কি রবীন্দ্রনাথের ট্রাডিশন ?'

তরুণেরা বললে, 'রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগে ফসিল হয়ে গেছেন—আপনি টেরও পান নি।'

সে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা, রবীন্দ্রনাথ তখনো বেঁচে। রাগে আগুন হয়ে সাহিত্য-সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রায়চৌধুরী। একটু বেশি বয়েসে বিয়ে করেছিলেন, তখনো তিনি ব্যাচেলার, কাজেই হাজারীবাগের বাসায় তাঁকে সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ ছিল না। রাগের মাথায় সারারাত রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লেন, সকালবেলায় নিজের খানসাতেক কবিতার খাতা আহুতি দিলেন আগুনে। গজগজ করে বললেন, 'সেই ভালো, ডাক্তারীই আমি করব।'

কল্যাণী জীবনে এলেন আরো সাত বছর পরে। তখন পশারওলা কৃতী ডাক্তারের জীবনেও আবার অশোকের রঙ লাগল, পলাশের নেশা ধরল। একদিন কল্যাণীকে কবিতা শুনিয়ে চমকে দিলেন।

কল্যাণী বললেন, সত্যি তুমি এত ভালো লেখো? ছাপাও না কেন?

—কে ছাপবে? ছন্দ-মিল অর্থের কবিতা আজকাল ভদ্রসমাজে অচল।

—কে বলেছে? ভালো জিনিস কখনো অচল হয় না।

স্ত্রীকে আদর করে রায়চৌধুরী বললেন, তুমি তো সমালোচক নও, সম্পাদকও নও। তোমার সার্টিফিকেট কেউ মানবে না।

—কিন্তু আমি তো পাঠিকা।

—সেকেলে পাঠিকা। আমিও সেকেলে লেখক। কাজেই আমি কবিতা লিখব, তুমি শুনবে। আমাদের দু-জনের ভেতরে এই চুক্তিটুকুই থাক।

—আমি তোমার কবিতা কাগজে পাঠিয়ে দেব।

—ক্ষেপেছ!

কল্যাণী কথা শোনেন নি। ডাক্তার রায়চৌধুরীকে না জানিয়েই কয়েকটি কবিতা পাঠিয়েছেন কলকাতার নামজাদা পত্রিকাগুলোতে।

রায়চৌধুরীর অনুমান মিথ্যে হয় নি। তার কিছু ফেরৎ এসেছে, বাকীগুলোর কী গতি হয়েছে কেউ জানে না, অন্তত ছাপার হরফে তারা দেখা দেয় নি।

ডাক্তার রায়চৌধুরী কিছুই জানতে পারেন নি, কিন্তু কল্যাণী দুঃখ পেয়েছিলেন। সময়টাই খেলো। কবিতার নামে কতগুলো অর্থহীন প্রলাপ মাসে মাসে ছাপার হরফে দেখা দেয়, কিন্তু সত্যিকারের ভালো কবিতার সমঝদার মেলে না। সম্পাদক তো নয়, একদল অপদার্থ বাংলা সাহিত্যের মুরুব্বির সাজে বসে আছে।

লেখা ছাপা না-ই হল, কল্যাণী স্বামীকে থামতে দেন নি। রায়চৌধুরী এখনো মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন। কোনো সাহিত্য-সভায় তিনি আর যান না, কিন্তু এখানে যে কয়ঘর বাঙালী আছেন, তাঁদের প্রবীণেরা মাঝে মাঝে তাঁর কবিতা শোনেন, তারিফ করে যান এবং কল্যাণী তাঁদের প্রচুর জলখাবার তৈরি করে খাওয়ান। বাইরে থেকে যাঁরা চেঞ্জে আসেন—স্বার্থের খাতিরেই তাঁদের রায়চৌধুরীর কাছে আসতে হয়; ডাক্তার এই সব চেঞ্জারদের কাছ থেকে কখনো ফী নেন না—কবিতা শুনলেই তিনি খুশি হন।

বাসব এসেছে, লেখা এসেছে, কেকা এসেছে। ডাক্তার রায়-চৌধুরী প্রবীণ হয়েছেন, আরো তাঁর পশার বেড়েছে। কবিতার স্রোতটাও ক্ষীণ—বিশেষ লিখতে পারেন না, বলেন, 'যৌবনের লীলাসঙ্গিনী এখন বিদায় নিয়েছে আমার কাছ থেকে।' বাইরের লোককে পুরোনো কবিতাই বেশি পড়ে শোনান। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও বাড়িতে একটা সাহিত্যের আবহাওয়া আছে সব সময় —একটা আলাদা রুচি আছে এই পরিবারের। দু-একখানা নতুন উপন্যাস কেনা হয়, নিয়মিত বই আনানো হয় হাজারীবাগের পাবলিক লাইব্রেরী থেকে।

দু ভাই, এক বোন। রায়চৌধুরী সব চাইতে বড়ো, মাঝখানে বোন, সব চেয়ে ছোট অমিতাভ। বোন এলাহাবাদে ভরা সংসারের

গৃহিণী। ছোট ভাই অমিতাভ এঞ্জিনীয়ার হয়ে ভালো চাকরিও পেয়েছিল। দেখে শুনে একটি মনের মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন রায়চৌধুরী—মেয়েটি এম-এস-সি পাশ করে সায়ান্স কলেজে রিসার্চ করছিল।

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। ডাক্তার রায়চৌধুরীর কবিতার মতোই অর্থ-ছন্দ-মিলে কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না, সমস্ত একটা সুরে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু একটা বছরও কাটল না।

অমিতাভ পড়তে গেল ডেট্রয়টে। সেখান থেকে কী কাজে তাকে যেতে হচ্ছিল কন্টিনেন্ট—রাতের অন্ধকারে কোথায় তার বিমানখানা তলিয়ে গেল অ্যাটলান্টিকের গভীরে—একমাত্র আকাশের তারাই বুঝি সে খবর বলতে পারে!

এক মুহূর্তে ওপর থেকে বজ্র নয়, নীল আকাশটাই ভেঙে পড়ল যেন। বাড়িটা যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে অতলান্ত অবিশ্বাস্য একটা একটা দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে তলিয়ে রইল কয়েক মাস। তখনো ঘরের দেওয়ালে বসুধারার সিঁদূরের বিন্দুগুলো জ্বলজ্বল করছে—ঘিয়ের দাগ তখনো মিলিয়ে যায় নি, বাড়ির পেছনের আবর্জনার ভেতরে তখনো প্রীতিভোজের শুকনো কলাপাতা উড়ছে, তখনো ছড়িয়ে আছে দুটো চারটে মাটির গেলাস।

কুমারীর শাদা সিঁথি নিয়ে, থান পরে শর্মিলা নতুন জীবনে পা দিলেন। অনেক দিন ডুবে রইল নিজের বেদনার শান্ত সমুদ্রে। তারপর একদিন কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতায় যাবি মা-বাবার কাছে?

শান্ত স্তিমিত চোখ তুলে চাইলেন শর্মিলা।

—না। কী হবে?

আবার কান্নার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লেন কল্যাণী। শর্মিলাকে জড়িয়ে রাখলেন বুকের ভেতর, আর শর্মিলার লালচে রুক্ষ চুলের

ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় তাঁর চোখের জল ঝরে যেতে লাগল। শর্মিলা চুপ করে বসে রইলেন।

একটু শান্ত হয়ে কল্যাণী বললেন, এখন তা হলে কী করবি? জীবনটা তো এ ভাবে কাটাতে পারবি না।

শর্মিলা বললেন, আমি একটা চাকরির দরখাস্ত করেছি দিদি। যা কোয়ালিফিকেশন চায়, আমার তা আছে।

—কোথায় চাকরি?

—রাঁচীর একটা কলেজে।

—তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি না তো?

—কোথায় যাব দিদি নিজের বাড়িঘর ছেড়ে?

রাঁচীর কলেজেই কাজ নিলেন শর্মিলা। বছরখানেকের ভেতরে দুঃখ আর শোকের পালা কিছু স্তিমিত হয়ে এল, আরো প্রায় তিন বছর বাদে এখন অমিতাভ রায়চৌধুরী স্মৃতির জগতে জায়গা নিয়েছে। তার জন্মদিনে ছবিতে মালা পরিয়ে দেওয়া হয়—বিমান হারিয়ে যাওয়ার দিনটাকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে সবাই।

শর্মিলার কৃতিত্বই এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি। সকলের আগে তিনি সহজ হয়ে উঠেছেন, পুরোনো আবহাওয়াটাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। কলেজ ছুটি হলেই চলে আসেন, হৈ হৈ করেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে, ডাক্তার রায়চৌধুরীকে সভাপতি করে বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসান। বাসব আর লেখা গান গায়, রায়চৌধুরী কবিতা পড়েন।

এমনিভাবেই চলছিল। এরই মধ্যে এসে পড়ল কিরণ বসু।

ডাক্তার রায়চৌধুরী গাড়ি থেকে নেমেই ডগলাসের অভ্যর্থনা পেলেন। তারপর বাসবই তাঁকে জানিয়ে দিলে: জানো বাবা, সাহিত্যিক কিরণ বসু আমাদের বাড়িতে আসবেন।

রায়চৌধুরী বললেন, তাঁকে আবার কোথায় পেলে?

—এখানে বেড়াতে এসেছেন। বাসা নিয়েছেন রাজেনবাবুর বাংলোতে।

রায়চৌধুরীর কপালে একটুখানি ছায়া পড়ল। জানতে চাইলেন, আধুনিক কবি ?

—না, বাবা। উপন্যাস লেখেন।

—তবু ভালো।

—আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ ডগলাস—

বাকীটা আর বলা হল না বাসবের। তিনটি ছেলেমেয়ের হাসির ভেতরে চাপা পড়ে গেল। আর সব চাইতে খুশি হল ডগলাস, এই ফাঁকে সে রবারের একটা বল মুখে নিয়ে সারাটা লন দৌড়ে বেড়াতে লাগল।

ভেতরের হল ঘরে পা দিয়েই ডাক্তার ডাকলেন: মিলা—মিলা—

বৌমা বলেন না—নাম ধরেই ডাকেন। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হিসেবে নয়—শর্মিলাকে কখনো কখনো তাঁর নিজের মেয়ের মতো মনে হয় ; স্নেহ তো আছেই, তার সঙ্গে সমবেদনা মিশে, শর্মিলার সম্পর্কে তাঁর মমতা যেন উপচে পড়ে আজকাল।

শর্মিলা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

—ডাকছেন দাদা ?

—কাকে আবার আজ বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন করে এলে ?

—বাসব বলেছে বুঝি বাড়িতে পা দিতে না দিতেই ?—শর্মিলা হাসলেন: উৎসাহে আর কিছু খেয়াল নেই ওর। আজ নয়, কাল সকালে কিরণবাবু আসবেন চা খেতে।

—খুব বড়ো লেখক বুঝি ?

—নাম আছে।

—তুমি পড়েছ বই-টই ?

—পড়েছি দু-একখানা।—শর্মিলার মুখে অকারণেই কৃষ্ণচূড়ার রং লাগল একটুখানি: বেশ লেখেন।

—সায়েন্সের প্রফেসারকেও যখন খুশি করতে পেরেছেন, তখন ভদ্রলোক ভালোই লেখেন নিশ্চয়।—রায়চৌধুরীও হাসলেন : কিন্তু সাহিত্যিককে আপ্যায়ন করবে কী দিয়ে? কী খাওয়ানো হবে?

—ওসব দিদির ডিপার্টমেণ্ট, আমি কিছু বলতে পারি না। কিন্তু দাদা, কাল কিন্তু আপনাকেও কাব্য পাঠ করতে হবে।

—আরে, ডাক্তারের আবার কবিতা! ওকি আর সাহিত্যিককে শোনাবার মতো?

—আপনার কবিতার বিচার করব আমরা, আপনি নন।

রায়চৌধুরী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রান্নাঘরের তত্ত্বাবধান সেরে কল্যাণী ফিরে এলেন। তারপরেই প্রথম সম্ভাষণ : ড্রয়ারের চাবি নিয়ে সেদিন তো আমায় খুব একরাশ বকাবকি করলে—সারা বাড়ি মাথায় তুললে। সে চাবি কোথায় আছে জানো?

ট্রাউজারের পকেট থেকে চাবি আবিষ্কারের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল শর্মিলার। এখন আর সাহিত্যচর্চা নয়। এবার যে পর্বটা আসছে সেটা নিতান্তই দাম্পত্য—কুড়ি টাকার ক্ষতি-পূরণেও কল্যাণী স্বামীকে সহজে ছাড়বেন না। এর মাঝখানে আর দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকাটা উচিত নয়।

মৃদু হেসে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন শর্মিলা। পেছনে শোনা যেতে লাগল কল্যাণীর গলা : নিজের কোনো দিকে কিছু খেয়াল থাকে না, কোথাকার জিনিষ কোথায় যায়, কেবল চেঁচামেচির বেলায়—

দিনটা এইভাবে কাটল। বেলা পড়ল, বিকেল হল, সন্ধ্যা নামল। ডাক্তার রায়চৌধুরী আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, কল্যাণী রান্নাঘরে গেলেন, বাসব-লেখা-কেকা পরমানন্দে গানের আসর বসিয়ে দিলে। থেকে থেকে লেখার প্রতিবাদ শোনা যেতে লাগল : 'তুই থাম না দাদা—তোর মোটেই সুর হচ্ছে না—।'

বারান্দায় কিছুক্ষণের জন্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল ভগলাস—সারা রাত ধরে বাড়িময় ছুটোছুটি করবার আগে একটুখানি ঘুমিয়ে তৈরি হয়ে নিতে চায়। আর দু-একখানা চিঠি লেখবার জন্যে নিজের ঘরে, টেবিলের সামনে বসে বার কয়েক অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন শর্মিলা। দেওয়ালে অমিতাভ রায়চৌধুরীর ছবি, একছড়া শুকনো মালা এখনও ঝুলছে তার ওপর। কিন্তু মনটা না বসছে চিঠিতে, না মগ্ন হচ্ছে চিঠি-লেখার ভেতরে। থেকে থেকে ছবি আসছে—একটা কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জ—সেখানে হরিয়াল ডাকছে, মাঠের ওপর দিয়ে বাতাস বইছে আর লাল মাটির ছোট টিলাটার ওপর ধ্যানস্থের মতো একটি মানুষ—টুপটুপ করে ফুল ঝরছে তার গায়ে।

কখনো কখনো এক-একটা অবসরে কী আশ্চর্য মনে হয় এক-একজনকে।

শর্মিলা ছেলেমানুষ নন। লেখক-সাহিত্যিক দেখলেই মুগ্ধ হয়ে উঠবেন, তাদের অটোগ্রাফ নেবার জন্যে ছুটবেন, বাসবের মতো এ দুর্বলতাও তাঁর নেই। তবু কিরণ বসুকে কেমন নতুন মনে হল। লোকটির ভেতরে কোথায় কিছু একটা আছে—মনে থাকে, মনে রাখতে ভালো লাগে।

আপনার স্ত্রী আসেন নি ? মিসেস বসু ? কিরণ যেন জবাবটা এড়িয়ে গিয়েছিল, মেঘের ছায়া ভেসে গিয়েছিল মুখের ওপর দিয়ে। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি বিবাহিত জীবনে সুখী নন ?

ছি—ছি, কেন এসব ভাবনা। কিরণ বসুর জন্যে কেন মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন শর্মিলা ? বিবাহিত জীবনে লোকটি সুখী কি না সে-কথা জেনে তাঁর কী আসে যায় ?

শর্মিলা আবার চিঠির দিকে চোখ নামালেন।

আর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, এতক্ষণ ধরে রাইটিং প্যাডের ওপর শুধু আঁচড়ই কেটেছেন। আর বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখেছেন—'কৃষ্ণচূড়া—কৃষ্ণচূড়া'—

॥ ছয় ॥

'এ-দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার'—

ভোর থেকেই এই ছুটি লাইন বেজে চলেছে মনের ভেতর। হয়তো এমন করে সূর্যোদয় বহুদিন দেখা হয় নি কিরণের। এই যে একটু একটু করে দূরের পাহাড় রাঙিয়ে ওঠা, তারপর কৃষ্ণচূড়ার উদগুলির সঙ্গে সেই রঙের মিতালি—সেই রঙের ডাকে পাখিদের দলে দলে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়া, সেই বাতাস—যা এইমাত্র যেন দক্ষিণ সমুদ্র থেকে নবজাতকের নির্মলতায় বেরিয়ে এল—সব মিলে সকালটিকে যেন আবির্ভাবের মতো মনে হল। যেন কালকের রাত একটি শুক্তির মতো অপেক্ষা করছিল, কখন স্বাতী-নক্ষত্রের একটি বিন্দু ঝরে পড়ল তাতে—ভোরবেলায় আকাশের রঙিন ঢাকনাটি খুলে গেল আর পৃথিবীর মাটিতে দুর্লভ মুক্তোর মতো ফুটে উঠল দিনটি।

রোমান্টিক ?

কলকাতায় থাকলে হাসি পেত। ঘুম ভাঙত রাস্তার দুঃসহ ট্রামের আওয়াজে, কলতলায় মেসের ঝি-র বাসন মাজার ঝঙ্কারে, কাকের ডাকে ; শোনা যেত ঠাকুর-চাকরের বকাবকি, শোনা যেত 'চা আন শীগ্‌গির, গরম কচুরি আনবি নিচের দোকান থেকে, জিলিপি ভাজছে কি না দেখিস্।' জানলা দিয়ে খানিক রোদ পড়ত গায়ে, জ্বালা করে উঠত চোখ-মুখ, বিরক্ত হয়ে উঠে বসতে হত। যদিও তেতলার একটি সিঙ্গল্-সীটেড্ রুমে তার ডেরা-ডেণ্ডা,

তবু সারা বাড়ির কোলাহল—পথের হট্টগোল, সব মিলে মনে হত—আর একটা অসহ্য দিন সুরু হল, ঘাম, গরম অবসাদ আর আর বিরক্তির দিন।

তখন চোখে পড়ত নিজের অগোছালো ঘরটা। টেবিলে বই-কাগজপত্রের জঙ্গল, মেঝেতে বই, বিছানায় বই, দেওয়ালে বই। গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে করতে হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে। এমন কি, শিল্পী এক বন্ধুর উপহার দেওয়া কুলু ভ্যালির সেই আশ্চর্য ল্যাণ্ডস্কেপটা দেওয়ালে কাত হয়ে ঝুলছে ক'দিন ধরে—সেটা পর্যন্ত সোজা করে দিতে তার ইচ্ছে করে না। তারপর সেই শ্যাওলা-পড়া স্যাঁৎসেঁতে বাথরুম, তোবড়ানো টিনের মগ, টুথব্রাশ, রুটি-চা, কিছুক্ষণ খবরের কাগজ, দু'চার লাইন লিখতে বসা, দরকার থাকলে শার্টটা গায়ে টেনে বেরিয়ে পড়া, বন্ধু-বান্ধব কেউ এসে গেলে চাকর ডেকে চা-কচুরি-জিলিপির ফরমাস, ঘণ্টা দু-তিন আড্ডা, পরচর্চা, সাহিত্যের বকবকানি, টিনের কৌটো ছাপিয়ে বিড়ি-সিগারেটের ছাই আর টুকরো, সভা-সমিতির জন্যে আগন্তুক, অটোগ্রাফের খাতা হাতে ভীরুপায়ে একটি স্কুলের ছেলের প্রবেশ, কোনো পাব্‌লিশার, কোনো সমবয়েসী সহকারী সম্পাদক।

—সব সাহিত্যিকের গাড়ি-বাড়ি হচ্ছে, আপনি সারাজীবন মেসেই কাটাবেন কিরণবাবু?

—রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন আপনাদের? 'জীবনে জীবন যোগ করা, নহিলে কৃত্রিম পণ্যে—'

—থামুন মশাই, চালাকী করবেন না। টাকা তো নেহাৎ কম পান না। কী করেন তা দিয়ে?

—জমাচ্ছি। বড়োবাজারে একটা পাঁচতলা বাড়ি কিনে ব্যবসা আরম্ভ করব।

—আর সাহিত্য? তার কী হবে?

—তাকে বলব, সরে পড়ো। ক' পার্সেণ্ট লোক সাহিত্য পড়ে

মশাই ? কিন্তু চাল-তেল কাপড় সেন্ট পার্সেন্টেরই দরকার। টাকা জমাচ্ছি সেই বৃহত্তর দেশসেবার জন্যে। কী, খুশি হলেন তো ?

—নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের কথাও একটু মনে রাখবেন তা হলে। চালটা একটু সস্তায় ছাড়বেন আর কাঁকরের পরিমাণটাও যদি দয়া করে কিছু কমান—

—কী দুঃখে ? সাহিত্যে চোখ বুজে পিটুলি-গোলা গিলছেন আর পচা তেলের ফুলুরি খাচ্ছেন রসিয়ে রসিয়ে, তাও কিনছেন বারো টাকা থেকে বাহান্ন টাকা—যে কোনো দামে। দোষ হল কেবল চালের বেলায় ?

—আপনার নিজের লেখা সম্পর্কেও কি এই সমালোচনা—

—নিশ্চয়। ব্রাদার্স ইন ফেদ। দলের লোককে বিট্রে করতে বলেন নাকি ?

—ঠাট্টা নয়, সত্যিই একটা বাড়ি করুন এইবার।

—বললুম চেষ্টা করছি বড়োবাজারে। জয়পুরে গণেশেরও অর্ডার দিয়েছি। ধৈর্য ধরে আর দিন কয়েক অপেক্ষা করুন। আর আপাতত একটা সিগারেট খাওয়ান—আমারগুলো সব ফুরিয়ে গেছে।

এ-ই কলকাতার সকাল। তিক্ত বিস্বাদ। ঘুম থেকে উঠে মনে হয়, আগের দিনের ক্লান্তি এখনো কাটে নি, মস্তিষ্কের কোষে কোষে মুঠো মুঠো অন্ধকারের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে। সেই ক্লান্তি থেকে সব বিরক্তিকর বলে বোধ হতে থাকে, আসে ধারালো কথা, তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত—দেখা দেয় নিজের ওপর অশ্রদ্ধা, মানুষের ওপর অবিশ্বাস। আজকের পাহাড়ে এই রং-লাগানো সকাল সেখানে দেড়শো বছর আগেকার কোনো ফরাসী লেখকের পাণ্ডুলিপির মতো—যেখানে চির-তরুণ অরণ্য, ছোট নদীটির ধারে ধারে নানা রঙের ফুল—তার মাঝখানে একটি সোনালি চুলের মেয়ে চুপ করে বসে দূরের হাওয়ার কোনো রাখালের গান শুনছে।

সে পাণ্ডুলিপি কয়েক পাতা পড়বার পর আর ধৈর্য থাকে না। তার মন্থর ভাষা, তার স্বপ্নের কুহক—তার প্রেম-বাসনার সরলীকৃত আবেগ। হাসি পায়। এখানে জীবন সরীসৃপ। রূপ অ্যানাটমি। মানুষের দু'টো মাত্র ভাগ—এক ভাগে চিন্তার জটপাকানো কয়েকটা দুর্বোধ্য যন্ত্র—আর এক ভাগে কতগুলো পিণ্ডাকার সমষ্টি—তাদের হাত নেই, পা নেই, নাক-চোখ-মুখ কিছুই নেই; শুধু অক্টোপাশের শরীরের মতো সেই পৃথিবীজোড়া মাংসের তালে অসংখ্য ভ্যাকুয়াম ছিদ্র, আর সেই ছিদ্রময় কোটি কোটি ইন্দ্রিয়গুলো রাতদিন শুধু শুষেই নিতে চাইছে। আর কিছু নয়।

টাকা, বাড়ি, গাড়ি!

কারো কারো হয়তো হয়, কিন্তু কিভাবে হয় কিরণ তা জানে না। দাদার একটা চোখ আগেই খারাপ ছিল, গ্লোকুমা হয়ে আর একটাও গেছে—অর্থাৎ এখন প্রায় পুরোপুরি অন্ধ। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা আর মাস-কয়েকের মাইনে দিয়ে জোর করে বিদায় করেছে চাকরি থেকে। অথচ দাদার অনেকগুলো ছেলেপুলে। তার ওপর প্রতিমা—

প্রতিমা আছে একটা প্রাইভেট অ্যাসাইলামে। বাড়িতে রাখা যায় না—জামা-কাপড় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। খাবারের থালা দিলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—'ওতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।' তার চাইতে চোখের বাইরেই থাক। সেখানে একটু যত্ন-আত্তি হয়, কিন্তু তার জন্যে মাসে দুশো টাকা করে খরচ পাঠাতে হয়।

স্কুলের চাকরি আর করা যায় না, টিউশনও না। খ্যাতির বিড়ম্বনা। সাহিত্যই জীবিকা। নাম কিছু হয়েছে, কারণ বাঙালী পাঠক-পাঠিকার প্রত্যাশা যৎসামান্য, ঔদার্য অসীম। কিন্তু ঠিক জনপ্রিয় বললে যা বোঝায়—তার উপন্যাস তা নয়, এক সপ্তাহে তার কোনো বইয়ের 'তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত' হয় না। তাই খ্যাতি

যতটা, আয় তত বেশি নয়। অথচ মনের মতো কিছু আজ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারল না, বলতে পারল না, 'আমার বিচার রইল ভবিষ্যত্যের কাছে।'

বাড়ি-গাড়ি!

হলে হয়তো ভালোই হয়, কে জানে। কিন্তু দাদার সংসার চালাতে হয়। দুশো করে টাকা পাঠাতে হয় প্রতিমার জন্যে।

এ-ও বাঙালী পাঠক-পাঠিকার গুণে। যাদের দাবি নামমাত্র, প্রীতি অপরিসীম।

তবু কলকাতার সঙ্গে এই টাকার সম্পর্ক। স্বার্থের, জীবিকার। সূর্যোদয় দূরে থাক, আকাশের দিকেই কি চোখ পড়ে কখনো? যখন পড়ে—হয়তো কোনো ঘোলাটে সন্ধ্যায়, কোনো রৌদ্রজ্বলা দুপুরে—তখন মনে হয় অক্টোপাশের শুঁড়ের সেই সব ভ্যাকুয়ামের মতো অসংখ্য রক্তমুখ ছিদ্র—সেই ছিদ্রে কোটি কোটি ইন্দ্রিয়ের জিহ্বাগুলো লকলক করছে।

সকালের রং মিশে গিয়ে রোদ উঠেছিল, হাওয়া লেগে সামনের লনে কাল রাতের ক'টি বেলফুল ঝরে পড়ছিল বৃন্ত থেকে, তখন শঙ্কু এল। এল চা নিয়ে।

—কী জলখাবার দেব বাবু?

কিরণ সোজা হয়ে উঠে বসল ইজিচেয়ারটায়।

—জলখাবার দরকার নেই। চায়ের নেমন্তন্ন আছে এ বেলায়।

হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল এতক্ষণে। কী আশ্চর্য, প্রায় সাতটা। এই দু'ঘণ্টা ধরে সে চেয়ারটায় এইভাবে বসে আছে, ফিরে গেছে কতগুলো বিরক্তিকর কটুস্বাদ চিন্তার ভেতরে, আর তার অন্যমনস্ক চোখের আড়ালে অন্ধকারের শুক্তি খোলা মুক্তোর মতো দিনটি কত যে আলো, রঙ আর পাখির খেলা খেলে গেছে তা সে দেখতেও পায় নি।

'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার—'

রোমান্টিক? অ্যানাক্রনিজম? তাই হোক। দেড়শো বছর আগেকার পুরোনো ফরাসী উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপিই আজ সে খুলে ধরুক চোখের সামনে। চির-তরুণ অরণ্যে আরো নীল ছায়া নেমে আসুক, ছোট নদীটির জলে বাজতে থাকুক নুড়ির নূপুর, আর একরাশ বুনো ফুলের মাঝখানে বসে সোনালি চুলের মেয়েটি কান পেতে শুনুক দূরের বন্ধু রাখালের গান—'ল্য শাঁজোঁ দ্যু ব্যার্জের।'

পথে বেরিয়েই তিক্ত কলকাতা মুছে গিয়েছিল। তারপর কৃষ্ণচূড়ার ছটা লাগল চোখে, আমের মুকুলের গন্ধ এল, বুলবুলির শিসে আর হরিয়ালের ডাকে দু'কান ভরে রইল। 'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা'—গানটা অদ্ভুতভাবে পেয়ে বসেছে, কিছুতেই মন থেকে যেতে চাইছে না। কিরণের মনে হল, আজ সকালে কলম নিয়ে বসলে খুব মিষ্টি একটা গল্প সে লিখতে পারত।

এই তো ডাক্তার এ কে রায়চৌধুরী। বি-এসসি, এম. বি. বি. এস্।

বর্ণনায় কোনো ভুল নেই। সামনে ঢেউতোলা প্রাচীর। কম্পাউণ্ডে দুটো ইউক্যালিপটাস্ আর ক'টি জাপানী ঝাউ। আর—

—আর, কিরণ চকিতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। গেটের বাইরে প্রথমেই যে গলা বের করল, সে আর কেউ নয়—স্বয়ং ডগলাস। বেশ উদার গলায় বললে, ভোঃ!

কিরণ হেসে ফেলল: এ অভ্যর্থনা মন্দ নয়। আমার ডায়েরী-খানা চুরি করলে তুমিই, আর পালটা আমাকেই এখন চোর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে!

কিন্তু এরই মধ্যেই বাসব বেরিয়ে পড়েছে। আর বেরিয়েই তার গগনভেদী ঘোষণা: এসে গেছেন—এসে গেছেন!

এতক্ষণ বাইরের ঘরে সবাই অপেক্ষাই করছিলেন কিরণের জন্যে। চায়ের টেবিল সাজানো, কেটলিতে কল্যাণী জল চাপিয়েছেন সাড়ে ছ'টায়। শর্মিলা হেসে বলেছিলেন, মিথ্যেই ব্যস্ত হচ্ছ দিদি, কলকাতার লোকের ঘুম ভাঙেই আটটায়।

—লেখক মানুষ আটটায় উঠবেন কিরে? লেখেন কখন তা হলে?

—ওঁরা নিশাচর। না—না, খারাপ অর্থে বলি নি। মানে, একটু বেশি রাতেই ওঁরা কল্পনার জগতে চরে বেড়ান।

—চরে বেড়ান মানে?—কল্যাণী ভ্রূভঙ্গি করেছিলেন: মানুষ চরে নাকি?

শর্মিলা বলেছিলেন, সর্বনাশ, আমাদের মতো বেরসিকের দেখছি কথা বলাই মুস্কিল। সায়েন্স পড়িয়ে এমন দশা হয়েছে যে—

আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই কল্যাণী লক্ষ্য করেছিলেন ভাঁড়ার ঘরে বাসব এবং কেকার গতিবিধি সন্দেহজনক। ধমক দিয়ে বলেছিলেন, এই—খবরদার, আমি সব দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। জেলীর শিশিতে যে হাত দেবে, তার জিভ আমি কেটে ফেলব।

ডাক্তার রায়চৌধুরী এতক্ষণ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সাতটা নাগাদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—ঠিক বলে এসেছ তো তোমরা? নাকি লেখক মানুষ ভুলেই গেলেন?

বাসব বললে, ভুলবেন কেন? আমি তো কতবার বলে এসেছি।

—তুমি থামো।

—কাকিমাও তো বলেছেন।

—তবু আমার একবার যাওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক, একজন নামজাদা লেখক—

অতঃপর ডগলাসের অভ্যর্থনা, বাসবের চিৎকার, কেকা-লেখার

ছুটে যাওয়া, তাদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার নিজেই। কল্যাণী উঁকি দিলেন দরজার পাশ দিয়ে। শুধু শর্মিলা উঠলেন না, অকারণ সংকোচে নিজের চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

বাইরে ডাক্তারের গলা শোনা যেতে লাগল : আসুন—আসুন—নমস্কার! আমিই অবনী রায়চৌধুরী। আসুন ভেতরে—আমরা অপেক্ষা করে আছি আপনার জন্যে।

সেইসঙ্গে কানে এল বাসরের শাসন : এই ডগলাস, চুপ। অসভ্যতা করতে নেই।

কল্যাণী সরে দাঁড়ালেন দরজার পাশে, শর্মিলা উঠে দাঁড়ালেন এবার। ডাক্তার তাঁর অতিথিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

—ইনি আমার স্ত্রী, আর এরা—

শর্মিলার সঙ্গে দৃষ্টি মিলল কিরণের। হাত দুটি কপালে জড়ো করেই মৃদু হাসল কিরণ : এঁদের সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়ে গেছে।

বাসব বললে, দেখুন—দেখুন, ডগলাস আপনার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে।

ভাব করতে চাইছিল নিঃসন্দেহ, কিরণের জুতোটা শুঁকছিল একমনে। কল্যাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই বাসু, হতভাগা কুকুরটাকে বের করে দে তো ঘর থেকে।

কিরণ হেসে বললে, থাক—থাক। ওরই জন্যে তো আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

ঘরশুদ্ধ সবাই হেসে উঠলেন। ডাক্তার বললেন, নিন—বসুন। উই আর অলরেডি লেট ফর টী।

সবাই বসলেন। কিরণ কুণ্ঠিত ভাবে বললে, আমিই বোধহয় আপনাদের দেরী করিয়ে দিলুম?

—কিছু না, কিছু না। র‍্যাদার উই আর টু আর্লি। আমাদের

এই পাড়াগাঁয়ে সকলেই একটু আগে ওঠে জানেন তো? কাজেই দিন আমাদের সুরু হয় তাড়াতাড়ি, আর রাত সাড়ে ন'টা বাজতেই মিড নাইট।

কল্যাণী খাবারের ডিশ এগিয়ে দিচ্ছিলেন, সাহায্য করছিলেন শর্মিলা। কিরণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

—একি কাণ্ড বলুন তো। চায়ের সঙ্গে এত খাবার! কে খাবে?

—এত খাবার কোথায় মশাই? —বিরাট একখানা কেক কেটে কিরণের পেটে রাখলেন ডাক্তার: ফ্রম দি মেডিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ, মানুষের সারাদিনের যা খাদ্য, তার ওয়ান থার্ড খাওয়া উচিত ব্রেকফাস্টের সময়। তারপর সারাটা দিন মনের আনন্দে কাজ করুন। ইয়োরোপে এই নীতিই ওরা মেনে চলে। তা ছাড়া আপনি তো ইয়ং ম্যান—এই তো খাওয়ার বয়েস আপনাদের।

—ইয়ং ম্যান? বয়েস প্রায় চল্লিশ হল।

—চল্লিশ?—ডাক্তার রায়চৌধুরী হেসে উঠলেন, ইউ হ্যাভ জাস্ট বিগ্যান ইয়োর লাইফ।

—ওটা বিলিতী মতে। আমাদের দেশে নয়।

—ওরা কিছু সুপারম্যান নয়। স্বাস্থ্যনীতি মেনে চললে সব দেশের নিয়মই এক। নিন—সুরু করুন।

চায়ের সঙ্গে গল্প। কী করে সরকারী চাকরি ছেড়ে ডাক্তার এখানে প্র্যাকটিস সুরু করলেন, তার ইতিহাস। জায়গাটি ওঁর ভালো লাগে। 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউডস ইগনোবল্ স্ট্রাইফ।' 'লেখকদের এই রকম কোনো পীসফুল জায়গাতেই থাকা উচিত।' 'সত্যিকারের ভারতবর্ষকে দেখতে চান? এখানকার সাধারণ মানুষদের ভেতর দিয়ে দেখুন। আপনার আর্টিফিশ্যাল শহরে নয়,—পলিটিকাল কচকচির ভেতরেও নয়।' 'আপনি কলকাতায় কী করেন—লেখা ছাড়া? কে কে আছেন?'

নিজের প্রসঙ্গটা সাধ্যমতো এড়িয়ে যেতে চাইছিল কিরণ, তবু কল্যাণীই জোর করে আবার কথাটা টেনে আনলেন।

—একা একা কষ্ট হবে না আপনার? স্ত্রীকে আনলেন না কেন?

একটু চুপ করে থেকে কিরণ জবাব দিলে, তিনি অসুস্থ।

—অসুস্থ?—ডাক্তারের মন স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে উঠল: কী হয়েছে? কী অসুখ?

টেবিলের ওধার থেকে শর্মিলার হু'টি গভীর চোখ যে তারই মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে সেদিকে না তাকিয়ে কিরণ তা অনুভব করতে পারছিল। কেকের একটা টুকরো নাড়াচাড়া করতে করতে আলতোভাবে জবাব দিলে, মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট।

—সেকি!—দু-তিনটে সরুমোটা স্বর এক হয়ে কানে এল, কিন্তু কোনটা যে কার কিরণ তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না।

আরো স্বচ্ছ, আরো সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বললে, পাগল হয়ে গেছে।

চায়ের টেবিল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু পরে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন ডাক্তার রায়চৌধুরী। অপরাধীর মতো বললেন, হাউ আনফরচুনেট! তা, ট্রীটমেণ্ট—

—আর কিছু করবার নেই।

আবার কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের ভেতরে অক্টোপাশের শুঁড়ের মতো শোষক-ছিদ্রে ভরা সেই আকাশ: সেই ক্লান্ত, সেই অবসাদভরা সকাল, সেই ধোঁয়াটে সন্ধ্যা, শরীরে, মনে, জীবনচিন্তার সেই কটুস্বাদ। এই চায়ের টেবিল, এই সুখী মানুষগুলি—এদের যেন হঠাৎ সব মিলে একরাশ সাজানো পুতুল বলে বোধ হল।

ডাক্তার রায়চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

—সত্যি, জীবনে সুখী হওয়ার দাবি নিয়ে মানুষ আসে নি। নইলে আমার ছোট ভাই অমিতাভ অমন করে একটা অ্যাক্সি-

ভেণ্টের মধ্য দিয়ে কেনই বা চলে যাবে আর কেনই বা মিলার মতো মেয়ে—

রায়চৌধুরীর স্বর ভারি হয়ে এল। কল্যাণী নড়ে উঠলে।

—আঃ, কী করছ! ভদ্রলোককে চা খেতে ডেকে এনে—

—ঠিক, ঠিক, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।—ডাক্তার নিজেকে সামলে নিলেন, বললেন, নিন, খান—খান। অন্য গল্প চলুক।

কিন্তু কোথায় যেন সুর কেটে গিয়েছিল, অন্য গল্প ভালো করে জমল না। কিরণের উপন্যাস সম্পর্কে কল্যাণীর মনে কিছু প্রশ্ন ছিল, ডাক্তরের দু-একটা কবিতা শোনাবার কথা ছিল, লেখার গান গাইবার ব্যবস্থা ছিল, কিছুই হল না। সকলেরই একটা কথা মনে হল, আজ থাক, আর একদিন হবে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে কিরণ যখন উঠতে যাচ্ছিল, কোত্থেকে এক অটো-গ্রাফের খাতা হাতে বাসবের আবির্ভাব।

—না—না, খালি সই করলে হবে না, কিছু লিখে দিন কিরণবাবু।

রায়চৌধুরী ধমকে উঠলেন: কিরণবাবু কী। কাকা বলতে পারিস না।

কথাটা আর কেউ লক্ষ্য করলেন না কিন্তু চমকে উঠলেন একজন। চকিতে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তাঁর। লোকটি শর্মিলা।

॥ সাত ॥

অনেক দিন আগে আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলুম।

তখন আমার বয়েস দশ কি এগারোর বেশি নয়। যে বয়েসের এক একটা দিন ছেলেবেলার আঁকা ছবির মতো—কাঁচা হাতে টানা মোটা মোটা লাইন, মনের আনন্দে রং বুলিয়ে চলা। তখন নদীর

রঙে অনেক বেশি নীল, গাছের পাতায় যত খুশি সবুজ, পাতার আড়ালে ঘন হলুদ রঙে আঁকা বৌ-কথা-কও পাখি, নদীর জলে ভেসে-চলা নৌকোটির পালে একমুঠো নিবিড় লাল।

সেই ছেলেমানুষি ছবির কোনো দাম নেই। তার ড্রয়িং ভুল, পারস্‌পেকটিভ ভুল, বড়ো হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছেঁড়া কাগজের স্তূপের ভেতরে কোথায় তার হারিয়ে যাওয়া। তবু আরো অনেক বড়ো হয়ে যাওয়ার পর সেই হারিয়ে-যাওয়া কাঁচা হাতের ছবিটার দাম বুঝতে পারা যায়। কিন্তু হিসেবী মন তখন আর ভুল ড্রয়িং করতে পারে না, ভুল চোখ নিয়ে দেখতে পারে না—যা খুশি রঙ তুলিতে মাখিয়ে যত খুশি বুলিয়ে দিতে পারে না। তখন মস্ত একটা সাদা হিসেবের খাতা—তাতে রাতদিন যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের ফল নামিয়ে চলেছি।

ছবিরা যে ফাঁকে ফাঁকে আসে না, তা নয়; তারা সাদায় কালোয় আলোয় অন্ধকারে গড়া; আঁকা বাঁকা রেখার একদল সরীসৃপ; তার ড্রয়িংয়ে কোথাও অনাবশ্যক প্রক্ষেপ, কোথাও সঙ্কুচিত কার্পণ্য; মানুষের মুখ রাত্রির দুঃস্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়—প্রকৃতি তখন মানুষেরই মনের পটভূমি হয়ে ওঠে। হিসেবের ফাঁকে ফাঁকে আমিও সে ছবি আঁকি। তুলি দিয়ে নয়—কলমের মুখে, অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে।

কিন্তু সেই অনেক রঙ আর অনেক আনন্দের যে ছবিরা চলে গেল, তারা গেলই; অর্থাৎ চোখের ছবির পালা শেষ। এখন আত্মার ছবি আঁকা—যেখানে আদিম আর সাম্প্রতিক, চেতন আর অচেতন, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আর ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা, ধ্রুব-বিশ্বাস আর নৈরাজ্যবোধ এক সঙ্গে মিশে হাজারো রেখার একটা জটিল জাল তৈরি করে রেখেছে।

চোখের আলোয় দেখা মনের শৈশব; আত্মার মুখোমুখি দাঁড়ানো মানুষের সাবালকতা।

দুঃখ করবার কোনো মানে নেই—এই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় শৈশব আমরা কামনা করতে পারি—তার অনুধ্যানে আমাদের নস্টালজিক পরিতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু আমরা কি কখনো ফিরে যেতে পারি সেখানে? সেই দ্বিতীয় শৈশব কখনো কখনো হয়তো স্থবির বার্ধক্যে ফিরে আসে, কিন্তু তার চাইতে করুণ পরাজয়ের রূপ মানুষের আর নেই!

তবু এক একটা পটভূমি আছে। কখনো কখনো আমরা তার মধ্যে উত্তোলিত হই। তখন নিজেকে নতুন বলে মনে হয়—যেন কোথাও একটা মায়া সরোবর ছিল, কোন এক জ্যোৎস্নাগলা রাত্রিতে তার রুপোলি জলে ডুব দিয়ে আমরা একটা নতুন তীরে এসে দাঁড়াই। তখন দূরের পাহাড়, ওই নদীটা, ছোট ছোট লাল মাটির ঢিবি, এলোমেলো ঘাস আর সাঁওতালী গ্রামের বুটি আঁকা মাঠের পর মাঠ, বুনো কষায় গন্ধে ভরা হলুদ-লাল কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, সেই হরিয়ালের ঝাঁক, তখন—

তখন সাদা-কালোর ছবিতে যে জটিল রেখার জালে আমার সব শিরাস্নায়ুগুলো জড়িয়ে গেছে, তার মধ্য থেকে একটা স্বপ্নময় মুক্তি। স্বপ্নই। দু দিন পরেই চেতনার ওপর থেকে আলো অন্ধকারের সেই সহস্র বাহু আবার হাত বাড়াবে—কলকাতা আমাকে টানবে, আবার নিজের সেই বিবরের মধ্যে আমি ফিরে যাব। তার আগে পর্যন্ত আমি কিছুক্ষণ এই পাহাড়ের ছায়ায় ডুবে থাকতে পারি, মগ্ন হয়ে যেতে পারি কৃষ্ণচূড়ার অরণ্যগন্ধে, নিজের কাছে গুঞ্জন তুলতে পারি—'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা, মনে মনে—'

অনেক দিন আগে, চোখের আলোয় দেখা বেহিসেবী রঙ আর ভুল ড্রয়িংয়ের সেই শৈশবে, আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলুম।

ইচ্ছে করেই? ঠিক মনে পড়ে না। সেদিন আকাশে রোদ ছিল না—মেঘ এসে থেকে থেকে সূর্যকে আড়াল করছিল।

আমাদের স্কুল ছুটি ছিল। আর সেই সকালে আমি রাজহাঁসের পালক খুঁজতে বেরিয়েছিলুম।

বাবার মুখে শুনেছি তাঁরা রাজহাঁসের পালকের কলম দিয়ে ছেলেবেলায় লিখতে শিখেছিলেন। রাজহাঁস সরস্বতীর বাহন—তার ডানার কলমে অনেক বিদ্যে লুকোনো থাকে।

এখন আর সে কলম কোথাও নেই! কোনো রাজহাঁস নেই আমাদের গ্রামে। আমি রাজহাঁস দেখি নি।

ঠিক দেখি নি তা বলতে পারব না। আমাদের গ্রামে শরৎ যখন শেষ হয়ে যেত, শীতের হাওয়া লেগে ঘরে যেতে থাকত কাশফুলেরা, আকাশে আর একটুখানিও মেঘ থাকত না, সন্ধ্যের পর থেকে টুপ টুপ করে শিশিরের জল ঝরত, তখন অনেক রাতে—আকাশ জুড়ে আমি পাখির ডাক শুনতুম।

মাকে জিজ্ঞেস করতুম, মা, ও কী যায়?

মা বলতেন, হাঁসেরা উড়ে যায়।

—হাঁস উড়তে পারে?

—পারে বই কি। বুনো হাঁসেরা তো দেশে দেশে উড়েই বেড়ায়।

—বুনো হাঁসেরা কেমন দেখতে?

—অনেক রকম। —এইবার বাবা জবাব দিতেন; সরালি আছে, দীঘলি আছে, কোদালঠোঁটি আছে, লালসর আছে, কালসর আছে, ক্যাটকেটিয়া আছে—চীনে হাঁস আছে, রাজহাঁস আছে—

বুনো হাঁস সম্পর্কে বাবার জ্ঞান দেখে আমি চমকে যেতুম। আরো চমকে যেতুম, ওদের দলে রাজহাঁসেরাও আছে শুনে। আমি রোমাঞ্চিত হয়ে বলতুম, কোথায় যায় ওরা?

বাবা বলতেন, তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে মাইল তিনেক দূরে একটা বড়ো জলা আছে, হাঁসের ঝাঁক সেখানে পড়ে বলে শুনেছি।

—রাজহাঁসও পড়ে ?

—পড়ে বইকি। জলে চরে বেড়ায়, কখনো কখনো ডাঙায় উঠে আসে, ধানক্ষেত থেকে কচি কচি ধানের শিষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

আমি আরো রোমাঞ্চিত হয়ে বলতুম, সেখানে রাজহাঁসের পালক পড়ে থাকে, বাবা ?

বাবা বলতেন, তা কি দু' একটা আর থাকে না ?

—আমি একদিন রাজহাঁসের পালক খুঁজতে যাব।

বাবা হাঁসতেন।

—কী হবে ?

—কলম তৈরি করব। খুব ভালো লেখা হবে সরস্বতীর বরে।

—কিন্তু সে জলা তো অনেক দূর। গ্রাম পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে। সহজে কি যাওয়া যায় সেখানে ?

কেন যাওয়া যায় না ? কত মানুষ পথ দিয়ে চলে—দূর দূর হাটে চলে যায়, মাঠের ওপারে কত চলতি যাত্রীর ছবি একটু একটু করে ছোট হয়ে আসে। তারা যেতে পারে, আমি পারি না ?

হয়তো ভাবনাটা ভাবনাই থেকে যেত ; মাঠ-ঘাট-বন পেরিয়ে সেই পালকের সন্ধানে কোনোদিনই আর যাওয়া হত না। কিন্তু একবার শেষ রাতে আমার ঘুম ভাঙল। তখন চারদিক নিঝুম, ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত থমকে গেছে, শুধু টপটপ করে শিশির পড়ছে, এমন সময় হাঁসের কলরোল উঠল, উঠল ডানার আওয়াজ। আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম বাইরে।

তখন চারদিকে একটা ধোঁয়াটে কুয়াশা—অথচ কী উজ্জ্বল জ্যোৎস্না মাথার ওপর। সেই জ্যোৎস্নায় আমি হাঁসেদের উড়ে যেতে দেখলুম। মনে হল সেই যে গল্পের বুড়ী চাঁদের রাজ্যে বসে চরকা কাটে, সে মুঠো মুঠো পেঁজা তুলো জ্যোৎস্নার স্রোতে ভাসিয়ে

দিয়েছে—আর সাদা আলোর যে তারাদের দেখা যায় দেখা যায় না তারা একসঙ্গে গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে উঠেছে।

ঠিক তখনি আমি জানলুম, পালকের খোঁজে আমায় যেতেই হবে।

এইখানে কিরণের কলম থামল। একটা সিগারেট ধরানো দরকার।

সেই নীল খাতাটা—যেটা ডগলাস বাটপাড়ি করতে চেয়েছিল, তারই পাতার পর পাতা এই কথাগুলো সে সাজিয়ে চলেছে। কেন লিখছে জানে না। ডায়েরী? কিন্তু তার সঙ্গে ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়ার সম্পর্কটা কী? কেন এ-সব মনে এল? আজো কি এই কৃষ্ণচূড়ার দেশে সে নতুন করে আবার রাজহাঁসের পালক খুঁজতে চলেছে? আলো কি আবার সে কাঁচা হাতে ভুল ড্রয়িংয়ে রঙের পর রং ঢেলে ছবি এঁকে যাবে? তারপর সে ছবি যাবে হারিয়ে, সেই রাজহাঁসের পালকও আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না?

একটা উপন্যাস লিখব—নস্টালজিক উপন্যাস? নাম দেব 'কৃষ্ণচূড়া'? কিন্তু আজকের সাদায় কালোয়, জটিল রেখার গোলোকধাঁধার ভেতরে সে উপন্যাস চলবে কি? কেউ পড়বে?

একটি পাঠিকাকে কল্পনা করতে ইচ্ছে করল। কৃষ্ণচূড়ার রঙের সঙ্গে তাঁর বেশবাসের শুভ্রতার কোনো মিল ছিল না, তবু কোথায় যেন মিল ছিল একটা। শর্মিলা। শর্মিলা?

নিজের কাছে লজ্জা পেল কিরণ। এ সেই রোমান্টিক আমেজের ফল। কৃষ্ণচূড়ার মোহ। কোনো অর্থ হয় না।

কোনো মোহই থাকে না। পরশু সকালে চায়ের আড্ডাটাই তো কেমন বেসুরো হয়ে গেল। কোথা থেকে উঠে এল প্রতিমার কথা, যা একটা জীবন্ত মৃত্যু হয়ে তাকে প্রতিদিন ঘিরে আছে, যা থেকে থেকে তাকে আত্মার অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

আর এল সেই ইতিহাস—কিভাবে শর্মিলার জীবনে বৈধব্য নেমে এসেছিল। সেই জটিল সহস্রবাহু রেখাগুলোর হাত থেকে কোথাও তার পরিত্রাণ নেই। স্বপ্নের স্বচ্ছ আবরণটাকে ভেঙে দিয়ে তার থেকে চেতনার সেই নিষ্ঠুর উৎক্ষেপ।

লিখব একটা নতুন, ছোট, মিষ্টি উপন্যাস? কিন্তু কে পড়বে? প্রথম অধ্যায়ের পর আমিই কি আর লিখতে পারব?

—কিরণবাবু আছেন?

মোটা দরাজ গলায় ডাক এল বাইরে থেকে।

কিরণ চমকে উঠল। কে ডাকছে তাকে এখানে? কে ডাকতে পারে? ঘোর ভাঙবার আগেই আবার ডাক এল; কিরণবাবু নেই?

এবার সাড়া দিলে শঙ্কুই; হঁা ডাক্তারবাবু, আছেন।

সন্দেহ নেই, ডাক্তার রায় চৌধুরী। পায়ে চটি গলিয়ে, গেঞ্জী গায়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল কিরণ।

—কী সৌভাগ্য। আসুন ডাক্তার রায়চৌধুরী, আসুন!

ডাক্তার রোগী দেখতে বেরিয়েছেন, অথবা রোগী দেখে ফিরছেন। পরণে শার্ট-ট্রাউজার, গলায় স্টেথিসকোপ। বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাইরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। কিরণ অন্যমনস্ক ছিল বলেই গাড়ির আওয়াজ শুনতে পায় নি।

—আরে আসব কি মশাই। ডাক্তার বারান্দায় উঠে পড়েছিলেন, বললেন, একটা মহাপাপ করলুম মনে হচ্ছে। লেখক মানুষ, নিশ্চয় সকালবেলা লিখতে বসেছিলেন, আমি এসে সব ভণ্ডুল করে দিলুম।

—কিছু ভণ্ডুল করেন নি—একটুখানি মিথ্যে কথাই বলতে হল ভদ্রতার খাতিরে; দু-একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করছিলুম। তার জন্যে তাড়া নেই, কাল পরশু লিখলেও চলবে। বসুন—চা খান।

ডাক্তার ধপ করে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

—চা খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হবেন না মশাই; আপনার ওই শঙ্কু মহারাজটিকে আমি চিনি—ও যা চা করবে সে আমার জানা আছে। চা খাব আপনার নিজের বাড়িতে গিয়ে। আমারও বসবার জো নেই—মাইল আষ্টেক দূরে এক ধনী চৌধুরীর বাড়িতে একটা কেস রয়েছে। আমি শুধু খবর নিতে এলুম, কেমন আছেন।

কিরণ হাসল; খুব ভালো আছি।

—খাবার-দাবার ঠিকমতো পাচ্ছেন? এখানে মশাই মাছটা বিশেষ মেলে না, হয় হাটবারে জোগাড় করতে হয়, নইলে এদিক ওদিক থেকে আনাতে হয়। দেখি, কাল কিছু আপনাকে পাঠাতে পারি কি না।

কিরণ বললে, ব্যস্ত হবেন না, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই। একটা ডাল-তরকারী গোছের হলেই চলে যায়। তা ছাড়া শঙ্কু ডিম আনে, মুরগীও এনেছিল।

—আজকাল যা দাম হয়েছে মশাই। ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: অথচ ক'বছর আগেও কী দিন এখানে ছিল। এক টাকায় এক ঝুড়ি মুরগী নামিয়ে দিয়ে যেত, দুধ ছিল বারো সের। হ্যাঁ, দুধটা ভালো পাচ্ছেন?

—দুধ আমি খাই না।

—খাবেন, খাবেন। জল-টল এরা এখনো একটু কম মেশায়। বেশ করে দুধ খান, বেস্ট ফুড মশাই, শরীর ভালো হয়ে যাবে। আর কোনো অসুবিধে হলেই আমাকে জানাবেন।

—জানাব, নিশ্চয় জানাব।

—আর মাঝে মাঝে যাবেন আমাদের ওদিকে। সন্ধ্যের পরেই সাধারণত আমি ফ্রী থাকি—বেশ ভালো করে আড্ডা দেওয়া যাবে। সেদিন তো সাহিত্যচর্চা কিছু হলই না।

—আচ্ছা, যাব দু'-একদিনের মধ্যেই। কিন্তু সত্যিই কি চা খাবেন না এক পেয়ালা ?

বলতেই ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললেন, এই সর্বনাশ, সাড়ে ন'টা বাজল। নাঃ মশাই, আজ আর চা খাওয়া চলল না, এখন আবার আট মাইল পাহাড়ে রাস্তা ঠ্যাঙাতে হবে আমাকে। আচ্ছা নমস্কার—লনে নেমে পড়েই ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আরে, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। আজ চারটের পর আপনার সময় হবে ?

—কেন বলুন তো ?

—বাড়ির সবাই যাবে মহাকালের মন্দিরে বেড়াতে। চমৎকার জায়গাটি মশাই, পাহাড়ের ওপরে, বহু দিনের পুরোনো। এদের খুব বিশ্বাস, মানত করলে নাকি সর্বসিদ্ধিলাভ হয়। যাবেন দেখতে ? মিলা বলছিল, গিন্নীও বলছিলেন—আপনি গেলে দলটা ভালো জমে। যাবেন ?

কিরণ চুপ করে রইল।

—কী, কাজ আছে ?

—না, কাজ এমন কিছু নেই।

—তা হলে ঘুরে আসুন। ভালো লাগবে আপনার। আর আপনারা লেখক মানুষ—এই সব মন্দির টন্দির নিয়েই তো কী বলে ভারতের সংস্কৃতি—আপনাদের এ সব দেখা উচিত। যাচ্ছেন তা হলে ? বেশ একটা পিকনিকের মতোও হয়ে যাবে। আরে মশাই, চেঞ্জে এসেছেন কি শুধু বসে থাকবার জন্যে ? দশটা জিনিষ ঘুরে দেখবেন—তবে তো ?

কিরণ হাসল : ডক্টরস অ্যাডভাইস ?

ডাক্তারও হাসলেন : হাঁ, ডক্টরস অ্যাডভাইস। আসছেন তা হলে ?

একবার দ্বিধা করল কিরণ, তারপর বললে, আসব।

—ও-কে, ও-কে! ঠিক চারটেয় গাড়ি নিয়ে আসব আমরা, রেডি হয়ে থাকবেন, নমস্কার—ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

গাড়িটা স্টার্ট নিলে, এক মুঠো নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে, কৃষ্ণচূড়ার বীথির পাশ দিয়ে, শালবনের আড়ালে হারিয়ে গেল। কিরণ দাঁড়িয়ে রইল। কানে বাজতে লাগল একটি কথা: মিলা বলছিল—

শর্মিলা।

আর একবার কিরণ ভাবল, আমি একটা উপন্যাস লিখব। নস্টালজিক উপন্যাস ; তার নাম দেব—

॥ আট ॥

ডাক্তার গাড়ি চালাচ্ছেন, পাশে বাসব, এ ধারে কিরণ। পেছনের সীটে কল্যাণী, শর্মিলা, দুই মেয়ে। পুরোনো মডেলের বড়ো সাইজের গাড়ি, বসতে কারো অসুবিধে হয় নি। ডগলাসেরও আসবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল, দু-তিনবার লাফিয়েও উঠেছিল গাড়িতে, কিন্তু তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, রেখে আসা হয়েছে চাকরের চার্জে। ডগলাস খুশি হয় নি, শেষ পর্যন্তও করুণভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে সে।

এদিকে আর ম্যাকাডাম রোড নয়—লাল কাঁকরের রাস্তা। সে পথে নুড়ি উঠে আছে, গর্ত রয়েছে, ঝাঁকুনি খেতে হচ্ছে থেকে থেকে। ডাক্তার হাসলেন: একটা নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে না কিরণবাবু?

—কিসের?

—এই রাস্তার? ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ব্যাপার—মা-বাপ তো আর নেই। এ রকম পথে বোধ হয় এর আগে—

কিরণ বললে, মেটে রাস্তায় গোরুর গাড়ি চাপবার অভিজ্ঞতা আমার আছে, কিছু ভাববেন না।

—তা হলে সত্যিই ভাববার কিছু নেই। প্রকৃতির শোভাই দেখুন।

শেষ কথাটা ঠাট্টা করে বললেন, কিন্তু কিরণ মগ্ন হয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে! দুপাশে—সামনে একটা একটানা পটভূমি, বৈচিত্র্য নেই, তবু নতুনত্ব আছে। একই গাছের পাতা কখনো ঘন সবুজ কখনো একটু খানি পীতাভ; কোথাও এক ঝাঁক পায়রা কখনো কয়েকটা খঞ্জন;—কখনো সেগুন গাছের নীল নিবিড় ছায়া—কখনো শালের ফুল গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো ঝরে চলেছে। কোথাও কালো কালো পাতার আড়ালে পলাশ ফুটেছে, কোথাও ন্যাড়া শিমুলের ডালে ডালে রক্তকুসুমপুঞ্জ।

ডাক্তার বললেন, জানেন, যখন আমি প্রথম এখানে আসি, তখন এ সময়ে এদিকটাতে অনেক হরিণ পাওয়া যেত।

এখনো আছে হরিণ?—পেছন থেকে শর্মিলা জানতে চাইলেন।

—আছে কিছু কিছু, তবে দূরের পাহাড়ের দিকে। এদিকটায় লোকজন বেড়ে গেছে অনেক, শিকারও করা হয়েছে, ভয়ে আর আসে না। আমিও তো মেরেছি কয়েকবার।

—বাবা, আমি হরিণের মাংস খাব—কেকার অনুরোধ শোনা গেল।

—থাম্, রাতদিন কেবল খাই খাই।—কল্যাণী ধমক দিলেন।

ডাক্তার বলে চললেন, এদিকে তখন আরো অনেক ঝোপ জঙ্গল ছিল, বিস্তর শিমূল গাছ ছিল, আর এই পথটা ছিল পায়ে হাঁটা রাস্তা। হরিণেরা শিমূলের ফুল খেতে খুব ভালোবাসে, এই সময় দল বেঁধে আসত শিমূল বনে আর আমরা ঝোপের আড়াল থেকে—

বাসব এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিল। এইবার উৎসাহে নড়ে উঠল।

—উঃ, কী থ্রিলিং! বাবা—তোমার বন্দুকটা এবার আমায় দিতে হবে কিন্তু, আমিও শিকার করতে বেরুব। সঙ্গে থাকবে ডগলাস—মাই হান্টিং ডগ!

কল্যাণী বললেন, হঁ্যা, ওই তুমি করবে। মায়া দয়া তো আর নেই, ওই লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটাকে সঙ্গে করে যত জীবজন্তু খুন করে বেড়াও।

—খুন কী বলছ মা, শিকার!—বাসব প্রতিবাদ করল: যদি জিম করবেটের বই পড়তে—

—রাখ তোর জিম করবেট। শিকার খুন ছাড়া আর কী!

পারিবারিক আলোচনা, আপোসের ঝগড়া, কিরণ মনটাকে সরিয়ে নিতে চাইল এ-সব থেকে। বাইরে বসন্তের রোদে গাছপালার পুরোনো দৃশ্যপটটাই নতুন হয়ে উঠছে বার বার; শিমূল-পলাশ-শালের ফুল; কোনো গাছের পাতার রং গাঢ়, কারো রং ঘন সবুজ; ঢেউ খেলানো মাঠ, টিলা, সাঁওতালদের গ্রাম, একটা সাঁকোর তলায় বালি আর নুড়িতে মেশানো সাপের কঙ্কালের মত নদী, মাঠে চরা গোরু ছাগল, মোটরকে পথ ছেড়ে দেওয়া দু-একখানা মোষের গাড়ি, পশরা দিয়ে চলা মাঝি-মেঝেন। ভারতবর্ষ! তার দুঃখ, তার অভাব, তার ছোট-খাটো সুখ-শান্তি আনন্দের টুকরো টুকরো।

এই ভারতবর্ষের কথা আমরা উপন্যাসে লিখি না। আমাদের জন্যে কলকাতা। জটিল শহরের জটিল মানচিত্রে ঘুরে বেড়াই। কে পড়ে আমাদের লেখা? আমরাই পড়ি। ভারতবর্ষ পড়ে না।

কী পড়ে ভারতবর্ষ? তুলসীদাস? 'রামচরিত মানস?' ইলেকসনের মিটিংয়ে জমা হয়—শ্লোগানে সাড়া দেয়, পোলিং বুথে ভোট দিয়ে আসে; তারপর ঘরে ফিরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে সুর করে পড়তে বসে 'ভারত মিলাপ'—দু চোখে তার জল আসে! কবে

এই ভারতবর্ষ নতুন যুগের সাহিত্য পড়তে শিখবে ? করে পড়বে এ-কালের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ?

বাসব কী যেন একটানা বকবক করছে। লেখার গুনগুনানি শোনা যায় : 'ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন।' বাকী সবাই চুপ। কিরণের হঠাৎ মনে হল, এতক্ষণ ধরে সব চাইতে কম কথা বলেছেন শর্মিলা, কী যেন ভাবছেন। কী ভাবছেন ?

প্রথম দিন তাঁরই সঙ্গে আলাপ—সেদিন কিন্তু তারপর থেকে শর্মিলাই যেন সবচেয়ে দূরে সরে গেছেন। যেন পরিবারটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার একটুখানি কর্তব্য তাঁর ছিল, সেইটে মিটে যাওয়ার পর তাঁর ছুটি হয়ে গেছে।

শর্মিলা গম্ভীর, শর্মিলা বিষণ্ণ। এই বিষণ্ণতার পটভূমিও কিরণ জানে। কিন্তু প্রথম দিনের সেই উচ্ছ্বসিত হাসিটুকু কি হঠাৎ পাথরের আড়াল সরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ?

গাড়িটা পাহাড়ে উঠছে। ডান দিকে দুধবরণ একটি ঝর্ণার ছোট ধারা কিছুক্ষণের জন্যে—দেখা দিয়েই ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর মিলিয়ে গেল। গাড়ি ওপরে উঠছে—গর্জন করছে এঞ্জিন, তবু যেন ঝর্ণার শব্দটা শোনা যায়—এদিক ওদিক থেকে পাখির ডাক কানে আসে।

বাসব বললে, এই পাহাড়ে বাঘ নেই বাবা ?

—আগে ছিল দুটো চারটে লেপার্ড। পাঁচ-সাত বছরের ভেতরে আর শুনি নি। সাঁওতালরাই মেরে খেয়েছে।

কিরণ বললে, খেয়েছে ?

—ওরা খায়। বলে, বাঘের মাংস খেলে জোর হয় গায়ে।

কিরণ হাসল : তা জোর ওদের গায়ে হোক। আমাদের খেয়ে বাঘের গায়ে জোর না হলেই হল।

ডাক্তার বললেন, না, বাঘ আর নেই। তা ছাড়া ম্যান ইটার লেপার্ড কচিৎ হয়।

বাসব আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। বা-রে, জিম করবেটের বইতে লেপার্ডই তো—

কল্যাণী ধমক দিলেন: আবার জিম করবেট!

লেখা বললে, কিন্তু গল্পগুলো খুব ভালো মা। দাদা আমাকে ইংরেজী থেকে পড়ে পড়ে শুনিয়েছে। কী ভীষণ ছিল রুদ্রপ্রয়াগের সেই বাঘটা! সেই লোকটা ঘাস কাটছিল হঠাৎ—

কল্যাণী বললেন, আর কি গল্প নেই তোদের? যত খুনোখুনি—বাঘ, মানুষ খাওয়া—কী হচ্ছিস তোরা বল দিকি?

এতক্ষণে শর্মিলা হেসে উঠলেন। অনেকক্ষণ পরে যেন নিজের মনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

ডাক্তার গাড়ির ব্রেক কষলেন। বললেন, আচ্ছা, বাঘের গল্প এখন থাক। এইবার মহাকাল দর্শন করো সবাই, আমরা এসে পড়েছি।

পাহাড়ের মাথার ওপর অনেকখানি জুড়ে প্রায় সমতল। দু-তিনশো লোক একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে—প্রায় এমনি একটা উঠোনের মতো জায়গা—মনে হয় পাথর কেটে তৈরি করা। কয়েকটা আঁকাবাঁকা গাছ, তার ডুটোতে গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুল ফুটেছে, হাওয়ায় তাদের বুনো গন্ধ। ডানদিকে খাড়া জংলা পাহাড়—সেখান থেকে একটা ঝর্ণা নেমে এসে সমতল জায়গাটায় আছড়ে পড়ে আবার বয়ে গেছে নীচের দিকে। ঝর্ণার পাশেই দক্ষিণমুখী ছোট একটি সাদা মন্দির, অনেক দিনের পুরোনো, দু-তিন বছর বোধহয় চুণ পড়ে নি—ভেতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে সবুজ শ্যাওলা আর লাল ইটের রং।

মন্দিরের দরজা নেই। দক্ষিণের আলোয় দেখা যাচ্ছে কালো পাথরের বেদীর ওপর শিবলিঙ্গ; একটা রূপোর চোখ জ্বলজ্বল করছে তাতে। কিছু শুকনো ফুল আর বেলপাতা। এক ঝাঁক চড়ুই কিছু খুঁটে খাচ্ছিল—ওদের দেখে উড়ে পালালো।

সবাই প্রণাম করল।' আমিএই-সব বিশ্বাস করি না—'কথাটা বলতে মন সরল না কিরণের। কী দরকার আছে সব বেসুরো করে দিয়ে? বিকেলের হলুদ আলোয়, হলুদ ফুলের বুনো গন্ধে, নির্জন পাহাড়ের ওপর এই মন্দিরের সামনে অনেকগুলো বিশ্বাসী মনের প্রণামের ভেতরে এক ভারতবর্ষের সংস্কার। তাকে স্বীকার না করো, অশ্রদ্ধা করতে পারো না। একটা অসমাপ্ত নমস্কারের ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইল কিরণ।

মন্দিরের ছোট বারন্দায় বসলেন সবাই।

ডাক্তার বললেন, বেশ জায়গাটি—না?

কিরণ বললে, হ্যাঁ, দেবতার থাকবারই উপযুক্ত।

ডাক্তার বললেন, এ দেশের লোকের বিশ্বাস কী, জানেন তো? যতদূর থেকে এই পাহাড়ের চূড়ো দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত মহাকাল সকলকে রক্ষা করেন, কারো কোনো অমঙ্গল হয় না।

—হয় না নাকি?

ডাক্তার হাসলেন: এখন কি আর হয় না? দিনকাল বদলে গেছে, মানুষের পাপে দেবতার মহিমা নষ্ট হয়ে গেছে এখন। তবু লোকের অগাধ বিশ্বাস। শিবরাত্রির দিন কত দূর-দূর থেকে যে লোক আসে সে যদি দেখেন।

বাসব বললে, কালাপাহাড় তো এই মন্দির ভাঙতে পারে নি—না বাবা?

—হ্যাঁ, সে একটা কাহিনী আছে বটে।—ডাক্তার রায়চৌধুরী গল্প আরম্ভ করলেন। কালাপাহাড় নাকি এই মন্দির ভাঙতে এসেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ পাহাড় থেকে এমনভাবে পাথর-বৃষ্টি হতে থাকে যে—

কিছুক্ষণ গল্প চলল। বিকেলের হলদে রোদ আরো কোমল হয়ে এল। ডাক্তার আর কল্যাণী বসে রইলেন মন্দিরের বারন্দায়, লেখা আর কেকা ছুটোছুটি করতে লাগল সামনের জায়গাটায়,

আর হঠাৎ বাসব উত্তেজিত হয়ে খবর দিলে, কাকিমা, ওই যে—ওদিকে অনেকগুলো নতুন রকমের প্রজাপতি।

শর্মিলা চুপ করে বসেছিলেন, শুনেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

—কোথায় রে?

—ওই তো ঝর্ণার ওদিকটাতে। অদ্ভুত সব রং। নানা রকম স্পেশিমেন হবে তোমার।

এতক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে শান্ত বিষণ্ণতায় ডুবে ছিলেন শর্মিলা, ছেলে মানুষের মতো উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। বললেন, চল্‌চল্‌—দেখি—

ডাক্তার বললেন, যান না কিরণবাবু, দেখে আসুন। লেখক মানুষ, আপনারও কাজে লাগবে।

প্রজাপতি আর কাজে লাগে না, ও এখন ডাক্তার রায়চৌধুরীর মতো কবিদের জন্যেই, একথা মনে এল বটে, কিন্তু বলা গেল না। কিরণ বললে, আপনারা আসবেন না?

—আমরা বুড়োবুড়ি একটু বসি। আপনি যান।

—আমারও বয়েস প্রায় চল্লিশ হল।

—তবু মশাই আপনি সেদিনের ছেলে। যান—ঘুরে-টুরে আসুন। বেশি দেরী করবেন না—ছেলেমেয়েদের মন এখন টিফিন ক্যারিয়ারের ওপরে পড়ে আছে—ডাক্তার সস্নেহে হাসলেন।

জংলা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল কিরণ। ঝর্ণার ধারে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুল ফুটেছে। বাসব ঠিকই বলেছিল, প্রজাপতির মেলা বসেছে সেখানে।

শর্মিলা যেন অন্যরকম হয়ে গেছেন। উৎসাহে চোখ আলো হয়ে উঠেছে তাঁর।

—দেখছেন, কত ভ্যারাইটি! পাহাড়ে না এলে এসব পাওয়া যায় না। আগে খেয়াল হয় নি, তা হলে নেট্ নিয়ে আসতুম।

—আপনার বুঝি প্রজাপতি কালেকশনের হবি আছে?

শর্মিলা বললেন, না, হবি নয়। আমার স্টুডেন্টদের জন্যে কালেক্ট করি। প্রজাপতি—মথ—নানা জাতের ইনসেক্ট। এখানে এলে বাসু হয় আমার অ্যাসিন্ট্যান্ট।—বলতে বলতেই শর্মিলা চকিত হলেন: বাসু।

—কী কাকিমা?

—ঝর্ণার ওপাশে ওই অনন্তমূলীর ঝোপটা দেখতে পাচ্ছিস? ওর ওপরে ওই বড়ো প্রজাপতিটা? কী লাভলি কালার কম্বিনেশন, আর কী জায়াণ্ট সাইজ!

—ধরে আনব কাকিমা?

—না, তুই উড়িয়ে দিবি। আমিই যাচ্ছি ঝর্ণা পেরিয়ে।

—কিন্তু কাকিমা—বাসব প্রতিবাদ করল: ঝর্ণার জলে নুড়িগুলো কিন্তু দারুণ পিছল। দেখছেন না, ওপরে সবুজ শ্যাওলা জমে রয়েছে? যদি একবার পা পিছলে ধপাস্ করে পড়ে যান, তা হলে—ব্যস!

বাসব হেসে উঠল। আর কাছেই কিরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে করে মুখ রাঙা হয়ে উঠল শর্মিলার।

—হয়েছে, তোমাকে আর ওস্তাদী করতে হবে না। শর্মিলা পায়ের জুতো খুলে ফেললেন।

—আমিই এনে দিই না?

শর্মিলা বললেন, থাম বাসু। পাহাড়-জঙ্গলে আমি মেয়েদের নিয়ে এস্ককার্শানে যাই, এসব আমার অভ্যাস আছে। তোকে আর বাহাদুরী করতে হবে না।

পদ্মের মতো একটি পা ঝর্ণার জলে নামল।

কিরণের একবার মনে হয়েছিল আপনি দাঁড়ান, আমি চেষ্টা করে দেখি—কিন্তু শর্মিলার আত্মপ্রত্যয়ে বাধা দিতে তার সাহস হল না। সামনে অনন্তমূলীর ঝোপের ওপর প্রকাণ্ড প্রজাপতিটার বিচিত্রবর্ণ ডানা দুটো কাঁপছিল। সেই দিকে চোখ রেখেই এগিয়ে-

ছিলেন শর্মিলা, তার ফলে নিজের পা থেকে চোখ তাঁর সরে গেল।

তারপরেই চিৎকার করলেন শর্মিলা।

পা পিছলে গেছে—দাঁড়াতে পারছেন না—এবং ঝর্ণাটা পাথরের ধাপে ধাপে যেভাবে নেমে গেছে, তার মধ্য দিয়ে যদি আছড়ে পড়েন, তা হলে যে কোথায় গিয়ে—

কোনোদিকে না তাকিয়ে কিরণ লাফিয়ে পড়ল, শক্ত করে ধরল শর্মিলাকে, সজোরে ঠেলে দিলে এক পাশে। তারপর তারও পায়ের তলায় পাথরগুলো তরল হয়ে গেল—আছড়ে পড়ল সজোরে—যা মুঠোয় ধরতে চাইল তাই পিছলে যেতে লাগল; তারপর জলে আর পাথরে গড়িয়ে গড়িয়ে আছাড় খেতে খেতে, কয়েকটা তীক্ষ্ম আকাশফাটা চিৎকার শুনতে শুনতে কিরণের চেতনা অতলান্ত সমুদ্রে ডুবল।

॥ নয় ॥

বিশ্রী কাণ্ডটার জন্যে লজ্জা যেন ডাক্তারেরই বেশি!

—ছি ছি মশাই, বেড়াতে নিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত আপনাকে—

—আপনি কী করবেন! অ্যাক্সিডেন্টের ওপর তো কারুর হাত নেই।

ডাক্তার রায়চৌধুরী চোখ পাকিয়ে বাসুর দিকে তাকালেন: সব এই লক্ষ্মীছাড়াটার জন্যে। প্রজাপতি আর তুমি কোথাও দেখতে পেলে না—সঙ্গে সঙ্গে কাকিমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

বাসু প্রতিবাদ করে বললে, বা রে, আমি কী করব! আমি তো বললুম, কাকিমা, আপনি যেতে পারবেন না, পাথরগুলো পেছল, আমি ধরে এনে দিচ্ছি। কাকিমা কথা শুনলেন না। তারপর ঠিক কাকিমার পা পিছলে গেল আর কিরণ কাকা—

—হয়েছে, আর ওস্তাদির দরকার নেই। কিন্তু কিরণ কাকা কেন? শুধু কাকা বলতে কী হয়? যত সব ভালগার হ্যাবিট।

আবার ডাক্তার রায়চৌধুরীর সেই সরল ভদ্রতা। কিন্তু ইজি-চেয়ারটার মধ্যে কিরণ একবার নড়ে উঠল, একটুখানি লালের ছাপ পড়ল শর্মিলার গালে। ডাক্তার বলে চললেন, বললুম—চলুন আমার ওখানে, দিন কয়েক রেষ্ট নেবেন, কিন্তু কিছুতেই কথা শুনছেন না।

—আপনি ব্যস্ত হবেন না ডাক্তার রায়চৌধুরী, আমি ঠিক আছি।

—আপনি কেমন আছেন সে কি ডাক্তারকে শেখাবেন মশাই? সঙ্গে সঙ্গেই তো জ্ঞান হারালেন। ভাগ্যিস ঝোপগুলোতে আটকে গিয়েছিলেন, নীচের বড়ো পাথরটার ওপর আছড়ে পড়লে—ডাক্তার শিউরে উঠলেন: কী যে ঘটতে পারত সে-কথা ভাবাই যায় না।

—ট্রাজিডী পর্যন্ত আর গড়াই নি—কিরণ হাসল: প্রহসন পর্যন্ত গিয়েই থমকে গেলুম।

—হাসির কথা নয় মশাই, দেখবেন এসব গায়ের ব্যথা ক'দিনে যায়। বেশি চলাফেরা করবেন না, তা হলে কিন্তু জোর করে এখানকার হেলথ্ সেণ্টারে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেব।

—ভয় দেখাচ্ছেন?

প্রসন্নমুখে ডাক্তার বললেন, অবাধ্য পেশেণ্টকে এক-আধটু ভয় না দেখালে চলে না। অতএব লক্ষ্মী ছেলের মতো বিশ্রাম করুন। আর আপাতত এদের রেখে গেলুম আপনার কাছে—গোটা দুই রোগী দেখে ঘণ্টা-খানেক বাদে এসে তুলে নিয়ে যাব। বাসু?

—কী বলছ?

—লেখার দিকে নজর রেখো। কাকাকে ডিসটার্ব কোরো না।

—আচ্ছা।

বাংলোর বারান্দায় পাশাপাশি দুজন। কিরণ আর শর্মিলা।

লেখা, বাসব আর শর্মিলাকে নিয়ে ডাক্তার কিরণকে দেখতে এসেছিলেন। এখানে এসে তাঁর মনে পড়েছে, কাছাকাছি গুটি দুই রোগী তাঁরই অপেক্ষায় বসে। আর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনজনকে কিরণের কাছে রেখে ঘণ্টাখানেকের জন্যে গাড়ি নিয়ে উধাও হলেন তিনি।

বাসব সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল: জানেন কাকিমা, আমরা যারা স্পোর্টসম্যান, এ-সব আছাড়টাছাড়ে আমাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না। বল নিয়ে ছুটেছি, দারুণ সেণ্টার করব একটা—হঠাৎ বে-আইনীভাবে মারাত্মক চার্জ করল একটা। আছড়ে পড়ে গেলুম—আট-দশ মিনিট সেন্সলেস্, তারপর আবার লাফিয়ে উঠেই—

শর্মিলা বললেন, নিশ্চয়! তোর মতো বীর সংসারে কজন আছে!

ঠাট্টা নয় কাকিমা।—বাসব গম্ভীর হল: সেবার বারাউনিতে এন-সি-সি ক্যাম্প হয়েছে আমাদের। আমরা সবাই—। একটা রোমাঞ্চকর কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক বাধা পড়ল এই সময়। সামনের মাঠটার ভেতরে ঘুরছিল লেখা, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল: দাদা—দাদা—দুটো খরগোস।

—কই, কোথায় রে?

—ওই তো ওদিকে। কী লম্বা লম্বা কান। খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে। দাদা, পালালো পালালো—শগ্‌গীর আয়—আর বলতে হল না, এক লাফে বেরিয়ে গেল। তারও পরে দেখা গেল, কলধ্বনি তুলে ছেলে-মেয়ে দুটি চলেছে খরগোসের পেছনে—কৃষ্ণচূড়ার বীথি যেখানে আকাশে মুঠো মুঠো রাঙা ফুলের অঞ্জলি মেলে ধরেছে, মিলিয়ে গেল তারই আড়ালে।

শর্মিলা পেছন থেকে ডাকতে চাইলেন: বাসু—

—আসছি কাকিমা। এক্ষুণি আসব।

তারপর বাংলোর বারান্দায় পাশাপাশি কেবল দুজন। কিরণ আর শর্মিলা।

মিনিটখানেক চুপচাপ। যন্ত্রণার চমক লাগানো শরীরটাকে ইজিচেয়ারে মেলে দিয়ে কিরণ কৃষ্ণচূড়ার দিকে চেয়ে রইল, আর শর্মিলা মাথা নীচু করে পায়ের সাদা জুতোটাকে লক্ষ্য করে চললেন।

কিন্তু এ-ভাবে চুপ করে থাকার কোন অর্থ নেই। যেন অকারণেই নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকা। শর্মিলা খুব বেশি কথা বলেন না; অহেতুক সংকোচও তাঁর কখনো নেই। কিন্তু কী যে হয়েছে—কিছুতেই কিরণের কাছে তিনি সহজ হতে পারেন না। প্রথম দিন কত সহজে আলাপ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই কোথা থেকে একটা ছায়া উঠে আসছে তাঁর মনে। কেন এমন হল—কেন এমন হয়?

তারপর পরশু মহাকালের মন্দিরে। সেই ঝর্ণার জলে পা পিছলে অতলে গড়িয়ে পড়বার উপক্রম। হঠাৎ দুটি পুরুষের বাহুর আশ্রয়। সমস্ত ভয় ছাপিয়েও শর্মিলার সারা শরীর চমকে কেঁপে উঠেছিল একবার। সেই থেকে কিরণের সঙ্গে কথা বলা যেন আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। অথচ ব্যাপারটার ভেতরে অস্বাভাবিকতা কোথাও ছিল না। তাঁর বিপদ থেকে কিরণ তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, সমস্ত স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে যা শোভন আর সঙ্গত। কেন এত অস্বস্তি বোধ করছেন শর্মিলা? না, এসব-দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা উচিত।

শর্মিলা আস্তে আস্তে বললেন, আমার গোঁয়াতুর্মির জন্যেই আপনার এই দুর্ভোগ। আপনার কাছে কী বলে যে ক্ষমা চাইব জানি না।

—মিথ্যে ক্ষমা চাইতে যাবেন কেন?—কিরণ হাসল: দুর্ভোগ আমার অদৃষ্টে ছিল, আপনি উপলক্ষ মাত্র।

—অদৃষ্ট মানেন আপনি?—শর্মিলা আরো সহজ হতে চাইলেন।

—সব সময় নয়। কিন্তু অদৃষ্ট না হলে আপনাদের কুকুর অমন করে আমার খাতা রাহাজানি করত আর আলাপ হত আপনাদের সঙ্গে?—কিরণ একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে শর্মিলার শান্ত-গম্ভীর মুখ আর কুমারীর মতো শুভ্র-উজ্জ্বল সীমন্তটির দিকে তাকালো: অদৃষ্ট না হলে অমন করে ঝর্ণার ভেতরে কি আপনার পা পিছলে যেত আর আমি ওইভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়তুম?

—তা হলে অদৃষ্ট নয়, দুরদৃষ্ট বলুন।

কিরণ লঘুভাবে বললে, না, ভাগ্য। আর ভাগ্য যদি এ-ভাবে বারে বারে ফিরে আসে, আমি দুঃখিত হবো না।

কৌতুক। শিভালরি দেখানোর সুযোগ। অন্তত কথাটাকে সেই দিক থেকেই নেওয়া যেতে পারত অনায়াসে—এটুকু রসবোধ শর্মিলার আছে। কিন্তু শর্মিলা যেন নিবে গেলেন। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিভাবে শিউরে উঠেছিল তাঁর—সমস্ত ভয় ছাপিয়েও অনুভব করেছিলেন—যেন কোথা থেকে দুটি বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে অমিতাভ এসে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

শর্মিলার মনে কোথাও যেন মেঘ নামছে, অনুভব করলে কিরণ।

—রাগ করলেন না কি? মাপ চাইছি তা হলে।

—না—না, রাগ করব কেন? —জোর করে হাসতে চাইলেন শর্মিলা; কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন: গায়ের ব্যথা আজকে কমেছে আপনার?

—অনেকটা। তবে হাঁটতে কষ্ট হয় এখনো।

—বেড়ানো-টেড়ানো সব বন্ধ?

কিরণ মাঠের ওপর দিয়ে চোখের দৃষ্টি সামনে ছড়িয়ে দিলে—একেবারে দূর পাহাড়ের সীমায় গিয়ে চোখ ঠেকল। মহাকালের

মন্দিরটা ওরই ওপর আছে কোথাও—এতদূর থেকে নজর চলে না।

—তাতে ক্ষতি হয় না। এখানে বসে বসে অনেকখানি পৃথিবী দেখতে পাই। অনেক হাওয়া আসে।

শর্মিলা আবার একটু চুপ করে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে চিঠি দিয়েছেন ?

কিরণ হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা থমকে গেল ঠোঁটের কোণায়। শুকনো গলায় বললে, কী হবে লিখে ? দাদা-বৌদিকে মাসে মাসে টাকা পাঠালেই চলে। আর আমার স্ত্রীকে চিঠি লেখবার কোনো অর্থ হয় না—সে তো জানেন।

শর্মিলার মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি বিষণ্ণ-করুণা ভারী হয়ে উঠল চোখের পাতায়। কোমল গলায় শর্মিলা বললেন, কিছুতেই কি ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই ?

—ডাক্তারেরা তাই বলে।

এত বড়ো লেখক, এত নাম—অথচ কী শূন্যতা নিয়ে লোকটার দিন কাটে! স্নেহ নেই, সহানুভূতি নেই, মনের জন্যে এতটুকুও আশ্রয় নেই কোথাও। যার কাছে সেবা ছিল, মমতা ছিল, ছিল মুক্তি—সে স্ত্রী পাগল। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক। মনে পড়ল প্রথম দিন ঠাট্টা করে কল্যাণী বলেছিলেন—ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে দেখব, মেয়েদের সম্পর্কে ওঁর এত অশ্রদ্ধা কেন। হয়তো এখানেই সে জিজ্ঞাসার জবাব আছে। অসুস্থ স্ত্রীর ভাঙা মনের আয়নায় মেয়েদের কতগুলো বিকৃত প্রতিবিম্বই দেখেছে সে—তাই লোকটা কোনো মেয়েকে শ্রদ্ধা করতে শিখল না।

শর্মিলা ঠোঁটদুটোকে শক্ত করে চেপে ধরলেন একসঙ্গে। অথচ, লেখকের কলমেই মানুষ জীবনের সত্যকে দেখে। একটা ভুল সত্যকে এমনভাবে প্রচার করে যাওয়ার কী অধিকার আছে কিরণের ? তার আত্মীয়-স্বজন ছাড়া, তার পাগল স্ত্রী ছাড়া বাংলা

দেশে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে কি কখনো কিরণের পরিচয় ঘটে নি? অথবা লোভী স্বার্থপর আরো ছু-একজনকে যদি দেখেই থাকে—তারাই কি সব?

শর্মিলার ইচ্ছে করল, এই মানুষটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলেন—জীবনের যে আরো অর্থ আছে সেই কথাটা বুঝিয়ে দেন তাকে, শিল্পীকে উদ্ধার করেন এই অপঘাত থেকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, তাঁর কী গরজ? তিনি তো অমিতাভর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমস্ত হিসেব মিটিয়ে দিয়ে একটা শান্ত বৈরাগ্যের মধ্যে তলিয়ে গেছেন। কিরণ বসুর উপন্যাসে মানুষকে কোন চোখ দিয়ে দেখা হয়, এ নিয়ে গবেষণা করে তাঁর কী লাভ?

কিরণ বললে, কী ভাবছেন?

—কিছু না।—শর্মিলা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, সারা দিন বসে থাকেন চুপচাপ—একা একা লাগে না?

—না। নিজেকে নিয়ে একা থাকার অভ্যেস আমার আছে।—কিরণ ইজিচেয়ারের হাতল থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে সিগারেট ধরালো একটা: কলকাতার ভিড়ের মধ্যেও একা থাকতে পারি।—মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ঠিক একাও নয়, তখন মনের ভেতরে অনেকগুলো মানুষ এসে ভিড় করে।

—উপন্যাসের পট।

—ঠিক তাও নয়—কতগুলো ছাড়া ছাড়া চিন্তা এলোমেলো চরিত্র। কখনো জমাট বেঁধে উপন্যাস হয়ে ওঠে, কখনো বা দল ছাড়া টুকরো টুকরো মেঘের মতো দিকে দিকে মিলিয়ে যায়।

—এখানেও কি সেই মেঘের খেলা?

—বলতে পারব না। আপাতত এই মাঠ আছে, দূরের পাহাড় আছে, কৃষ্ণচূড়া আছে, আর যদি অভয় দেন তো বলি।—কিরণ আর একবার শর্মিলার শান্ত-গম্ভীর মুখের দিকে চাইল, দেখল, কুমারীর মতো তাঁর উজ্জ্বলশুভ্র-সীমন্ত, তারপর অপেক্ষা করে রইল।

শর্মিলা যেন নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পেলেন। তবু হাসতে চেষ্টা করলেন, বললেন, অভয় দিচ্ছি—বলুন।

—আর এই পটভূমির ভেতরে আপনাকে খুব উজ্জ্বল রং দিয়ে আঁকতে ইচ্ছে করে।

—আমাকে?—চেষ্টা করেও একবার সহজ হতে পারলেন না শর্মিলা, আবার সেই অকারণ লজ্জায় তাঁর চোখ দুটি যেন বুজে আসতে চাইল: আর কি লোক পেলেন না?

—অন্য কারুর কথা তো ভাবি নি। প্রথমদিন আপনাকে দেখবার পরেই মনে হয়েছে—এখানে আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই মানায় না। ঠিক করেছি, মিষ্টি রোমান্টিক উপন্যাস লিখব একটা—নাম দেব 'কৃষ্ণচূড়া'।

'কৃষ্ণচূড়া'র মঞ্জরীও দেওয়া যেতে পারে—কী বলেন?

কোনো কারণ নেই, তবু একটা অর্থহীন নেশায়, একটা সুখের মধ্যে যেন মগ্ন হয়ে যেতে লাগলেন শর্মিলা। বাতাসে এখন কৃষ্ণচূড়ার কষায় গন্ধ, হরিয়ালের ডাক, মাথার ওপর শরতের আকাশ যেন নিবিড়-নীল চোখের মতো চেয়ে আছে। যেন শর্মিলাকে ঘিরে ঘিরে একটা অপূর্ব সম্মোহন নেমে আসতে লাগল—যেন আলো-বাতাস-আকাশ-গন্ধের একটা সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু তারপরেই তীক্ষ্ণ আঘাত পড়ল একটা। চকিত যন্ত্রণায় শর্মিলা সম্মোহন থেকে জেগে উঠলেন।

সিগারেটে একটা জোরালো টান দিয়ে কিরণ শুকনো হাসি হাসল: অবশ্য মনে মনে ঠিকই জানি, এ উপন্যাস কোনোদিনই লেখা হবে না। এ রোমান্টিক পাগলামিই বা কতক্ষণ থাকবে? তিন পাতা লেখবার পরেই পাণ্ডুলিপি নিজেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব—কী হল আপনার?

শর্মিলার মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছিল। বললেন,

না—কিছু হয়নি। আমি দেখছি, বাসু আর লেখা গেল কোন দিকে।

কিরণ কোনো কথা বোঝাবার আগেই বারান্দা থেকে নেমে গেলেন শর্মিলা, লজ্জায়, অপমানে, মাটিতে তাঁর মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। কিসের সুখ—কিসের সম্মোহন নিয়ে তারা ভালোবাসে না—সংসারে কারো স্নেহে প্রেমে তাদের প্রয়োজন নেই।

বাসব আর লেখাকে একটু দূরেই পাওয়া গেল। বাসব মাঠে-চরা কার একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়ায় সোয়ার হতে চাইছিল আর লেখা হাততালি দিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছিল তাকে।

তীব্রকণ্ঠে শর্মিলা ডাকলেন ঃ বাসব—লেখা!

গলার আওয়াজটা নতুন ধরণের। ছেলে-মেয়েরা ঠিক এই ধরণের ডাক শোনবার জন্যে তৈরী ছিল না। ছুটে এল তারা।

—কী হয়েছে কাকিমা?

কী আক্কেল তোমার বাসু? আমাকে পরের বাড়িতে একলা বসিয়ে রেখে—

বাসু আশ্চর্য হয়ে গেল। কিরণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যে পর্যন্ত এগিয়েছে, তাতে পরের বাড়ির কথাটা কানে ঠেকল তার।

—কিন্তু বাবা বলেন, কাকাবাবু—

শর্মিলা ধমকে উঠলেন ঃ থাক, হয়েছে এখন এসো আমার সঙ্গে।

ঠিক সেই সময় দূরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। ডাক্তার রায়চৌধুরী ফিরে আসছেন। এক ঘণ্টার আগে কাজ মিটে গেছে তাঁর।

সেই রাত্রে, শোওয়ার আগে, অমিতাভর ছবিতে ধূপকাঠি জ্বেলে দিলেন শর্মিলা। প্রণাম করলেন গলায় আঁচল জড়িয়ে।

'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাকে। তুমি চলে যাওয়ার পর

প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, জীবনে তোমাকেই আমার ধ্যানের আসনে বসিয়ে রাখবো, পুজো করব প্রত্যেক দিন। কিন্তু মানুষের মন দুর্বল, মাঝে মাঝে যদি ভুলে যাই তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে মনে করিয়ে দিয়ো।'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত চোখের জল পড়ল শর্মিলার। তারপর ভোরে ঘুম ভাঙতেই সামনের শেলফ থেকে সরিয়ে দিলেন কিরণ বসুর উপন্যাস, তারা চাপা পড়ল কতগুলো পুরোনো খবরের কাগজের তলায়।

॥ দশ ॥

রাজেনবাবু, ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়ে আপনাকে আর চিন্তিত করতে চাই না। কাজেই গোড়াতেই জানিয়ে রাখি, যদিও চার-পাঁচ দিন হাত-পা ছড়িয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতে হয়েছিল, এখন একেবারে যাকে বলে হেল অ্যাণ্ড হার্টি। আবার আপনার মাঠ, নদী, গাছপালা আর পাহাড়ের ছায়ার ভেতরে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কী হয়েছিল? বলবার মতো এমন কিছু নয়। ডাক্তার রায়-চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে সেই বিখ্যাত মহাকালে বেড়াতে গিয়েছিলুম। বেশ জায়গাটি। সেখানে মনের ভুলে কিছু চপলতা করে থাকব হয়তো, তাই আপনাদের মহাকাল একটি ছোটখাটো ধমক দিয়েছিলেন। দেখলুম, নাস্তিককে ঠিকই চিনতে পেরেছেন, কানে ধরে সেটা বুঝিয়েও দিলেন।

কিন্তু থাক ও সব কথা।

আচ্ছা রাজেনবাবু, প্রকৃতি সম্পর্কে কী ধারণা আপনার? দার্শনিকেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কবিরা বিস্তর কবিতা লিখেছেন, তার জবাবে মানুষ আবার শহরের জয়গান গেয়েছে,

প্রকৃতিকে ঠাট্টা করেছে, ধিক্কার দিয়েছে। তবুও ইয়োরোপের মানুষ ছুটির দিনে নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে, পাহাড়ের উপত্যকায় একটি ছোট্ট গ্রামের বাড়ির সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকে। প্রকৃতিকে স্বীকার করি আর না-ই করি, একটা শক্তি তার আছেই, সে আমাদের টানে।

এই টানটা কিসের? মুক্তির, আনন্দের? খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে নীল আকাশে ডানা মেলবার? ক'দিনের জন্যে নিজের সমস্ত বোঝা আর গ্লানি থেকে নিস্তার পেয়ে নবজাতকের মতো নতুন হয়ে ওঠবার? ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াবার? এ কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলবেন, ভিক্তর ইয়ুাগো বলবেন, রবীন্দ্রনাথ বলবেন। আমি বিশ্বাস করি না।

তত্ত্বে যেতে চাই না, সোজা কথায় বলতে পারি, ডাইভারশ্যন। মুখ বদলায়, চোখ জুড়োয়, অনেকগুলো রংকে একসঙ্গে দেখি, কিন্তু স্নায়ুকে তারা পীড়ন করে না। বাতাসে ব্যাক্‌টিরিয়া নিশ্চয় থাকে, কিন্তু তারা সবাই-ই মৃত্যুর পরোয়ানা বয়ে আনে না। একটা পাহাড়ী নদীর ঠাণ্ডা স্রোতে স্নান করবার মতো, কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে ভারি শুচি, ভারি পরিচ্ছন্ন মনে হয়।

কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়। জানেন, মধ্যে মধ্যে আমারও মনে হয়, প্রকৃতির একটা নিঃশব্দ শক্তি আছে—সে ধীরে ধীরে মানুষকে বদলে দিতে পারে। এই জন্যেই কি সাধু-সন্নিসিরা পাহাড়ে পালায়? অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' আমাকে উদাস করত। অনেকদিন পড়ি নি, আজকে কেমন লাগবে জানি না। তবু মন আর চিন্তার যে নৈরাজ্যের ভেতরে এখন কাল কাটে, নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন করে যে যন্ত্রণার আনন্দ আস্বাদন করি, প্রকৃতির মধ্যে ফিরে এলে সেগুলোকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তখন পুরোনো মূল্যবোধগুলোকে স্বীকার করতে ভালো লাগে।

আমি আপনার বাংলোর বারান্দায় বসে এই চিঠিটা লিখছি। এখন বেলা দশটার কাছাকাছি। আকাশে জোরালো রোদ নেই, মেঘ এসে থেকে থেকে সূর্যকে আড়াল করছে। মনে হচ্ছে এক পশলা বৃষ্টি-বাদল দেখা দেবে আজকালের ভেতরে। হাওয়ায় ভিজে ভিজে ভাব একটা। সেই বাতাসে দেখছি সামনে কয়েকটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ—ফুলে ফুলে একাকার—তারা সমানে পুষ্পবৃষ্টি করছে। প্রকৃতির মজাটা দেখুন—সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষ্ণচূড়ার তলায় একটি মেয়েকে যেন ফুটিয়ে তুলতে চাইছে—ঠিক একটা রোমান্টিক ক্যালেণ্ডারের মতো। মেয়েটি শ্রীমতী, কিন্তু এমন কিছু অসাধারণ রূপসী নয়; তার চাইতে ঢের বেশি সুন্দর মুখ চোখে পড়ে কলকাতায়, অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ যে নেই তা-ও নয়—কিন্তু মন ঠাট্টা করে বলে, কী হবে? অথচ দেখুন, এখানে একটি সুশ্রী সাধারণ বাঙালী মেয়ে কত সহজে আমার মনের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। এখন আমি তাকে ভালোবাসতে পারি—পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ যে-ভাবে ভালোবাসত; আমি তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারি—চল্লিশ বছর আগেও যে-ভাবে কবিতা লেখা যেত। তারপর একদিন তাকে একটা পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে আপনাকে চিঠি লিখতে পারি—"দয়া করে আমার এই কবিতার বইখানা ছাপুন রাজেনবাবু—কবিতাগুলো আমার স্বপ্ন আর কামনা মিশিয়ে লেখা।"

কিন্তু ভয় নেই, এ-সবই কল্পনা। আমার কোনো প্রেমিকাও জোটে নি, কোনো কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমি আপনাকে তাড়া করব না। শুধু বলতে চাইছিলুম, প্রকৃতি মানুষের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়; তার কতগুলো হিপনটিক আকর্ষণ আছে, যে-কোনো বুদ্ধিমান লোককেও কিছুক্ষণের জন্যে সে ভোঁতা করে দিতে পারে—তার পাহাড়ের ছায়ায়, তার কৃষ্ণচূড়ার রঙে, তার হাওয়ায়, তার মহাকাল পাহাড়ে অজস্র প্রজাপতির পাখায় পাখায় মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে।

ভেবেছিলুম, মাসদেড়েক থাকব। এখন মনে হচ্ছে, অতটা দেরি সইবে না। যে-কোনো একদিন ফিরে আসতে পারি আমার চেনা পুরোনো জটিল কলকাতায়, আমার স্বাভাবিকতার ভেতরে।

চিঠিটা বড়ো হয়ে গেল। যদি বেয়ারিং হয়, দয়া করে ফেরৎ পাঠাবেন না। আশা করি, ভালো আছেন।

লেখা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল কিরণ। সামনে মাঠের বুকে ছড়ানো ছোট ছোট পথগুলোতে আজ মানুষের চলাচল কিছু বেশি। বাঁক কাঁধে করে, ঝাঁকা নিয়ে লোকজন আসছে—তরি-তরকারী, হাঁড়িকুঁড়ি, মুরগী, ধূলো উড়িয়ে মোষের গাড়িও আসছে ত্ব-চারখানা। স্টেশনের কাছে নিশ্চয় আজ হাট বসবে।

হঠাৎ তার হাট দেখতে ইচ্ছে করল। অনেক দিন দেখে নি। আজ বিকেলে একবাব যাবে স্টেশনের দিকে।

চল্‌তি হাটুরে লোকজনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ঘোর ঘোর হয়ে এল। আবার সেই দিনগুলোকে মনে পড়ল; যখন রাজহাঁসের পালক খুঁজতে বেরিয়ে সে পথ হারিয়েছিল। তাদের গ্রামেও হাট বসত। সেই মস্ত বটগাছটা—কতদূর থেকেও দেখা যেত সে পাহাড়ের মতো মাথা তুলে রয়েছে। তাকে ঘিরে ঘিরে সারি সারি খড় আর টিনের চালা। গরুর গাড়ি এসেছে দূর দূর থেকে—খড় আর ধূলোর গন্ধ! হাটে পদ্মপাতায় করে চুণো মাছ বিক্রি হয়, ময়রার দোকান থেকে জিলিপি ভাজার গন্ধ ওঠে, চালের পাহাড় দেখা যায়, বেলোয়ারী চুড়ি আর রঙিন কাপড় কেনে মেয়েরা, লক্ষ্মী আর সত্যনারায়ণের পাঁচালী বিক্রি হয়, কোথাও বা ভালুকওলো নাকে দড়ি পরিয়ে ধুমো ভালুকটাকে লাঠির তালে তালে নাচায়।

এখনো কি পাড়াগাঁয়ে তেমনি করে হাট বসে? হয়তো বসে, কিন্তু চালের পাহাড় আর কেউ চোখে দেখতে পায় না।

কিরণ আজকে হাট দেখতে যাবে।

কিন্তু হাট দেখতে যাওয়ার কথাতে মনে হল, তা হলে ডাক্তার রায়চৌধুরীর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হবে। আর নিশ্চয় দেখা হয়ে যাবে কারো সঙ্গে। তখন আর এড়ানো যাবে না, ঢুকতেই হবে ও-বাড়িতে।

আর যে-চিন্তাটাকে এতক্ষণ জোর করে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিল, সেইটেই আবার ফিরে এলো মর্মের কাছে। শর্মিলা।

সেদিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে গিয়েছিলেন। দুজনের নিঃসঙ্গতার ভেতরে কী একটা যেন আবেশের মতো ঘনিয়ে এসেছিল, কোথা থেকে তার যেন সুর কেটে গেল, কী যেন এলোমেলো হয়ে গেল হঠাৎ। কিরণ কিছু বুঝেছে কি? অথবা, কিছুই বুঝতে পারে নি?

কেন রাগ করলেন শর্মিলা?

'এই রোমান্টিক মুহূর্তগুলো কতক্ষণই বা থাকবে—একটু পরেই মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়—' এমনি একটা আলোচনা যেন চলছিল। কিন্তু তাতে কেন রাগ করতে যাবেন শর্মিলা? কোথায় তাঁর বাজল?

একটু আগেই রাজেনবাবুকে যে চিঠিটা লিখছিল, তাতে কৃষ্ণচূড়ার বীথির ছায়ায় একটি কাল্পনিক মেয়েকে আমদানি করেছিল সে। কিন্তু সবটাই কল্পনা? একদিক থেকে তাই—এই নির্জনবাসের মোহ তো একটুকরো স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। যখন চলে যাবে, ট্রেনের চাকায় একটার পর একটা স্টেশনের পিছিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দিনগুলো দূরে-দূরান্তে চলে যাবে। কোনোদিন হয়তো বড়ো একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর দেখে মনে আসবে ডগলাসের স্মৃতি, পথচলতি কয়েকটি স্কুল-কলেজের ছাত্রীর

তরল হাসির শব্দ আর ঝলক হাসিকে মনে পড়িয়ে দেবে, কখনো স্বপ্নের ভেতর নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় দেখা দেবে মুক্তদ্বার মহাকালের মন্দির, অচেনা সেই হলুদ ফুলের বুনো গন্ধ আর ঝর্ণার দু'ধারে প্রজাপতির দল। তাদের ভেতর ঝিকঝিক করবে একটি শ্বেতবিন্দু—শর্মিলা।

ব্যস, এই পর্যন্তই। তাই শর্মিলা থেকেও নেই, রাজেনবাবুকে মিথ্যে কথা সে লেখে নি। আর প্রেম? একবারের জন্যে উন্মনা হল কিরণ। সন্দেহ নেই, এই মেয়েটি তাকে আকর্ষণ করে, কাছে এলে ভালো লাগে, চলে গেলে তার কথা ভাবতে ভালো লাগে। যে প্রকৃতির কথা সে লিখছিল, তার সেই অদৃশ্য শক্তিটাই হয়তো শর্মিলার দিকে তার মনকে টানে—সেই প্রথম দেখা একটা অপরূপ আবির্ভাবের মতো দু'চোখ তাব জুড়ে আছে।

আরো একটা কারণ আছে হয়তো। শর্মিলাকে ঘিরে সেই বেদনার শুভ্রতা। সেই অকাল বৈধব্যেব ট্রাজেডি। শান্ত মুখে করুণ গম্ভীর মগ্নতা, তারই ভেতরে কখনো বিদ্যুতের মতো বুদ্ধিতে জ্বলে ওঠে চোখ, কখনো কৌতুকে ঝকঝক করে ওঠে। তবু মনে হয়, শর্মিলাকে যতটুকু দেখা যায়—তারই থেকে খবর আসে, অনেকখানিই তাঁর দেখা যায় না। সে না-দেখাব আড়ালটুকু সরিয়ে দিতে প্রলোভন জাগে, তার একজন ভক্ত পাঠিকার মনের দরজার বাইরেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে—এইটেই সে কিছুতে সহ্য করতে পারে না।

আচ্ছা, সত্যিই কি সে শর্মিলা সম্পর্কে দুর্বল হতে সুরু করেছে?

ছি—ছি, এ-সবের কোনো মানে হয়? ডাক্তার রায়চৌধুরী মিশুকে মানুষ বলে এমনভাবে আলাপ করে নিয়েছেন, নইলে ক'দিনেরই বা পরিচয়? তাঁদের আতিথেয়তা আর ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে এ-সব কি অন্যায় চিন্তা তার? ভদ্রমহিলা বিদুষী, অধ্যাপিকা, কপালগুণে তার লেখা কিছু কিছু পড়েন—এ-সব

চিন্তার আভাস পেলেই বা কী ভাববেন। নাঃ, মনের দিকে থেকে কিরণ ভারি নোংরা হয়ে যাচ্ছে।

শঙ্কু এল।

—বাবু, চান করবেন না?

—এত তাড়াতাড়ি?

—তাড়াতাড়ি কোথায় এগারোটা বাজল। আমাকে আবার হাটে যেতে হবে।

—হাটে এখন কেন? সে তো বিকেলে।

শঙ্কু হাসল: না বাবু, এখানকার হাট দুপুরেই শেষ হয়ে যায়। দূর থেকে লোক আসে কি না, সাঁঝের আগেই তাদের ফিরে যেতে হয়। আপনি চটপট খেয়ে নিয়ে আমাকে ছুটি দেবেন, নইলে হাটে কিছুই পাওয়া যাবে না।

—আমিও তো হাটে যাব ভেবেছিলুম।

—বেশ তো, চলুন আমার সঙ্গে।

—না, এই দুপুরে আর নয়। যাওয়া যাবে আর একদিন।

দুপুরটা কিছু বই পড়ে, কিছু ঘুমিয়ে, ছাড়া-ছাড়া কতকগুলো ভাবনার ভেতরে একরকম ভাবে কেটে গেল। শুধু একটা চিন্তা কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ছে না। সেদিনের পর রায়চৌধুরী রোজই এসেছেন, ছেলেমেয়েরাও এসেছে কয়েকবার, এমন কি কল্যাণী পর্যন্ত এসেছেন একদিন। কিন্তু শর্মিলা আর আসেন নি।

রাগ করেছেন? কেন?

বিকেলের দিকে মনে হল, মাথাটা কেমন ভার ভার হয়ে উঠেছে। রাত্রে জানলা খোলা ছিল, একটু ঠাণ্ডা লেগে থাকবে খুব সম্ভব। শঙ্কু হাট করে ফিরে চা দিয়েছিল, কিরণ তার সঙ্গে একটা অ্যাসপিরিন জাতের বড়ি গিলে ফেলল। তারপর কিছুক্ষণ বসে রইল চুপচাপ—যদি ডাক্তার রায়চৌধুরী এসে পড়েন, যদি তাঁর সঙ্গে—

কিন্তু কেউ-ই এলেন না। ডাক্তার ব্যস্ত মানুষ, নিশ্চয় কোথাও কলে বেরিয়ে গেছেন।

শেষ পর্যন্ত গায়ে পাঞ্জাবী আর পায়ে কাবলী চটি গলিয়ে কিরণ বেড়াতে বেরুল। চলল নদীর দিকেই।

পশ্চিমের আকাশে মেঘ আছে এখনো, কিন্তু বৃষ্টির ভাবটা আর নেই, নদীর জলে সেই মেঘের ওপর সোনালী রোদ জ্বলছে। নদীর জলে সেই মেঘের ছায়া পাথরে পাথরে ভেঙে যাচ্ছে—যেন টুকরো টুকরো কাঁচা সোনা ভেসে চলেছে। মোটা মোটা বালি দানার ওপর আজও খঞ্জন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে কাদাখোঁচা। কিরণ বালির ওপর দিয়ে এগিয়ে চললো।

এখানে ওখানে হাটফেরৎ মানুষ নদীর হাঁটুজল পার হয়ে তরল কাচের মতো জলের রংটাকে ঘোলা করে দিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছিল, পায়ে চলার পথ ধরে ধরে মিলিয়ে যাচ্ছিল শালবনের আড়ালে। একজন গেল একটা মাদল বাজাতে বাজাতে, কিরণ তা-ও দেখল। আর তারই পরে দেখল শর্মিলাকে।

বালির ডাঙার ধারেই কতগুলো ঝোপঝাড়। তারই পাশে দাঁড়িয়ে, ঘাড় নীচু করে ঝোপের ভেতর কী দেখছিলেন শর্মিলা। বিকেলের মেঘ-মাখানো রোদে সোনার মূর্তির মতো মনে হল তাঁকে।

শর্মিলা এখানে—একা! কিরণ দাঁড়িয়ে পড়ল।

আর শর্মিলা চোখ তুললেন। তৎক্ষণাৎ সোনার রোদ তাঁর মুখে রাঙা হয়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড শুধু রইল নদীর জলের শব্দ, পাখির ডাক, অনেক দূরে চলে-যাওয়া সেই লোকটার মাদলের শব্দ। তারপর কিরণ সহজ হল কয়েক পা এগিয়ে গেল সামনে।

—নমস্কার।

উত্তরে শর্মিলা দু'হাত জড়ো করলেন কপালে। আঙুলের রঙে মিশে থাকা ছোট একটি আংটি চিকচিক ক'রে উঠল।

কিরণ বললে, বেড়াতে এসেছেন ?

শর্মিলা এবার হাসলেন। বললেন, না, ঠিক বেড়াতে নয়। ক্যাকটাসের খোঁজে এসেছিলুম।

—ক্যাকটাস ?

—ওটাও আমার একটা পাগলামি।—শর্মিলা চোখ নামালেন : কিছু কিছু কালেকশন করি। এখানে দু-একটা ভালো স্পেসিমেন রয়েছে, তাই দেখছিলুম।

—কিন্তু একা কেন ? আপনার ব্যাটালিয়ন কোথায় ? বিশেষ করে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট বাসব ?

—শর্মিলা আবার হাসলেন : মধ্যে মধ্যে ওদের ছুটি দিয়ে একাই বেরুই।

—একা বেরুনো কি ভালো ? প্রজাপতির অভিজ্ঞতা কি ভুলে গেলেন ?

শর্মিলা আর একবার রাঙা হলেন : ছি—ছি—

কিরণ বললে, আচ্ছা, থাক-ও-কথা। আজ তো আর কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই। বলুন, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—সাহায্য আজ আর করতে পারবেন না। গাছ দেখছি, কিন্তু দা কিংবা খুরপী নইলে তোলা যাবে না। কাল বাসুকে কিংবা চাকরকে সঙ্গে করে আনব।

কিরণ বললে, আমার কাছে একটা পেন-নাইফ আছে। কোনটা তুলতে হবে বলুন-তো ? ওই চারাটা তো ? দেখুন, তুলে দিচ্ছি এক্ষুণি।

—না-না, শিকড় কেটে ফেলবেন। তা ছাড়া বড্ড কাঁটা ওখানে —শর্মিলা প্রতিবাদ করলেন, কিছু করতে হবে না আপনাকে।

—শিকড় কাটব কেন ? ঠিক তুলে আনব, দেখুন—কিরণ এগিয়ে গেল।

—আবার বুঝি কষ্ট দেবেন আমাকে ? কী ভেবেছেন—বলেই শর্মিলা খপ করে কিরণের হাত চেপে ধরলেন: চলে আসুন বলছি—

কিরণ সরে এল, হাত ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আরো দূরে সরে গেলেন শর্মিলা। কিন্তু সেই ছোঁয়াটুকু যেন পলকের ভেতরে অনেক বেশি অর্থ বয়ে আনল কিরণের কাছে, আর শর্মিলার দুই চোখ লজ্জায় ভয়ে নিবিড় হয়ে রইল।

সেই পড়ন্ত বিকেলের রোদে যেন কনে-দেখা আলো পড়ল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল দুজন। নদীটা বয়ে চলল একটানা, মাদল বাজতে লাগল ওপারের শালবনের ছায়ায়। আর নিজের যে মনটাকে খানিক আগে অসম্ভব রোমান্টিক কল্পনায় মোহাচ্ছন্ন বলে ভেবেছিল কিরণ—সেই মুগ্ধ মনটাই এখন তার সবকিছু ছাপিয়ে সত্য হয়ে উঠলো।

কিরণ শর্মিলার আরো কাছে এসে দাঁড়ালো।

—আপনি সেদিন রাগ করেছিলেন আমার ওপর।

লজ্জায় নত চোখ দু'টি যেন জোর করে তুলে ধরলেন শর্মিলা।

—করেছিলুম।

—কেন ? কী অপরাধ হয়েছিল আমার ?

শর্মিলা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সেটা যদি আপনি না বুঝে থাকেন, তবে আর বোঝবার দরকার নেই।

—আপনাকে বলতে হবে।

শর্মিলা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ঘাড়ের ওপর কয়েকটা ঝুরো চুল উড়তে লাগল হাওয়ায়, জ্বলতে লাগল সোনার হারের সরু রেখাটি। বললেন, আজ নয়। আজকে আমার ভয় করছে। আমি—শর্মিলা একবার থামলেন: আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আর একদিন বলব।

—কিন্তু কিরণের স্বর গভীর হয়ে উঠলো : কিন্তু এমন করে আর একটা দিন তো ফিরে আসবে না। আপনি আবার নিজেকে সকলের আড়ালে লুকিয়ে ফেলবেন।

শর্মিলা মুখ ফেরাতে চাইলেন, পারলেন না। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললেন, কাল এখানেই দেখা হতে পারে। এই সময়।

—ঠিক আসবেন ?

—আসব কিন্তু আজ আর নয়—আমি যাই—

কাঁটা ঝোপটার পাশ দিয়ে, একটা সরু পথের রেখা ধরে বিকেলের শেষ আলোর ভেতরে শর্মিলা যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেলেন। আর অনেকক্ষণ ধরে, নদীর জলের শব্দ আর পাখির ডাকের সঙ্গে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পেল কিরণ।

রাত্রে ঝিমঝিম করে গানের মতো বৃষ্টি চলল, সকালের রোদ পৃথিবীর ভেজা চোখের জল মুছিয়ে দিলে, কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি ঝরল, দূরের পাহাড়ে ক্লান্ত হয়ে মেঘ ঘুমুল, সমস্তটা দিন নেশার ভেতরে কেটে গেল কিরণের।

তারপরে বিকেল। সেই নির্জন নদীর ধার। আজ হাটবার নয়—একান্ত হয়ে পাশাপাশি বসার কোথাও কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু বিকেল ডুবল, তারা উঠল, রাত হল, কেউ এল না। ব্যর্থ প্রতীক্ষার নির্বোধ প্রত্যাশায় কিরণ তবুও ভাবতে লাগল : এখনো আসতে পারে, এখনো সময় যায় নি।

শেষে ভুল ভাঙল তখন, যখন অনেক দূরের একটা পেটা ঘড়িতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসতে লাগল রাত ন'টার আওয়াজ, তখন চমকে তাকিয়ে দেখলো দূরে কাছে একটি আলোর রেখা কোথাও নেই, নিতল নিথর হয়ে মৃত্যু-মূৰ্ছিত রাত নেমে এসেছে।

॥ বার ॥

রাজেন্দ্রবাবু চমকে উঠলেন, আরে, আপনি।

—কেন, এত অবাক্ হওয়ার কী হল?—কিরণ চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল : ফিরে এলুম।

—বললেন, একমাস দেড়মাস থাকবেন, শরীরটা ভালো করে ফিরবেন, কিন্তু পনেরো দিন না যেতেই?

রাজেনবাবুর টিন থেকে একটা সিগারেট টেনে নিলে কিরণ : ভালো লাগল না।

—কিন্তু পরশুও তো আপনার চিঠি পেয়েছি। তাতে ফিরে আসার তো কোনো কথা ছিল না।

—মত বদলায়। সেটা পাঁচ মিনিটেই বদলাতে পারে।

রাজেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন কিরণের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সত্যিই চেঞ্জে আপনার কোনো কাজ হয় নি দেখছি। যেন আরো শুকিয়ে গেছেন। চাকরটা কি যত্ন আত্তি করে নি?

—মিথ্যেই আপনার শম্ভুর নামে অপবাদ দেবেন না মশাই। সে বেচারা প্রাণপণে যত্ন করেছে, সঙ্গে গিন্নী থাকলেও তার বেশি করতে পারত না। বরঞ্চ, পারেন তো আপনার ওই ভৃত্যটির কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেবেন আমি বেশ ছিলুম ওখানে।

—বেশ ছিলেন তো শুকিয়ে গেলেন কেন?—হঠাৎ রাজেনবাবুর মনে পড়ে গেল : ভালো কথা, কী একটা অ্যাক্সিডেণ্টের কথা যেন লিখেছিলেন। কী হয়েছিল মশাই, বলুন তো?

কিরণ হাসতে চেষ্টা করল : ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—

'ঘোড়ায় চড়িল,
আছাড় খাইল।'

অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়লেই আছাড় খেতে হয়। পাহাড় সম্পর্কেও ওটা লেখা উচিত ছিল। ও ছেড়ে দিন। দু' দিন গায়ের ব্যথা, তারপরেই অল ও-কে।

—এখন ও-কে ?

—একদম।

—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার ভালো লাগছে না।

—কিছু ভাববেন না মশাই, কিছু ভাববেন না। এখনো অনেক বাজে বই আমি লিখব, আপনি সেগুলো প্রকাশ করবেন এবং অনুতাপ করবেন।

—সে অনুতাপ আমি পরমানন্দে করব। কিন্তু আপনি মশাই ডাক্তার দেখান।

—আরে বললুম তো, চমৎকার আছি। গায়ে বোধ হয় কিছু এক্সট্রা ফ্যাট্ হয়েছিল, আপনার সেই খোলা হাওয়ায় মাঠে মাঠে ঘুরে সেটা ঝরিয়ে দিয়ে এসেছি।

একটি অল্পবয়েসী ছোট-খাটো চেহারার মেয়ে দোকানে ঢুকল

—কাকা, ব্র্যাডলির সেই বইটা আনিয়েছ আমার জন্যে ? সেই অক্সফোর্ড লেকচার্স অন পোয়েট্রি ?

—এই যা, ভুলে গেছি—রাজেনবাবু জিভ কাটলেন : আচ্ছা, আজই আনিয়ে রাখব ম্যাকমিলান থেকে।

মেয়েটি বেরিয়ে যাচ্ছিল, রাজেনবাবু ডাকলেন : এই মিনু—শোন্-শোন্—। কালকেও কিরণবাবুর কথা বলছিলি না ?—

—রাজেনবাবুর স্বরে আত্মপ্রসাদ ফুটে বেরুল : তোর সামনেই বসে রয়েছেন। ইনিই কিরণ বসু। আর এ হল আমার ভাইঝি —মিনু, পুরো নাম মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

মিনু লজ্জিতভাবে কিরণের পায়ের ধুলো নিতে এল।

কিরণ বললে, আরে—আরে—আমি কায়েতের ছেলে—শেষে বামুনের প্রণাম নিয়ে নরকে যাব ?

রাজেনবাবু বললেন, বেশি বকবেন না।

—এই করেই আপনারা হিন্দুধর্মকে ডোবালেন।

রাজেনবাবু হাসলেন: হিন্দুধর্ম হচ্ছে সাবমেরিনের মতো, চিরদিন ডুবছে এবং ভাসছে—দরকার হলে টর্পেডো ছুড়তেও ত্রুটি করছে না। ওর জন্যে মাথা ঘামাবেন না। শুনুন, এই মেয়েটি আপনার খুব ভক্ত—আপনার বই যত পড়ে, ভক্তি করে আপনাকে তার চাইতেও বেশি। কি রে, ব্যাগে অটোগ্রাফের খাতা-টাতা নেই?

মেয়েটি হাসল: জানতুম না তো ওঁর সঙ্গে দেখা হবে। তা হলে সঙ্গে করে নিয়ে আসতুম।

কিরণ বললে, একে তো আগে দেখি নি।

—এখানে তো থাকে না, রাঁচীতে। ওখানে যে হেভি-মেশিনারীর প্ল্যাণ্ট বসছে, ওর বাবা সেখানে এঞ্জিনীয়ার। ওখানকার কলেজেই পড়ে, ইংরেজিতে অনার্স নিয়েছে।

রাঁচী! জোর করে ভুলে থাকার সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে এসে দাঁড়ালেন শর্মিলা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে এই ঘরটা মিলিয়ে গেল, নৈঃশব্দে বিলীন হল সামনের পথ দিয়ে অফুরন্ত ট্রাফিকের সমস্ত কলরোল, এই কলকাতা অদৃশ্য হল। একটা বিরাট ফ্রেমের ভেতরে রঙিন ছবির মতো দেখা দিল একটি কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জ হাওয়ায় পাপড়ি ঝরছে, হরিয়ালের ডাক উঠছে, লাল মাটির সেই ছোট টিবিটার বসে নীল খাতার পাতায় কিছু একটা লিখতে চাইছে সে—ডগলাস খাতাটা নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে আর হঠাৎ উচ্ছলিত খানিকটা কলধ্বনির সঙ্গে—

সেই প্রথম দেখা। সেই অপূর্ব শুভ্রতার মূর্তি। বিকেলের রোদে শাড়ির জরিপাড় জ্বলছে।

একটু চুপ করে থেকে কিরণ বললে, কোন্ কলেজে পড়ছ?

মিনু কলেজের নাম বললে। এখানেই শর্মিলা পড়ান।

—শর্মিলা রায়চৌধুরী আছেন না তোমাদের কলেজে? প্রফেসার?

—শর্মিলাদি? আমাদের তো পড়ান না—সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে আছেন।

রাজেনবাবু বললেন, আপনার চেনা?

কিরণ ক্লান্তভাবে হাসল: আপনিও চেনেন বোধ হয়। ওখানকার ডাক্তার রায়চৌধুরীর ভ্রাতৃবধূ। এবার গিয়ে পরিচয় হল।

—ওহো, নাউ আই রিমেম্বার!—রাজেনবাবু বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, জানি। সেই যাঁর স্বামী ফ্যাক্টরিতে একটা অ্যাক্‌সিডেণ্টে মারা গিয়েছিলেন? ভেরি স্যাড্‌ লাইফ মশাই মেয়েটির, ভেরি আন্‌ফর্চুনেট্‌।

কিরণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

—আজ চলি, রাজেনবাবু।

—আরে বসুন বসুন, চা-টা আনাই—

—না, আজ আর বসব না। বিকেলের গাড়িতেই একবার দেশে যেতে হবে, জরুরি কাজ আছে। চললুম।

শর্মিলার সম্পর্কে আলোচনা আরো খানিকটা উঠে পড়বার আগেই কিরণ নেমে পড়ল রাস্তায়।

মেসের সেই ঘর। পুরোনো চুণবালির স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ। এখানে ওখানে প্লাস্‌টার খসে-পড়া নীলচে রং-ধরা নীচু ছাত মাথার ওপর। দেওয়ালে তার পূর্বতন অধিবাসী মাঝে মাঝে ছারপোকা মারতেন—কালো রক্তের কতগুলো লম্বা লম্বা রেখা টানা রয়েছে এখানে ওখানে, কোনো-কোনোটার সীমান্তে এখনো ছারপোকার দেহাবশেষ। বন্ধ ঘরেও এ ক'দিনের মধ্যে বেশ ধূলো জমেছে, টেবিলের ওপর পেতলের বড়ো অ্যাশট্রেটার ভেতরে স্তূপাকার বিড়িগুলো যাওয়ার আগে আর পরিষ্কার করা হয় নি।

ঘরের জানলাটা খুলে দিল কিরণ, এক ঝলক রোদ এসে পড়ল। বাতাসের ঢেউ এল ঘরে, সোঁদা গন্ধটা মিলিয়ে যেতে লাগল একটু একটু। চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার ওপর কনুই রেখে চুপ করে বসে রইল তারপর। সামনের উঁচু গাছের মাথায় লাল রঙের একটা ঘুড়ি আটকে রয়েছে, অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইল সেইদিকেই।

কলকাতা। তার ঘর। এখানে ঋতু নেই, প্রকৃতি নেই, আলো-মেঘ-হাওয়া-পাহাড়-পাখির কোনো কুজন নেই; শুধু সামনের গাছটা মাঝে মাঝে বেশ বদলায়, সেটা কখনো চোখে পড়ে, প্রায়ই পড়ে না।

এখানে বাইরের জীবনের একটি মাত্র রঙ—মধ্যে মধ্যে কালোর ছোপ দেওয়া এক নিরবচ্ছিন্ন ধূসরতা। সেই ধূসরতায় ক্ষুধা, ক্লান্তি, বাঁচবার চেষ্টা, ব্যবসাদারী, কামনা, অবক্ষয়, জোর করে জোড়া লাগানো কতকগুলো স্বপ্ন, কিছু মানুষের অনেক বেশি সুখের বিকার, আর ক্লান্তি। ঘুরে ফিরে ওই একটা জায়গায় পৌঁছানো—ক্লান্তি। অন্তত মধ্যবিত্ত মন ওইখানে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ে।

তারই ভিতরে বুদ্ধির দ্বীপ তৈরী করি। চা-কফির পেয়ালায়, কিছু শাণিত-নিষ্ঠুর বিদেশী বইয়ের পাতায়, কিছু উত্তেজিত তর্কে, কখনো কখনো বেপরোয়া লেখায়। তখন নিজেকেই নানান দিক থেকে দেখা, যেমন করে বিচিত্র বর্ণে রাঙিয়ে রাখা হয় মাই-ক্রোসকোপের স্লাইড, তেমনিভাবে নিজেকে খুঁজে বেড়ানো। সব গল্পের কেন্দ্রেই আমি—আমিই শিকারী, আমিই শিকার আমারই সেই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে জীবন ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, মানুষের ইতিহাস ঘুরছে। এই ঘরে—এই ধূসরতার পটভূমিতে মাকড়সার মতো এমনিভাবে জাল বুনে চলাই আমার কাজ।

কিন্তু এই পনেরোটা দিন—না আরো বেশি? ঠিক হিসেব নেই, এই সময়টুকুর ভেতরে নিজেকে নতুনভাবে দেখতে পাওয়া

গেল। আমার বৃত্তে প্রদক্ষিণ নয়—বাইরের অনেকখানি রঙের ঝড় আমাকে ছড়িয়ে দিল, আমাকে ব্যাপ্ত করল; তখন দেখতে পেলাম, আমিই সর্বময় নয়—আমাকে হারিয়ে দিতে পারে—তলিয়ে নিতে পারে এমন শক্তিও আছে। কৃষ্ণচূড়ার রঙ থেকে সে তার শায়ক সন্ধান করে, দূরের স্তব্ধ পাহাড় থেকে তার গম্ভীর আহ্বান আসে, অনেক দূরের মাদলের শব্দে সন্ধ্যার নদীর জল যেখানে চল্‌কে-ঝলকে উঠছে সেখান থেকে তার সম্মোহন ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করে। না হলে—না হলে—

না হলে শর্মিলা এমন কেউ নন। চেনা-আধচেনার ভেতরে, কলকাতার পথে-ঘাটে ওর চাইতে অনেক সুন্দর মুখ চোখে পড়ে; শর্মিলার চাইতে অনেক বেশি দুর্ভাগ্য বইতে হয় এমন মেয়েরও অভাব নেই; বুদ্ধিতে বিদ্যায় উজ্জ্বল মেয়েদের চোখে পড়ে ট্রামে বাসে, ইউনিভার্সিটির সামনে বন্ধুর ড্রয়িংরুমে, আলোচনার বৈঠক। শর্মিলা অসাধারণ নন।

এ শুধু সেই শক্তি—যা আমাকে বিকেন্দ্রিত করে ছাড়িয়ে দেয়, হারিয়ে দেয়। তাই আজো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রফা হল না।

"La nature il brutto—poter che, ascoso, a commun danno impera—'

কিন্তু তাই কি?

ছেলেবেলায় রাজহাঁসের পালক খুঁজতে বেরিয়ে সেই যে আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম, সেই আখের ক্ষেত পার হয়ে, একটা গড়খাইয়ের চারদিকে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে—

—কখন এলেন মশাই?

চিন্তাটা কেটে গেল। পাশের ঘরের ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন।

—এসেছি সকালে। বাক্স-বিছানা রেখেই গিয়েছিলুম একটু কাজে।

—ওঃ, এই ক'দিনে কত' লোক যে এসে আপনাকে খুঁজে গেল মশাই! সভা-সমিতি, পত্রিকা, পাবলিশার। কোথায় গেছেন, কবে আসবেন—এ-সব কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমাদেরই প্রাণান্ত! কী করে যে আপনারা এগুলো সহ্য করেন তাই ভাবি।

কিরণ হাসল।

ভদ্রলোক বললেন, এবার কিন্তু আমার উপন্যাসটা পড়ে দেখতেই হবে আপনাকে। আমরা নবীন লেখক (কিরণ আড়-চোখে ভদ্রলোকের চকচকে টাকাটা একবার লক্ষ্য করে দেখল) —আপনাদের মতো প্রতিষ্ঠিতেরা যদি একটু ব্যাক না করেন—দাঁড়াব কোথায়। বেশ নতুন জিনিস আছে মশাই—সি-পির আদিবাসীদের কী বলে—ইয়ে লাইফও বেশ একটু দিয়েছি—লোকে আজকাল বেশ রেলিশ করে।

—তা হলে কোনো পত্রিকাতে নিয়ে যান না?

—এ এক আচ্ছা প্যাঁচ মশাই, পত্রিকাগুলো বলে, বই-টই ছাপুন, একটু নাম হোক, তখন দেখব আমরা। আর পাবলিশার বলে, আগে কাগজে লেখা ছেপে গুড উইল তৈরী করুন, তবে তো বই বিক্রী হবে। কোথায় যাই বলুন তো?

কিরণ সম্পাদকও নয়, প্রকাশকও নয়। নিরুপায়ভাবে চুপ করে রইল:

—দেখবেন তো পড়ে?

—দেখব।

—যদি ভালো লাগে ছাপবারও কিন্তু একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে, দাদা।

যত নামী লেখকই হোন, এ কাজটা তাঁর পক্ষে কত অসম্ভব তা এই সব সাহিত্য যশপ্রার্থীকে কোনোদিন বোঝানো যাবে না, কিরণ বললে, চেষ্টা করে দেখব।

—চেষ্টা আবার কী? আপনি একবার মুখ ফুটে বলে দিলেই হয়।

—না। তা হয় না।—কিরণ উঠে পড়ল কিছু মনে করবেন না ভবেনবাবু, আমি এবার চান করতে যাব। কাল সারাটা রাত ট্রেনে আদৌ ঘুম হয় নি। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে আমাকে আবার বিকেলের গাড়িতে একবার দেশে যেতে হবে।

—উপন্যাসটা সঙ্গে দিয়ে দেব কী? এখানে তো সময় পান না, পথে পড়ে নিতেন?

—এসেই পড়ব।

—আচ্ছা, তাই হবে—ক্ষুণ্ণ আর সন্দিগ্ধ হয়ে ভবেনবাবু চলে গেলেন।

গ্রামের বাড়িতে পৌঁছল রাত আটটায়। বাইরের ঘরের তক্তপোষে বসে প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন।

—কী ব্যাপার দাদা, এত জরুরী তলব কেন? কারো অসুখ-বিসুখ নাকি?

প্রৌঢ় আশ্চর্য হয়ে দাদার দিকে চাইলেন: কার অসুখ হে হিরণ্ময়? কিছু শুনি নি তো।

দাদা যেন কেমন বিব্রত আর অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। বললেন, না—না, সে-সব কিছু নয়, আমি অন্য ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলাম। তুই কলকাতার বাইরে চেঞ্জে গেছিস, সেও তো তোর চিঠি পেয়ে জানলুম। তার আগে ওটা লেখা হয়ে গিয়েছিল, রি-ডাইরেক্টেড হয়ে—

তীব্র বিরক্তিতে কিরণের সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল। কোনো দরকার ছিল না, শুধু খেয়ালের মাথায় একটা চিঠি ছেড়ে দেওয়া হল। কী ব্যাপার?

না—অনেকদিন দেখি নি—তাই। দাদার চিরদিন একভাবেই কাটল, কোনোদিন সে আর সাবালক হল না।

হিরণ্ময় বললেন, আছে বইকি, কথা কিছু নিশ্চয় আছে। তা পরে হবে সে-সব, তুই ভেতরে যা।

বৌদি রান্নাঘরে। ছেলেমেয়েরা বারান্দায় মাদুর পেতে পড়ছিল। তারাই সমস্বরে ঘোষণা করল : মা, কাকা এসেছে!

বৌদির জবাব এল : আমি আসছি।

কিন্তু বৌদিকে আসবার সুযোগ দিলে না কিরণ। তার আগেই দুম-দুম করে হাজির হল রান্নাঘরে।

—এসবের মানে কী, বৌদি?

—কিসের মানে?

—চিঠিটা দাদার বটে, কিন্তু ইনসপিরেশন নিশ্চয় তোমার। খামাকো কেন এভাবে আমাকে ডেকে পাঠালে?

—ওঃ, সব দোষ বুঝি এখন আমার ওপর গিয়েই পড়ল?—বৌদির চোখ কৌতুকে জ্বলজ্বল করতে লাগল : ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বুঝি আমিই? আচ্ছা, তাই সই, আমিই চিঠি লিখিয়েছি।

শক্ত হয়ে কিরণ বললে কেন লেখলে? অকারণে—এইভাবে—মানুষের কজকর্ম থাকে—

—রেখে দাও তোমার কাজকর্ম। —বৌদি ডালের কড়া নামিয়ে ফেলে বললেন, না হয় বড়ো লেখক হয়েইছ ঠাকুরপো, তাই বলে আমরাও কি তোমায় সভাপতি করে মালা-চন্দন পরিয়ে ডেকে আনব নাকি? বেশ করছি—ডেকেছি।

—না, এরকম বেশ আর কোরো না।—

কিরণের হাঁড়ি মুখের দিকে তাকিয়ে বৌদি কাছে উঠে এলেন। আস্তে আস্তে বললেন, আগেই রাগারাগি করছ কেন ঠাকুরপো? তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এ আমরা আর সইতে পারছি না। আমরা আবার তোমায় সংসারী করব।

॥ তের ॥

দুজনে ফিরে এলেন। ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারে।

ডাক্তার, অর্থাৎ ডাক্তার ঘোষাল বললেন, বসুন কিরণবাবু, চা খান।

—ধন্যবাদ। কিন্তু চায়ের দরকার নেই, আমি এবার চলি।

—না-না, হোক একটু চা।—ডাক্তার ঘর থেকে দু'পা বেরিয়ে গিয়ে কাকে যেন চায়ের কথা বললেন। তারপর ফিরে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন কিরণের মুখোমুখি। বাড়িয়ে দিলেন একটা সিগারেটের প্যাকেট।

—নিতান্তই দৈব-দুর্বিপাক, নইলে আপনার মতো লোকের পায়ের ধুলো পড়ত এখানে?

—আমি কেউ নই ডাক্তারবাবু। খুব সাধারণ লেখক একজন।

—আপনি তাই বলবেন।—ডাক্তার হাসলেন: কিন্তু আমরা তো জানি কত নাম আপনার। জানেন, আমিও আপনার একজন অ্যাড্মায়ারার।

ডাক্তার নিরীহ ভদ্রলোক, ভদ্রতা করেই কথাটা বলেছেন। তবু অকারণেই খানিকটা তিক্ততা ফেনিয়ে উঠল মুখের ভেতর। বলতে ইচ্ছে করল, দেশজোড়া আমার এত অ্যাড্মায়ারার—সে কথাটা তো আগে জানা ছিল না। তা হলে বছরে আমার পাঁচশো কপির বেশি বই বিক্রী হয় না কেন? নাকি আমি ভাল লিখি এই স্বীকৃতিটুকুই আমার মহৎ পুরস্কার, আর যারা ভালো লেখে না, অনেক বই বিক্রী হওয়াটা তাদের জন্যে কনসোলেশন প্রাইজ?

পরক্ষণেই নিজেদের মানসিক রূঢ়তায় কিরণ লজ্জিত হল। ডাক্তারের কথার জবাবে নিঃশব্দে হাসল সে।

ডাক্তার বললেন, আমি যদি লিখতে পারতাম মশাই, তা হলে

এই অ্যাশাইলাম নিয়ে বই লিখতুম একখানা। এই আট-দশ বছরে কত রকমের পেশেন্ট দেখলুম, কত ফিক্সেশন, কত কমপ্লেক্স—কী অদ্ভুত সব কেস হিস্ট্রি! মানুষের মনের ক'টা স্তর আছে মশাই? কন্‌শাস-আন্‌কন্‌শাস—সাব-কন্‌শাস? আমার ধারণা অনেক—অনেক বেশি। কি রকম জানেন?—ডাক্তার একবার থামলেন: সব যেন ঘন কালো মেঘ দিয়ে ঢাকা একটা অনন্ত আকাশের মতো, তাস এক-এক জায়গায় হঠাৎ মেঘ ছিঁড়ে গিয়ে এক-এক ঝলক আলো দেখা দেয়। আকাশের যেমন শেষ নেই, আলোগুলো তেমনি অফুরন্ত।

কিরণ আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকালো। চীনেমাটির একটা মস্ত অ্যাশ্‌ট্রের ভেতরে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল খানিকটা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, এ তো ডাক্তারের কথা নয়, কবির মতো শোনাচ্ছে।

ডাক্তার জিভ কাটলেন: কিছু না—কিছু না, স্রেফ বাচালতা। মাঝে মাঝে নানা রকম আবোল-তাবোল মনে হয়।

সেই কৃষ্ণচূড়ার স্মৃতি—সেই ডাক্তার রায়চৌধুরী। এক সময়ে কবিতা লিখতেন। একটু চুপ করে থেকে কিরণ বললে, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ডাক্তাররা প্রায় মনে মনে অল্প-বিস্তর সাহিত্যিক।

—ডাক্তারের আবার সাহিত্য। পোস্ট-মর্টেমের ক্লাসে ছুরি হাতে নেবার পর থেকে সমস্ত রোমান্টিসিজ্‌ম্ শুকিয়ে যায়। তবে নানা রকম মানব তো দেখতে হয়, আর তাই থেকে অদ্ভুত সব ইম্‌প্রেশ্যন আসে। তবে সাহিত্যিক বলতে পারেন আমাদের বলাইদাকে, যাঁকে আপনারা 'বনফুল' বলে জানেন। ওঁরাই আসলে সাহিত্যিক, ভুল করে ডাক্তার হয়ে বসেছেন।

একটা চাকর চা নিয়ে এল। সঙ্গে কেক।

—এসব কেন?

—আর লজ্জা দেবেন না। কী আর এখন খাওয়াব আপনাকে? একদিন দয়া করে আমার কলকাতার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন না?

—আসব, নিশ্চয় আসব—চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে কিরণ, কেক ভেঙে নিলে একটুকরো। তারপর পাশের জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে বাইরে—পুকুরের জলটা দেখা যায়, ওপারের খানিকটা মেহেদীর বেড়া আর কিছু কিছু ফুলের আভাস চোখে পড়ে। ওখানেই ফিমেল ওয়ার্ড। প্রতিমা কী করছে এখন? কাঁদছে? না—ডাক্তারের ভাষায় একটা অনন্ত আকাশের একরাশ অপূর্ব আলোর মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে তার মন?

ডাক্তার যেন টের পেলেন। নিজেই তুললেন কথাটা।

—মিসেস মিত্র সম্পর্কে আমি কিন্তু এখনো হাল ছাড়ি নি কিরণবাবু।

কিরণ চায়ের পেয়ালা নামিয়ে ফেলল ঠোঁট থেকে। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল: আশা রাখেন?

—ডাক্তারের আশার কোনো শেষ নেই।

—কিন্তু সবাই জবাব দিয়েছেন।

—রাঁচী-ফেরৎ ছু-একজনকে আমি ভালো করতে পেরেছি, একটু আগেই তো আপনাকে সে-কথা আমি বলেছিলুম। সেজন্যে আরো অন্তত ছ'মাস আমি টাইম চাইছি আপনাদের কাছে।

—ছ' মাস কেন, সারা জীবনই হয়তো রাখতে হবে।—কিরণ নীরস হাসি হাসল।

আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি—ডাক্তারের চোখ সহানুভূতিতে কোমল হয়ে এল: কিন্তু আমি আপনাকে বলছি কিরণবাবু, এখনো হাল ছেড়ে দেবার মতো হয় নি।

—অনেক ধন্যবাদ, আপনারই বুঝবেন—কিরণ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো: আচ্ছা আজ চলি ডাক্তার ঘোষাল—নমস্কার।

ট্রেনে আসতে আসতে ডাক্তারের কথাই মনে পড়েছিল বারবার। এলোমেলো করে বলেছেন, সবটা গুছিয়ে আনতে পারেন নি। তবু কিরণ তাঁর ইম্‌প্রেশ্যনের একটা সম্পূর্ণ চেহারা যেন দেখতে পাচ্ছিল। একটা দিক্‌-চিহ্নহীন আকাশ অন্ধকারের কালো পর্দা দিয়ে মোড়া; নীচের পৃথিবীতে চেতনার ছোট ছোট প্রদীপ জ্বেলে আমরা যারা সহজ স্বাভাবিক, তারা পথ চলছি, এ-ওর মুখ দেখছি—এই আমাদের চেনাজানা জীবন এর ভেতর কখন কার পথের প্রদীপ নিভে যায়, তখন এতটুকু এই আলোর বৃত্ত থেকে ওই তমসাবৃত আকাশে তার অবাধ মুক্তি; তখন তার বাইরের চোখ হারিয়ে গেছে, তখন মেঘের আবরণ ছিঁড়ে একটা অচেনা আলো তার আর এক সত্তাকে অপূর্বভাবে উদ্ভাসিত করে তোলে। তার সেই সত্তাকে আমরা চিনতে পারি না—তাকে বলি পাগল।

এ-ব্যাখ্যা মনস্তত্ত্বে চলবে না, ডাক্তারী শাস্ত্রেও না। তবু কি সম্পূর্ণ মিথ্যে বলব একে? তা হলে ব্লেকের কবিতায় কোন্‌ নক্ষত্রের আলো এমন করে জ্বলে উঠেছিল? আর এজ্‌রা পাউণ্ড—

ইস, পাউণ্ড কেন ফ্যাসিস্ট হতে গেলেন?

কিন্তু পাউণ্ডের কথা থাক। প্রতিমা কী ভাবছে? তার আকাশে কোন্‌ তারা উঠল? কোন্‌ সবুজ ঈর্ষার আলোয় তার পৃথিবী সন্দেহের ছায়ামূর্তিতে একাকার, যেখানে প্রতি মুহূর্তে সে অবিশ্বাস করছে—ঘৃণা করছে, একটা তিক্ত যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে?

—কিরণদা কোত্থেকে?

চিন্তাটা থেমে গেল। একজন তরুণ কবি। এইমাত্র যে-স্টেশন ছাড়ল ট্রেনটা, তারই প্ল্যাটফর্ম থেকে চলতি গাড়িতে লাফিয়ে উঠেছে।

—এসো কুণাল।

কুণাল এসে পাশে বসল। এক মাথা ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল।

দাড়ি কামায় নি অন্তত দিন সাতেক। পরণের পাজামাটা ময়লা, গায়ে আস্তিন গোটানো গেরুয়া রঙের শার্ট, পায়ে উদ্ধত ভঙ্গীর মোটা চামড়ার কাবলী চটি।

—কেমন আছেন কিরণদা?

—ভালো। তোমার খবর?

—নতুন কবিতার বই বের করছি আর একটা।

—আগেরটা কেমন চলল?

কুণাল হাসল। ইচ্ছে করে রুক্ষকর্কশ সেজেছে, নইলে ছেলেটার চেহারা স্নিগ্ধ, হাসিটাও মিষ্টি। বললে, কবিতার বই যেমন চলে। শ-খানেক কেটেছে, শ-দেড়েক বিলিয়েছি, খান পঞ্চাশেক রিভিউয়—বাকীগুলোর হিসেব অনাবশ্যক।

—কিন্তু আজকাল তো আধুনিক কবিতার পাঠক বেড়েছে।

—হঁা, কলেজের ছাত্রেরা পড়ে, কিন্তু ক'জন আর পয়সা দিয়ে কেনে? কোনো কোনো অধ্যাপক পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁদেরও কিনতে হয় না, উপহার পান। ওরই ভেতরে তু-একটা লাইব্রেরী আর তু-চার জন খদ্দের দেখা দেয়।

—তা হলে তো লোকের মনের কাছে পৌঁছোতে পারো নি তোমরা।

কুণাল একটা মুখভঙ্গি করল: সাধারণ লোকের মনের কাছে কবিতা কোনোদিন পৌঁছোয় না—পৌঁছোয় পগু। আর পৌঁছোয় আপনাদের উপন্যাস—বেশ নিটোল একটি গল্প, তৈরি করা প্লট, চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টারে সাসপেন্স।

—আমার কথা ছাড়ো। কিন্তু তোমরা কি একটু বেশি মাত্রায় সেল্‌ফ-সেণ্টার্ড হয়ে যাচ্ছো না?

—মনকে মিথ্যে ভোলাচ্ছেন কিরণদা! এ-যুগে প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক। সকলের সঙ্গে ইমোশান ভাগ করে নেওয়া মানুষের শৈশব। ব্যক্তিত্ব এলেই বিচ্ছিন্নতা আসবে।

কিরণ বললে, তা হলে তো শুধু নিজের জন্যেই কবিতা লিখতে হয়।

—তাই তো লিখতে চাই। যদি কেউ পড়তে চাও, উপযাচক হয়ে এসো আমার ঘরে। কিন্তু আমার কবিতা নিয়ে গিয়ে হাটে হাটে ফিরি করে বেড়াতে পারব না।

—নিষ্কাম কর্মযোগ ?

—অল্ আর্ট ইজ্ ইউজলেস্।

কিরণ চুপ করে রইল। তর্ক করতে ভালো লাগছে না। তবু একটা কথা হয়তো ঠিকই বলেছে কুণাল। আমার মনের যা একান্ত, তা কি দশজনের কাছে আমি কখনো অসংকোচে সাজিয়ে দিতে পারি ? একদিন সব মানুষের সুখ-দুঃখগুলো প্রায় এক সুরে বাঁধা থাকত, এক যুদ্ধ, এক কামনা, এক জীবন-সংগ্রাম, একটি ম্যামথের দেহকে ঘিরে ঘিরে বর্শাধারী সব মানুষের মিলিত উল্লাস। সেদিন মানুষ গোষ্ঠিক—আজ মানুষ একা। সেদিনের গান সকলের জন্যে, আজ কবিতা শুধু নিজের জন্যেই।

কে কার মনকে বোঝে ? কোন্ জটিল অরণ্য কার ভেতরে ? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে ঘিরে ঘিরে ব্যক্তিত্বের আবরণ কঠিন হতে থাকে। উপন্যাস একক মানুষের দিনলিপি—তার একাকী অরণ্যের পরিক্রমা ; কবিতা প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের নির্জন সমুদ্র থেকে এক-একটি ঝোড়ো হাওয়ার উচ্ছ্বাস, সে-সমুদ্রের সন্ধান আর কেউ পায় না।

প্রতিমা এক আশ্চর্য আকাশের এক ঝলক আলোয় মগ্ন, শর্মিলা এক বেদনায় আড়ালে অস্পষ্ট, আর কিরণ—

ট্রেন শেয়ালদায় ইন্ করল। ট্রেন থামবার আগেই লাফিয়ে নামল কুণাল।

—চলি কিরণদা, তাড়া আছে।

—এসো।

কিরণ গাড়ি থেকে নামবার আগেই উদ্ধত কাবুলি চটিটা ভিড়ের ঘূর্ণিতে হারিয়ে গেল। বেশ আছে। কিন্তু কিরণ তো কিছুতেই ওদের মতো সহজ-সাহসে এগিয়ে যেতে পারে না। পায়ে পায়ে তাকে থেমে দাঁড়াতে হয়, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, মনের ভারে ক্লান্ত হয়ে উঠতে হয়। তার বয়েস বাড়ছে, সে পিছিয়ে পড়ছে, এই যুগের সঙ্গে আর যেন সে চলতে পারছে না।

'একটা রোমান্টিক মিষ্টি প্রেমের গল্প লিখব, নাম দেব কৃষ্ণচূড়া।' এ-কথা বলা যেত কুণালকে ?

মেসে ফিরল সন্ধ্যার পর। একটা গল্প নিয়ে বসতে হবে আজকে। কিছু টাকা দরকার। তা ছাড়া পত্রিকাটা অনেকদিন ধরে তাগাদা দিচ্ছে।

চা খেয়ে লিখতে বসল টেবিলে। একটু বেশি রাতে লেখাই তার অভ্যাস—সন্ধ্যার মুখটা আড্ডা দিয়েই কাটে। কিন্তু আজ আর কোথাও গিয়ে হৈ-হৈ করতে ভালো লাগছে না। নিজেকে নিয়েই বসা যাক খানিকক্ষণ।

টেবিলে পুরোনো চিঠির একটা ছেঁড়া এনভেলপ পড়ে রয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ল, কলকাতা ফিরে ডক্টর রায়চৌধুরীদের সে চিঠি দিয়েছিল একখানা। কিন্তু এখনো তার কোনো জবাব আসে নি।

চুলোয় যাক্। কলমটা হাতে নিয়ে সামনের জানলা দিয়ে চেয়ে রইল। পথে ট্রাফিকের শব্দ। রাস্তার ওপারে গাছটার মাথায় আলো-আঁধার। একটা এরোপ্লেনের ধ্বনি-তরঙ্গ। লাল নীল ছুটি আলোর বিন্দু মিলিয়ে যাচ্ছে তারাদের ভেতরে।

বারান্দায় ভারী জুতোর আওয়াজ উঠল। স্যুট আর হ্যাটপরা এক বিরাট মূর্তি দেখা দিলে দরজার ফ্রেমে। ভরাট গলায় ডাক উঠল : কী হচ্ছে, সাহিত্য-সাধনা ?

—অরবিন্দদা ? আসুন—আসুন—

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরবিন্দ বাড়ি কাঁপিয়ে ঘরে ঢুকল। হুড়মুড় করে বসে পড়ল তক্তপোষে, সেটা আর্তনাদ করে উঠল।

—পাখাটা বাড়িয়ে দাও হে, হ্যাঁ—রেগুলেটারের শেষ পর্যন্ত ঠেলে দাও। দেখছ না, মোটা মানুষ, হাঁপিয়ে গেছি? তেতলায় কোনো ভদ্রলোক যে বাস করে কী করে, আমি তো ভেবেই পাই না।

হেসে পাখা বাড়িয়ে দিল কিরণ, ঘরময় হাওয়ার ঝড় বইতে লাগল। টেবিল থেকে কতকগুলো কাগজের টুকরো উড়ে পড়ল নীচে।

—চা খাবেন অরবিন্দদা?

—ইন্‌পসিবল। চা নয়, টা নয়, কোনো ভদ্রতা নয়। এইমাত্র এক জায়গায় বিকেলের জলখাবার খেয়েচি কণ্ঠা পর্যন্ত। আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য ব্যাপারে।

দাদার কথা মনে পড়ল। অরবিন্দ তাঁকে বলে এসেছে, কিরণ ডিভোর্স করুক প্রতিমাকে। নতুন করে আবার স্নরু করুক জীবন। মনে পড়তেই ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে উঠল কিরণ। তাকে বলতে হবে, নিজের জীবন সম্পর্কে যা কিছু ভাবনা সেই ভাববে, আর কারুর তা নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

হ্যাটটা খুলে ঘামে ভেজা টাকটা রুমাল দিয়ে কিছুক্ষণ মুছে নিলে অরবিন্দ। তারপর বললে, আমি আর ব্যারাকপুরে নেই এখন। ট্রান্সফার হয়ে এসেছি আলিপুরে, দিন সাতেক হল। আছি হাজরা রোডে।

—যাব।

—কোনোদিনই যাবে না, সে জানি। ভদ্রতার দরকার নেই, আমিও তোমায় জোর করতে চাই না—অরবিন্দ ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল: আমি এসেছি অন্য একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে।

অর্থাৎ, প্রতিমার আলোচনাটা আসছে। এইবার অরবিন্দ নিজের ঔদার্যের দরজা খুলে দেবে। কিরণ চেয়ারের মধ্যে শক্ত হয়ে বসে রইল।

—কিছু ব্যক্তিগত কথা তোমার সঙ্গে আমার আছে, কিন্তু সেজন্যে আপাতত আসি নি। পরে সময়মতো বলা যাবে সে-সব। আপাতত ভারী মুসকিলে পড়েছি, তোমাকে আমায় উদ্ধার করতে হবে।

হাওয়ার মোড় ঘুরে গেছে, চেয়ারের ভেতরে একটুখানি শিথিল হল কিরণ।

—মারাত্মক কিছু নয়, আগে থেকেই ঘাবড়ে যেয়ো না।—অরবিন্দ হেসে অভয় দিলে: পরশুর পরের দিন মানে, আসছে শনিবার বিকেলে একবার আমাদের আপিসে যেতে হবে তোমাকে।

—কেন? আমি কী করবো গিয়ে?

—তুমি গিয়ে কী করতে পারো আর?—অরবিন্দ ভ্রূকুটি করল: সাহিত্য—সাহিত্য করতে হবে। কী মাস খেয়াল আছে? রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব।

—তা আমাকে কেন? আমি তো ভালো বক্তা নই।

—তোমাকে বক্তৃতা বেশি দিতে হবে না—ও-সব শুনে লোকের বিরক্তি ধরে গেছে। গান-টান যা করবার ওরাই করবে এখন, তুমি শুধু সভা আলো করে বসে থাকলেই চলবে। কোনো ওজর শুনব না। ওরা আমাকে ভার দিয়েছে, আমি তোমাকে নিয়ে যাব বলে কথা দিয়েছি।

—কিন্তু দাদা—আমি—

—কিচ্ছু শুনতে চাই না—হ্যাটটা মাথায় পরে অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালো: এইটে বলবার জন্যে এসেছিলুম, নাউ ইট্‌স্ সেট্‌ল্‌ড্। ডাইরি-টাইরি যদি থাকে, লিখে রাখো। আমি শনিবার সাড়ে চারটেয় নিজে গাড়ি নিয়ে চলে আসব।

—আমার কাজ ছিল শনিবারে।

—এ-ও কাজ, দেশের কাজ। এ বিগার রেস্‌পনসিবিলিটি। নাও হে সাহিত্যিক, চলো এবার—রাস্তা পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দেবে—অরবিন্দ দরজায় বাইরে পা বাড়ালো।

॥ চৌদ্দ ॥

শর্মিলা থাকেন প্রফেসার্স মেসে। জন পাঁচেক মিলে এই মেস। এখন ছুটিতে আর সবাই নিশ্চয় যে যার বাড়িতে চলে গেছেন। কিন্তু মিসেস শর্মা নিশ্চয় আছেন একথা শর্মিলা জানতেন। মিসেস শর্মা মেস ছেড়ে কোথাও কোনোদিন যান না—অন্তত এই তিন বছরে শর্মিলা তাঁকে যেতে দেখেন নি।

শর্মিলাকে রিক্‌সা থেকে নামতে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

—ব্যাপার কী মিসেস রায়চৌধুরী?

—চলে এলুম।

—এত তাড়াতাড়ি? কলেজ খুলতে তো তিন সপ্তাহ দেরি আছে এখনো।

—তা হোক। ভালো লাগল না।

মিসেস শর্মা অর্থাৎ গায়ত্রী নিঃশব্দে একটু হাসলেন। তারপর সরে গেলেন সামনে থেকে। শর্মিলা চেয়ে দেখলেন তাঁর ভিজে চুল গিঁট দিয়ে বাঁধা। পরণে লাল পাড় গরদের শাড়ি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। পূজো করছিলেন।

গায়ত্রী এই এক ধরণের মানুষ। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির নামকরা ছাত্রী, কলেজে ইংরেজী পড়ান। কিন্তু নিজে পড়েন গীতা, উপনিষদ, দর্শনের বই। কাশীর মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে,

পুজো-অর্চনা করেন, নিরামিষ খান। নিজের চারদিকে একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে প্রায় একাই কাটান তার ভেতরে।

শর্মিলার সঙ্গে তাঁর অনেকটা মেলে, সবটা নয়; শর্মিলা অতখানি আত্মকেন্দ্রিক নন। জীবনের যে দিকটা তাঁর চিরকালের মতো ফুরিয়ে গেছে, সেখানে তাঁর নিঃসঙ্গ স্মৃতিপূজা। বাইরে তিনি সাধ্যমতো মেয়েদের সঙ্গে মেশেন, হৈ চৈ করে তাদের নিয়ে এক্সকার্শনে যান, বোটানির স্পেশিমেন সংগ্রহ করেন। ভেবেছিলেন, এইভাবেই দিনগুলো একরকম করে কেটে যাবে, কিন্তু—

হঠাৎ কোথা থেকে ঝোড়ো হাওয়া ছুটে এল খানিকটা—ডাকাতের মতো খুলে দিলে একটা বন্ধ জানালাকে, প্রদীপের শিখাটাকে কাঁপিয়ে দিলে, চার বছর ধরে জমানো ধূপের গন্ধকে কেড়ে নিতে চাইল, থালার ফুলগুলোকে উড়িয়ে দিলে। শর্মিলা দেখলেন তিনি কত দুর্বল, মন কী বিশ্বাসঘাতক, আর নিজেকে চেনা কত কঠিন!

যখন সব কিছু একটা দারুণ বিপর্যয়ে একাকার হতে চলেছে, তখন ছুটে পালিয়ে এসেছেন রাঁচীতে। দেখবার সুযোগ থাকলেই দেখার লোভ সামলাতে পারবেন না, কথা বলতে গেলেই বুকের ভেতরে ঢেউ উঠবে, বিকেলের নদীর ধারে দেখা করবার ডাক এলেই প্রাণ ছুটে যেতে চাইবে—কোনো বাধা মানবে না। তার চাইতে দূরে পালানোই ভালো। সেইটেই বাঁচবার রাস্তা।

সারাটা দিন ভাবলেন, কাগজ কলম নিয়ে বসে লেটার প্যাডের অনেকগুলো পাতা ছিঁড়ে ফেললেন, তারপরে শেষ পর্যন্ত এক টুকরো চিঠি ছেড়ে দিলেন কিরণকে। চিঠিটা পোস্ট করবার আগেও অনেকবার দ্বিধা এসেছিল, তবু শেষ পর্যন্ত মনে হল, নিজের ব্যবহারের জন্যে অন্তত একটুখানি কৈফিয়ৎ ভদ্রলোককে দেওয়া দরকার।

এইবারে ভুলতে হবে সব। অর্থহীন কয়েকটা চঞ্চলতার

দিনকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে জীবন থেকে। আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে হবে আগের মতো। কলেজের লাইব্রেরী খোলা ছিল, কয়েকটা নতুন বোটানির বই নিয়ে এলেন। দিল্লীর একজন পাবলিশার একটা টেক্সট বই লেখার কথা বলেছিল। ভাবলেন, এক-আধটু-চেষ্টা করে দেখা যাক।

কিন্তু—

কিন্তুটাই আর কিছুতেই যায় না। একাগ্র হতে পারেন না কোনো জিনিসে। লেখার টেবিলে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুজে আসে চোখ দুটো। দেখতে পান কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী দুলছে বসন্তের হাওয়ায় যেন পৃথিবী পূজারিণীর মতো অঞ্জলি তুলে ধরেছে আকাশের আনীল পাদপদ্মের দিকে। মনে হয় ঝর্ণার জলে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছেন তিনি, পুরুষের দুটি বাহু কোথা থেকে এসে নির্ভয়ে আশ্রয় দিয়েছে তাঁকে, স্পর্শের বিদ্যুতে থরো থরো করে কেঁপে উঠেছে তাঁর সারা শরীর। আর—

আর চমকে ওঠেন শর্মিলা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। নদীর ধারে সেই পড়ন্ত বিকেলে কিরণের হাত চেপে ধরেছিলেন, সেই অনুভূতি আঙুল বেয়ে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নিজের ওপর অসহ্য একটা ঘৃণা হয় শর্মিলার। এ কী হল ? এমন করে কোন সর্বনাশা মোহের মধ্যে তিনি জড়িয়ে গেলেন।

কোথা থেকে রাহুর মতো এল এই লোকটা।

অথচ, তার মনের খবরও তো অজানা নেই শর্মিলার। নিজের মুখেই বলেছিল, 'যখন এখান থেকে চলে যাব, চারদিকের এই কুহক আর থাকবে না, তখন এখানকার সব কিছু রোমান্টিক আবেশ দেখতে দেখতে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাবে।' অর্থাৎ শর্মিলাও সেই কুয়াশার ভেতরে একটা অবান্তর ছায়ামূর্তি, ভুলে যেতে কয়েক লহমার বেশি সময় লাগবে না।

শর্মিলা চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সেদিন। ভেবেছিলেন

ঘোর কেটে গেল, এই একটি আঘাতেই তিনি মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, মোহ তো কাটল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে তাঁকে নদীর ধারে টেনে আনল, ক্যাক্‌টাসের উপলক্ষকে ছাড়িয়ে বার বার একটি প্রত্যাশাই মনের ভেতর বাজতে লাগল: প্রায় রোজই বিকেলে এখানে সে বেড়াতে আসে, এখানেই দেখা হবে তার সঙ্গে।

তারপর—

তারপর পালানো ছাড়া আর পথ ছিল না।

কিন্তু পালিয়েও যদি নিষ্কৃতি না মেলে, যদি এত দূরে চলে এসেও রক্তের মধ্যে বারে বারে টান পড়তে থাকে, তাহলে কোথায় যাবেন শর্মিলা? মানুষটার কাছ থেকে চলে আসা যায়, কিন্তু নিস্তার কোথায় মনের কাছ থেকে?

তবু চেষ্টা করতে হবে। এই দুর্বলতাকে কিছুতেই বাড়তে দেওয়া যায় না। না—না।

প্রাণপণে শর্মিলা আজ সকালে লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু লাইন কয়েক লেখবার পরে মনে হল, সমস্ত ইংরেজি বানান-ব্যাকরণ যেন তিনি ভুলে গেছেন। হতাশ হয়ে কলমটা কামড়ে ধরে বসে রইলেন, ইচ্ছে করতে লাগল সমস্ত কাগজপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন।

ঘরে ঢুকলেন গায়ত্রী। হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন, কাজ করছেন নাকি কিছু?

শর্মিলা হিন্দীতে জবাব দিলেন। বললেন, না—না, এমনি বসে আছি, আসুন।

গায়ত্রী শর্মিলার বিছানার ওপর বসলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, মন ভালো নেই—না?

একটু চুপ করে থেকে শর্মিলা বললেন, না, আমি বেশ আছি।

—বেশ নেই আপনি। তিন-চারদিন ধরেই তো দেখছি।—গায়ত্রী হাসলেন: বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে?

শর্মিলা হাসতে চেষ্টা করলেন জোর করে: আমাকে কি ঝগড়াটে বলে মনে হয় মিসেস শর্মা ?

—তা ঠিক। ঝগড়াটে আপনি নন। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, আপনি চুপ করে নির্ঝঞ্ঝাটে পড়ে থাকতে চাইলেও ছুনিয়া আপনাকে ছাড়তে চায় না। জোর করে গায়ে এসে পড়ে।

শর্মিলা প্রতিবাদ করলেন না একদিক থেকে তাঁরই কথা বলছেন গায়ত্রী। তিনি তো জীবনটাকে নিজের মতো করে একটা ছাঁচে ঢেলে নিয়েছিলেন, নানা কাজে ভরা প্রত্যেকটা দিনের একটা হিসেব ছিল, এক-একটি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় কিংবা নিস্তব্ধ রাত্রিতে ধ্যানের একান্ত ক'টি মুহূর্ত ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে ঝড় এল—আর প্রায় চক্ষের পলকেই সব এলোমেলো করে দিয়ে গেল। ঠিক কথা, নিজেকে নিয়ে থাকতে চাইলেও থাকা যায় না—হঠাৎ কখন বাইরের জগৎটা ডাকাতের মতো এসে হানা দেয় সেখানে।

গায়ত্রী যেন নিজের মনেই একটুখানি হাসলেন। বললেন, জানেন আজ সকালেই ওর একটা চিঠি পেয়েছি।

শর্মিলা চকিত হয়ে উঠলেন।

—কা'র চিঠি ? মিস্টার শর্মার ?

গায়ত্রী আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। তাঁর শান্ত ঠোঁটের ওপর সেই হাসির রেখাটুকু স্থির হয়ে রইল।

—আপনাকে মনে পড়েছে তা হলে।

—শুধু মনে পড়ে নি। আমাকে যে কত ভালোবাসেন, সে-কথাও জানাতে ভোলেন নি।

শর্মিলা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন। গায়ত্রীর ইতিহাস স্টাফের সবাই কিন্তু জানেন, ছাত্রীদের সম্পূর্ণ অজানা নেই। সব চাইতে বেশি করে জানেন শর্মিলা। কারণ বেদনার একটি পট-ভূমিতে দুজনের অনেকখানি মিল আছে।

গায়ত্রী বিধবা নন—কিন্তু বৈধব্যের চাইতেও নিরানন্দ তাঁর জীবন। তাঁরই বাবার ছাত্র মিস্টার শর্মা। গরীবের মেধাবী ছেলেটি তাঁদেরই বাড়িতে আশ্রিত হয়ে লেখাপড়া শিখেছিল। ধীরে ধীরে গায়ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল, গায়ত্রীর বাবা রাগ করলেন না, বরং ভাবলেন বিয়ে হলে দুজনে সুখীই হবে। গায়ত্রী এম-এ পাশ করলেন, শর্মা পি-এইচ-ডি পেলেন। বিয়ে হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ওইখানেই মিটল না। শ্বশুরের টাকায় শর্মা হায়ার স্টাডিজের জন্যে পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। সে আজ দশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু সেই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। দু-বছর পরে শর্মার চিঠিপত্র আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, আরো এক বছর পরে আমেরিকা ফেরৎ ছাত্রদের মুখে খবর এল, শর্মা আমেরিকায় বিয়ে করেছেন, সিটিজেন হয়েছেন, একটা কলেজে অধ্যাপনাও নিয়েছেন।

সেই থেকে গায়ত্রী নিজের জীবন নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন। ইংরেজি পড়ান, দর্শন পড়েন। গীতা-উপনিষদ তাঁর সঙ্গী; নিয়মিত পূজো-অর্চনা করেন—একভাবে সুখে না হোক শান্তিতেই আছেন তিনি। তার মাঝখানে হঠাৎ—

শর্মিলা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো কথা ভেবে নিলেন। বললেন, দশ বছর পরে তা হলে অনুতাপ হয়েছে ওঁর?

—বিকজ হিজ অ্যামেরিকান ওয়াইফ হ্যাজ ডিভোর্সড্ হিম।—গায়ত্রী সেই শান্ত হাসিটাই টেনে রাখতে চেষ্টা করলেন মুখের ওপর, কিন্তু তিক্ততাটা এবারে আর চাপা রইল না।

শর্মিলা বললেন, উনি কি ভারতবর্ষে আসছেন?

—না, আমাকে যেতে বলেছেন ওঁর কাছে। লিখেছেন হার্থ অ্যাণ্ড হোম সব আমার জন্যে তৈরি। গেলেই প্রাণ খুলে বরণ করবেন আমাকে। লেটস স্টার্ট লাইফ অ্যানিউ অ্যাণ্ড বেরি আওয়ার হ্যাচেট্‌স।—গায়ত্রী বিস্বাদ গলায় টীকা করলেন: যেন

আমি ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলুম—উনি অ্যামেরিকায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন! এখন সন্ধির প্রস্তাব।

শর্মিলা ধীরে ধীরে বললেন, কিন্তু আপনি তো ওঁকে ক্ষমা করতে পারেন।

—ক্ষমা আমি অনেকদিন আগেই করেছি। যে আমাকে ভালোবাসে নি, তার ওপর অভিমানের দাবিটুকুও রাখব, এত লোভী আমি নই।

—তা হলে তো আপনি যেতে পারেন ওঁর কাছে।

—না, পারি না।

—কেন পারেন না?

—আজ উনি আমার কাছে অনেকদিন আগেকার একটা চেনা মুখ ছাড়া কিছু নন। এখন ওঁকে আমার আবার নতুন করে স্বামী বলে ভাবতে হবে, ভালোবাসতে হবে। কিন্তু এখন আমার বয়েস তেত্রিশ অ্যাণ্ড টু লেট!

শর্মিলা কিছুক্ষণ গায়ত্রীর চন্দন-আঁকা উজ্জ্বল সাদা কপাল আর দুটি গভীর চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি স্বামীকে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছেন আপনি?

তখনই গায়ত্রী কথাটার জবাব দিতে পারলেন না। কয়েক সেকেণ্ড জানলা দিয়ে দূরের মোরাবাদী পাহাড়ের চূড়োর ওপর ছোট মন্দিরটার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর দৃষ্টিটা শর্মিলার দিকে ফিরিয়ে এনে বললেন, মনের কথা মানুষ কি সব জানে, না জোর করে কিছু বলতে পারে? তবে আমি সাত বছর ধরে চেষ্টা করেছি, হয়তো সবটা ব্যর্থ হয় নি।

শর্মিলা যেন একটু আহত হলেন। ঠিক কোনখানে যে বিঁধল বুঝতে পারলেন না, কিন্তু গায়ত্রীকে তাঁর নিষ্ঠুর বলে মনে হল। বললেন, তা হলে আপনি আমেরিকায় যাবেন না?

কোনো দরকার আছে যাবার ?

—সত্যি বলছেন, আপনার একটুও খারাপ লাগবে না মিসেস শর্মা ?

গায়ত্রীর দৃষ্টিটা আবার ঘুরে গেল মোরাবাদী হিলের দিকে। সেই ভাবেই জবাব দিলেন, একটু ঢেউ যদি ওঠেই, তাকে থামাতে পারব। জানি, যা আমাকে টানবে—তা প্রেম নয়, প্রলোভন। ওইখানেই আমি ছোট হতে চাই না।

শর্মিলা চমকে উঠলেন। যেন তাঁরই কথা বলছেন গায়ত্রী। আজ তাঁকেও বাইরে থেকে টানছে ওই রকম একটা প্রলোভনের শক্তি, থেকে থেকে তাঁর সব চিন্তা চেতনাকে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। রাহুর মতো একটা মানুষ এসে পড়েছে কোথা থেকে, তাঁকে বিকেন্দ্রিত করেছে, বিচ্ছিন্ন করছে, তাঁর এতদিনের সাধনাকে ভেঙে চুরে ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। এ তো প্রেম নয়। এ-সেই কৃষ্ণচূড়ার নেশা—যা আদিম, যা অন্ধ—যা যুগে যুগে মানুষের যোগভঙ্গ করে ?

শর্মিলা বললেন, আপনার শক্তি দেখে আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে মিসেস শর্মা।

—শক্তি ?—গায়ত্রী হাসলেন : ঠিক জানি না। কিন্তু বন্যা এলেই ভেসে যেতে পারব না। আমার বাবা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কিছু সংযমের শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তা ছাড়া আমার গুরুদেব আছেন।

—আপনার গুরুদেব !—শর্মিলা উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন : তিনি মানুষের মনকে আশ্রয় দেন ?

—দেন বই কি। লোকে নইলে কেন যাবে গুরুর কাছে ?

মিনিটখানেক স্তব্ধ থেকে শর্মিলা বললেন, আপনার গুরু কোথায় থাকেন ?

—এখন কাছেই রয়েছেন। নামকুমে। —গায়ত্রী হাসলেন: কিন্তু জানতে চাইছেন কেন?

—আমাকে একবার নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে?

গায়ত্রী কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে শর্মিলার দিকে চেয়ে রইলেন।

—কিন্তু আপনি তো বিজ্ঞানের ছাত্রী। এ-সব মানেন কী?

—বিজ্ঞান অর্থোডক্স নয়।—শর্মিলা গভীর স্বরে বললেন, সে সব সময়ে সত্যকে খুঁজতে বলে। সে সত্য কোথায় আছে কোথায় নেই, আজো জবাব কেউ দিতে পারে নি। আমাকে নিয়ে চলুন তাঁর কাছে।

—সত্যি যাবেন?

—সত্যি যাব।

গায়ত্রী বললেন, বিজ্ঞানের কৌতূহল মিসেস রায়চৌধুরী?

—না মিসেস শর্মা। একটু শক্তি—একটু আশ্রয় আমার দরকার। মনের দিক থেকে কোথায় যেন ফাঁকা হয়ে গেছি, কিছুতেই জোর পাচ্ছি না।

গায়ত্রী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিছু একটা বুঝলেন, কিন্তু কী বুঝলেন তিনিই জানেন। বললেন, আচ্ছা, তাই হবে। আজ বিকেলের দিকে তাঁর ওখানে যাব দুজনে।

গায়ত্রী বেরিয়ে গেলেন।

লেখার টেবিলে বসে আবার চোখ বুজলেন শর্মিলা। না—কৃষ্ণচূড়া নয়। তিনি আবার তাঁর নিভৃত মন্দিরটিতে ফিরে আসতে চান, আবার নিঃসঙ্গ নিভৃত অবসরে ধ্যানে বসতে চান সেখানে, আপনার নিঃশব্দ বেদনায় মনের ধূপ-দীপ ফুলের মালায় যার আরতি করতে চান—সে অমিতাভ ছাড়া কেউ নয়।

শুধু একজন সদ্‌গুরু চাই যিনি সেই আত্ম-দেউলের সব দরজা-জানলাগুলোকে বজ্রের অর্গল দিয়ে চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে পারেন।

॥ পনেরো ॥

'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই যে হিয়া থরো থরো কাঁপে আজি
এমনতরো—'

সমাপ্তি সঙ্গীত সারা হল। সভাও শেষ। ধন্যবাদের পালা আধখানা পর্যন্ত না এগোতেই সব খালি হতে আরম্ভ করল।

হাসিমুখে এগিয়ে এল অরবিন্দ।

—বেশ সুন্দর বলেছ ব্রাদার। আধুনিকতার চোখে রবীন্দ্রনাথ। বেশ অ্যাপ্রেসিয়েট করেছে সবাই।

কিরণ ম্লান ভাবে হাসল ঃ বাড়িয়ে বলছেন অরবিন্দদা। বক্তৃতা আমার আসে না।

—আরে, প্রফেশনাল স্পীকারদের একঘেয়ে ইমোশ্যন আর কার ভালো লাগে আজকাল। সবাই এখন কিছু নতুন কথা শুনতে চায়। এ যুগের মন রবীন্দ্রনাথকে কতটা নিচ্ছে, কতখানি নিতে পারছে না, আর কেনই বা পারছে না—তার চমৎকার অ্যানালিসিস করেছ তুমি। এই ধরণের আলোচনাই তো আজকাল দরকার। নইলে গাদাখানেক কোটেশন আর একঘণ্টা ধরে ফাঁপানো উচ্ছ্বাস—অ্যাবশোলিউটলি মীনিংলেস—লোকে হাই তুলতে থাকে।

অনেকখানি বেশি বলছে অরবিন্দ, অনেক বেশি কমপ্লিমেণ্ট দিচ্ছে। ভদ্রতা। কিরণের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল না। কী হবে কথা বাড়িয়ে ?

—এবার যাওয়া যাক্ দাদা।

—চলুন, একটু চা খাবেন আগে—উদ্যোক্তারা এগিয়ে এলেন।

—কিছু দরকার নেই।

—না—না, সে কি হয়।

আবার সেই ভদ্রতার জের টানা। অফিস ঘরের টেবিল থেকে ফাইল লেজার বুক সরিয়ে চীনেমাটির প্লেটে সন্দেশ-রসগোল্লা-সিঙাড়া। আধঠাণ্ডা খানিকটা চা। বক্তার পারিশ্রমিক। খুব ভালো লাগে তা নয়, কিন্তু উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার কথা ভেবে তাঁদের বিমুখ করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

অরবিন্দের জন্যেও চা খাবার এসেছিল—সে এদের 'বস' এবং অনুষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট। আর খাবার এসেছিল বারো-তেরো বছরের সেই ছোট মেয়েটির জন্যেও—যে আসরে সমাপ্তি-সঙ্গীত গাইল।

মেয়েটির মাথায় একটি টোকা দিয়ে অরবিন্দ বললে, টুলুর গান কেমন লাগল, তাই বলো।

—খুব ভালো।

—দক্ষিনীতে শিখছে। ওঁরা বলছেন খুব প্রমিজ আছে গলায়—অরবিন্দের চোখ-মুখে স্নেহ উছলে পড়ল।

টুলু অর্থাৎ ইন্দ্রাণী অরবিন্দের বড়ো মেয়ে। একবারের জন্যে কিরণের মনে হল, আজকের আসরে টুলু গান গাইতে পারবে বলেই কি অরবিন্দের এত উৎসাহ, সেই জন্যেই কি সে অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়েছে? কিন্তু পরক্ষণেই নিজের সিনিক চিন্তায় কিরণ লজ্জিত হল। সরল সুকুমার মেয়েটির মুখ, টানা-টানা বড়ো বড়ো চোখ। প্রতিমার চেহারার সঙ্গে স্পষ্ট আদল আসে, মেয়েটি যে তারই ভাইঝি সে-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

প্রতিমা। প্রতিমা কী করছে এখন? তেমনি চুপ করে বসে আছে? তার শূন্য চেতনার ওপর দিয়ে এখন কোন অর্থহীন, কোন্ বিকৃত দুর্ভাবনার যুক্তি-শৃঙ্খলাহীন ছায়ামিছিল? আবার কি কোনোদিন সহজ স্বাভাবিক হতে পারবে সে? ডাক্তার ঘোষাল কি বিশ্বাস করেন যে, এখনো অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়?

সন্দেশটাকে কোনোমতে গিলে খাবারের প্লেটটা সে দূরে সরিয়ে দিলে। আধঠাণ্ডা চা এতক্ষণে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, এক চুমুকেই সেটা শেষ হল।

কিরণ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

—এবার আমায় যেতেই হবে অরবিন্দদা।

—দাঁড়াও হে সাহিত্যিক, দু' মিনিটেই তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে না।

—অরবিন্দ হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল: জাস্ট সেভেন। চলো, আমিই তোমায় পৌঁছে দেব।

—আপনি আর কেন কষ্ট করে—

খাবারের প্লেটে মন দিয়ে অরবিন্দ সংক্ষেপে বললে, ডোনট্ বী সিলি।

একটা ছোটখাটো ধমক এবং দস্তুরমতো অফিসিয়াল গলায়। কিরণ মৃদু হেসে জানলার ধারে সরে গিয়ে সিগারেট ধরালো। গোটা তিনেক অটোগ্রাফের খাতা এসেছিল, সই করে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। লালদীঘির গলা টিপে ধরে হাজার চোখে ধারালো হাসি হাসছে দূরভাষ ভবন। ছেলে-বেলায় লালদীঘিকে মনে পড়ল—কোথায় সেই সবুজ—সেই ফুল—সেই সন্ধ্যার পরে ঘনিয়ে আসতে থাকা শান্ত নির্জনতা। আজ এই সাতটার পরেও বড়ো বাজারের মতো ভিড়—কোলাহল, ট্রাফিকের স্রোত—কত আলো যে বেড়ে গেছে এখন। কলকাতায় প্রকৃতি আর বেঁচে নেই—বেঁচে থাকবার উপায় নেই তার।

চিন্তাটা মনে আসতেই ভ্রূকুটি করল কিরণ। প্রকৃতি—সবুজ—অনেকখানি আকাশ। কেন এ-সব কথা মনে পড়ছে তার? এতদিন ধরে এ সমস্ত নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায় নি—চারদিকের এই প্রচণ্ড মানুষের বন্যায় সে-ও মেলে দিয়েছে নিজেকে, রক্তে রক্তে অনুভব করেছে তার তরঙ্গ, তারই কথা লিখে গেছে পাতার

পর পাতা। কিন্তু হঠাৎ কেন তার এই প্রকৃতি-বিশ্বাস, কেন তার দীর্ঘশ্বাস বিলুপ্ত বনস্পতি, আর ঝরে যাওয়া ফুলের জন্যে? একি কৃষ্ণচূড়ার বীজাণু—হাজারীবাগ জেলার আদিম প্রকৃতির কাছ থেকে নিজের মধ্যে বয়ে এনেছে, এখনো নিস্তার পাচ্ছে না?

—কী, উপন্যাসের প্লট?

পাশে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ। মুখ মুছছে রুমালে।

—না দাদা, প্লট নয়। ডালহাউসি স্কোয়ার দেখছিলুম।

—দেখবার মতোই বটে।—অরবিন্দ হাসল: সারা ইণ্ডিয়ার মানি-মার্কেট—দেশ-বিদেশের কত মানুষের ভীড়। তোমরা এ নিয়ে একটা উপন্যাসও লিখতে পারলে না। নিদেনপক্ষে একখানা মিস্টার ব্যারিটও যদি দাঁড় করাতে পারতে, হাঁ—বুঝতুম তবু একটা কাজের মত কাজ করলে বটে।

কিরণ চুপ করে রইল। কাজের মতো কাজ—অ্যাম্‌বিশান লেখা। কিন্তু জীবনে কোথাও কি কারো অ্যামবিশন আছে আজ—অন্তত মধ্যবিত্তের ইতিহাসে। এখন কোনোমতে একটা অস্তিত্ব টেনে নিয়ে চলা, তারই ফাঁকে ফাঁকে কিছু যন্ত্রণা আর খানিক বুদ্ধির আবর্ত ফেনিয়ে তোলা—এর বেশি কী আর করা যায় বাংলা দেশে? কিরণ যদি রাজনীতি করত, যদি পলিটিকাল নভেল লিখতে পারত, তা হলে অন্তত মানুষকে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারত সে। কিন্তু সে তো পলিটিকসে বিশ্বাস করে না।

অরবিন্দ বললে, কী, যাবে নাকি?

—বাঃ যাব না?

—লক্ষণ দেখে তো মনে হচ্ছে না। তুমি তো ডালহাউসি স্কোয়ারকে নিয়েই ধ্যানস্থ হয়ে আছো।

—আপনাকে নিশ্চিন্তে সন্দেশ খাওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলুম। চলুন।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। গাড়িতে উঠল অরবিন্দ, কিরণ আর টুলু।

মীটিঙের সেক্রেটারী একজোড়া মালা গাড়ির ভেতর গুঁজে দিয়ে বললে, স্যার, তা হলে আর আমরা—

অরবিন্দ বললে, ঠিক আছে, আমি তো নিয়ে যাচ্ছি।

ট্যাক্সি চলল। অরবিন্দ বললে, বালীগঞ্জ।

—সে কি দাদা। আমাকে আগে কলেজ স্ট্রীটে পৌঁছে দিয়ে—

—হবে এখন কলেজ স্ট্রীট। তার আগে চলো একবার আমার বাসায়। আমার গিন্নী বহুকাল ধরে তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল। আমি বলি নৈ, একজন বাঘা সাহিত্যিক, তার দর্শন-লাভ কি সোজা কথা। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, বিস্তর ধর্না দিতে হয়। যাই হোক, আজ যখন তোমায় ধরেছি, বাসায় না নিয়ে গিয়ে ছাড়ব না।

—আমি আর একদিন যেতুম দাদা। সত্যি বলছি, আজ আমার কিছু জরুরি কাজ ছিল।

অরবিন্দ নিজের পাইপে আগুন ধরিয়ে বললে, তোমার জরুরি কাজ চিরদিনই থাকবে এবং সেই আর একদিন কোনোদিনই আসবে না। অতএব চালাকি করো না, চুপচাপ বসে থাকো।

টুলু মিনতি করল এবার।

—সত্যি পিসেমশাই, চলুন না আমাদের ওখানে। জানেন, আমাদের স্কুলের বাংলার দিদিমণি আপনার লেখার কথা খুব বলছিলেন। আমি বললুম, আপনি আমার পিসেমশাই। শুনে দিদিমণি বললেন, একদিন আলাপ করিয়ে দিয়ো তো।

অরবিন্দ হেসে উঠল : আর কী চাও? টুলুর বাংলার দিদিমণি পর্যন্ত তোমার অ্যাডমায়ারার—এর পরে তোমার কোনো আপত্তিই আর চলতে পারে না।

কিরণ চুপ করে রইল। যখন নিজেকে নিয়ে থাকতে ভালো লাগে, তখন বাইরের থেকে ক্রমাগত অকারণ টান আসতে থাকে, মনটাকে বিতৃষ্ণ করে তোলে। কিন্তু এ-সব অরবিন্দ বুঝবে না।

তার প্রকাণ্ড শরীর, বিশাল স্বাস্থ্য, বিপুল অট্টহাসি। জগতের সব কি ? তার সামনে সরল রেখায় চলছে, কোনো জটিলতার কথা সে ভাবতে পারে না, ভাবতে চায়ও না।

অতএব যেতে হল অরবিন্দের বাসায়। সিঁড়িতে পা দিয়েই পাড়া কাঁপিয়ে অরবিন্দ হাঁক ছাড়ল : ধরে এনেছি।

অরবিন্দের স্ত্রী মাধবী বোধহয় তৈরিই ছিল। ছুটে এলে ঘর থেকে।

—সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছে গো ?

প্রণাম করে ক্লান্ত হাসি হাসল কিরণ : পশ্চিমে নয়।

—বিশ্বাস হচ্ছে না। যাই হোক দয়া করে যখন এসেছ, তখন কি দরজা থেকেই চলে যাবে, না ভেতরে পা দেবে ?

কিরণ ঘরে ঢুকল।

তারপরে আবার চা। এটা-ওটা গল্প। সাড়ে আটটার সময় কিরণ বললে, দাদা—তা হলে—

মাধুরী বললে, দাঁড়াও রান্নার একটু বাকী আছে।

—সেকি, খেয়ে যেতে হবে ?

—কেন, জাত যাবে নাকি ?

—সে কথা নয়। মেসে বলে আসি নি, খাবার নষ্ট হবে ওখানে।

—হয় হোক, সেটা এমন কিছু রাজভোগ নয়। পালাবার চেষ্টা কোরো না। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই সব রেডি করে দেব।

কিরণ ফিরল সাড়ে দশটায়।

যা অনুমান করেছিল, ঠিক তাই। খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটতেই অরবিন্দ তাকে ছাড়ল না।

—আরে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? ট্যাক্সি করেই তো যাবে—তাড়াহুড়ো কিসের ?

তারপর—এতক্ষণ যে নামটা কেউ করে নি, সেই প্রতিমার প্রসঙ্গটাই এল।

—কী ভাবছ প্রতিমার সম্পর্কে ?

কিরণের সমস্ত মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটু চুপ করে থেকে বললে, ট্রীটমেণ্ট তো করাচ্ছি।

—পণ্ডশ্রম। ও কোনোদিন ভাল হবে না। আমরা সব বড়ো ডাক্তারের ওপিনিয়ন নিয়েছি।

—ডাক্তার ঘোষাল বলছেন, এখনো আশা আছে।

—বলবে। নইলে ওর অ্যাসাইলামে পেসেণ্ট থাকবে কেন ?

নিষ্ঠুরের মত শোনালো। অরবিন্দ প্র্যাকটিক্যাল। তার শরীরটার মতো চিন্তাগুলোও স্থূলকায়। কোনো জিনিসের ওপর সে অকারণে আবরণ রাখতে চায় না, কোনো সূক্ষ্মতায় তার কৌতূহল নেই। সোজাসুজি বুঝতে চায়, সহজভাবেই বিচার করে।

কিরণ সিগারেট ধরালো। অরবিন্দ গুরুজন হলেও এ অনুমতিটা বহুকাল আগেই দিয়ে রেখেছে। বলেছে, তোমার সাতখুন মাপ—স্পেশাল কন্‌সিডারেশন, তুমি সাহিত্যিক।

অরবিন্দ আবার বললে, ডিভোর্স হার।

—তারপর ?

—আমার বোন আবার কুমারী হয়ে আমার কাছেই ফিরে আসুক। তুমি মুক্তি পাবে।

কানের কাছে তৎক্ষণাৎ যেন তীব্র আর্তনাদ ফেটে পড়ল কিরণের। প্রতিমা হাহাকার করছেঃ ওরা সবাই—ওরা সবাই আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়। তুমিও কি আমার ছেড়ে যাবে ? হৃৎপিণ্ডে যেন তীর বিঁধল একটা।

—তুমি মুক্তি পাবে, কিরণ।

—আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে এত গরজ কেন আপনাদের ? ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিরণের গলার স্বর বিস্বাদ হয়ে উঠল।

—স্বার্থ আমার নয়।—অরবিন্দ গম্ভীর হল: আমি এ-নিয়ে হিরণ্ময়বাবুর সঙ্গেও আলাপ করেছি। তুমি বড়ো শিল্পী, দেশের জন্যেই তোমার বাঁচা দরকার—সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে বাঁচা। ইউ কান্‌ট ক্যারী এ লিভিং ডেথ্‌ ডে অ্যাণ্ড নাইট অন ইয়োর শোল্ডার!

—যদি বলি, তাতে আমার কোনো কষ্ট হয় না?

—তা হলে তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি একজন বিগ রাইটার হতে পারো হয়তো, কিন্তু সুপারম্যান নও।

না—সুপারম্যান সে নয়। মানুষের দুর্বলতা তার আছে, ষোলো আনাই আছে। হাজারীবাগ জেলার সেই নির্জন ডাক-বাংলো। প্রকৃতির একটি আদিম মোহাবেশের মাঝখানটিতে বসে সামনে আগুন-রাঙা ফুলের মঞ্জরী আর দূরের পাহাড়ের নীল হাতছানির দিকে তাকিয়ে বারে বারে যার সঙ্গে পেতে মন চাইত, সে প্রতিমা নয়। এমন কি, প্রতিমার আলোচনা যখনই উঠেছে, তখনি সে অনুভব করেছে একটা অদৃশ্য ফাঁস ধীরে ধীরে তার গলায় এঁটে বসছে, মৃত্যু ছাড়া তার কাছ থেকে আর নিস্তার মিলবে না।

তবু ডিভোর্স!

কী নগ্ন আর নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ালো সামনে। প্রতিমা দেখা-দিল উন্মাদ-আশ্রমের সেই ধূসর বিবর্ণ পটভূমিতে, যন্ত্রণার ছবি একখানা—একটা তরল স্রোত হয়ে বয়ে যাচ্ছে তার চেতনা—যার ওপর থেকে থেকে ঢেউ উঠে, অথচ কোথাও কোনো চিহ্নমাত্রও থাকে না!

আর সেই কান্না: 'তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে?'

সিগারেটের আধখানাই অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে কিরণ উঠে পড়ল।

অরবিন্দ বললে, কী হল?

—এসব আলোচনা এখন ভালো লাগছে না দাদা।

—কিন্তু আলোচনাটা জরুরি।—সোফায় পিট দিয়ে শুয়েছিল অরবিন্দ, এবার সোজা হয়ে উঠে বসল : একটা ডিসিশন তোমায় নিতেই হবে, বিফোর ইট ইজ ট্যু লেট। তোমারও তো বয়েস বাড়ছে, এরপরে আর—

—আমি ভেবে দেখব অরবিন্দদা। এখন থাক।

—ট্রাই টু বি রিজ্‌নেবল্‌।—অরবিন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলল : নিজের বোনকে ডিভোর্স করার কথা বলতে হচ্ছে আমাকে—এই ট্র্যাজিডিটা তুমি ভাবতে পারো? কিন্তু আমার সেন্টিমেণ্টের চাইতেও মানবিকতা অনেক বড়ো জিনিস। একজন নষ্ট হয়ে গেছে বলে তার সঙ্গে আর একটা জীবনকেও নষ্ট করতে হবে?

—জীবন নষ্ট হচ্ছে কিনা—তাই বা কে বলবে।—কিরণ বললে, তাছাড়া ডক্টর ঘোষাল যতক্ষণ আশা না ছাড়ছেন ততক্ষণ এসব কথা আমি ভাবতেও পারব না। তারপরেও ভাবতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু দাদা, এখন আমায় যেতেই হবে, অনেক রাত হয়ে গেছে।

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে ঝিমুনি ধরেছিল। কলকাতার আলোগুলো বদলে গিয়েছিল হঠাৎ। দেখা দিয়েছিল দিনের আলো—শাল-শিমুলের বনে বসন্ত দেখা দিয়েছিল, দূরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল মহাকালের পাহাড়, মনে পড়েছিল, ঠিক তার পিছনটিতেই নিঃশব্দে বসে আছেন শর্মিলা। তারপরেই চটকা ভাঙল। দেখল, গাড়িটা কলেজ স্ট্রীটে ঢুকছে।

মেসে পৌঁছে নিজের ঘরে ঢুকে দেখল দরজার সামনেই একখানা এন্‌ভেলপ্‌। বিকেলের ডাকে এসেছিল, চাকরটা ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে। আলো জ্বেলে খামটা তুলে নিলে—কোণায় চোখে পড়ল ফ্রম : ডক্টর এ কে রায়চৌধুরী—ভিলেজ—ডিস্‌ট্রিক্ট হাজারীবাগ।

গায়ত্রীর গুরুদেব আছেন নামকুমে।

এখানে তিনি থাকেন না, হরিদ্বারের ওদিকে কোথায় তাঁর আশ্রম। ভক্তদের ডাকে মধ্যে মধ্যে তাদের সেবা নিতে নেমে আসেন, এবারেও তাই এসেছেন। উঠেছেন একজন বাঙালী ডাক্তারের বাড়িতে।

গুরুদেবের নাম বোধ হয় পুণ্যানন্দ—অন্তত সেই রকমই যেন বললেন গায়ত্রী। ভালো করে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না শর্মিলা, কোথায় যেন সংকোচ বাধল। গুরুদেব গুরুদেবই, তিনি স্বয়ংদীপ্ত একটি জ্যোতির্ময় সত্তা; লৌকিক নাম তাঁর বাইরের একটা মৃদ্বলয় মাত্র; পাত্রের মধ্যে যিনি আছেন—তিনিই আসল, তিনিই অমৃতময়।

বাড়িতে জনারণ্য। গেটের সামনে গোটা তিনেক ইউক্যালিপটাসের হাল্কা ছায়ায় ভারী ভারী কয়েকটা মোটর গাড়ি ঝকঝক করছে। ইউক্যালিপটাস! একবারের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন শর্মিলা, আর একটা বাড়ির কথা মনে পড়ল, স্মৃতির অনুষঙ্গে ভেসে উঠল কয়েকটা মুখ, একজন মানুষকে দেখা গেল চায়ের টেবিলে, শর্মিলা শিউরে উঠলেন।

গায়ত্রী বললে, চলিয়ে, অন্দরমে চলিয়ে।

ভেতর থেকে ভজনের সুর উঠছিল। অনেকগুলো মিলিত কণ্ঠ।

সামনেই মস্ত হলঘর। তার তিন-চারটে খোলা দরজা দিয়ে গোটা কয়েক পাঁচশো পাওয়ারের আলোর দীর্ঘ ধারালো রেখা। ভেতরে গিজ গিজ করছে লোক। চন্দন আর ফুলের গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছে হাওয়ায়।

—খুব ভিড় দেখছি।

গায়ত্রী হাসলেন: শান্তি সবাই চায়। গুরু ছাড়া আর কে দিতে পারে? রাজরাণী মীরাজীও মাথা রেখেছিলেন চামার

রইদাসজীর পায়ের তলায়। ‘গুরু মিলিয়া মেরী রইদাসজী জিহ্নি জ্ঞান কি গুট্‌কি—’

পুরু কাচের চশমা চোখে, গলায় সিল্কের চাদর, কপালে চন্দনের তিলক আঁকা, মাথায় চকচকে টাক এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন : আইয়ে গায়ত্রী দেবী, আইয়ে—

শর্মিলাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন গায়ত্রী : মিসেস রায়চৌধুরী —শর্মিলা দেবী। মেরি কলিগ্‌। আপ গুরুজীসে মিলনে আয়ী।

ভদ্রলোকই বোধ হয় গৃহস্বামী। বললেন, নমস্কার, আসুন, আসুন।

হলঘরের মাঝখানে একটি পথ রেখে দু-পাশে ভাগ হয়ে বসেছেন মেয়ে-পুরুষেরা। মেয়েদের সংখ্যাই যেন বেশি। তাঁদের মুখোমুখি একটি বেদীর ওপর হরিণের চামড়ার আসনে গুরুদেব ধ্যানস্থের মতো বসে। বেদীর ওপর রাশি রাশি ফুল, গুরুদেবের গলায় মোটা গোড়ের মালা, দু-পাশে দুটি বড়ো। বড়ো ধূপদানী থেকে ধুনোর মেঘ উঠছে। সামনের কিছু শিষ্য-শিষ্যা চোখ বুজে করতালি দিয়ে গেয়ে চলেছেন : ‘রামনাম ভজো, রামনাম ভজো, বোলো বোলো রাম শ্রীরাম’—

গুরুদেবের উদ্দেশে দূর থেকে প্রণাম করেই বসলেন দুজন।

ভজন শেষ হল। গুরুদেব ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। শর্মিলা দেখলেন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুপুরুষ, বয়েস পঞ্চাশ থেকে ষাটের ভেতর। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, কপালে রামতিলক। দেখলে ভক্তি হয়।

গম্ভীর মধুর গলায় ভক্তির কথা বলতে সুরু করলেন হিন্দীতে।

—ভক্তি কী? সন্ত তুলসীদাস বলছেন, রামচন্দ্রজী, লছমনজী আর সীতা মাইজী চলেছেন বনবাসে। পথে পড়ল নদী। খেয়া

ঘাটের মাঝি এসে পায়ের ধুলো নিলে। ভগবান রঘুরাই বললেন, 'আমাদের পার করে দাও।' পাটনী করযোড়ে বললে, 'প্রভু, মাপ করো, তোমাকে তো আমার ডিঙায় তুলতে পারব না।' রামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন?' পাটনী বললে, 'রাম, তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ। একটুখানি চরণের ছোঁয়া দিয়েছিলে, তাই পাষাণী অহল্যা উদ্ধার হয়ে গেল। আমার এই কাঠের ডিঙিতে তুমি পা রাখবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেও যে উদ্ধার হয়ে যাবে। প্রভু, কমল নয়ন, তা হলে আমার চলবে কী করে? আমি বড়ো গরীব, এই নৌকোটিই আমার ভরসা, তুমি একে ত্রাণ করলে যে আমি সপরিবারে অনাহারে মারা যাব।' একেই বলে ভক্তি—এই হল বিশ্বাস!

গুরুদেব বলে যেতে লাগলেন, ভক্তদের চোখ ছলছল করতে লাগল, গায়ত্রী একবার চোখ মুছলেন শাড়ির আঁচলে। সময় চলতে লাগল। ধূনোর মেঘ আরো ঘন হল, ফুল আর চন্দনের গন্ধ আরও নিবিড় হল, সমস্ত পরিবেশে গভীর মোহাচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়ল একটা। শর্মিলা মগ্ন হয়ে বসে রইলেন। ঠিক এইরকম একটা আবহাওয়ায় এর আগে তিনি কখনো আসেন নি। ধর্ম সম্পর্কে কোনো সংস্কারের ভেতরে তৈরি হয় নি তাঁর মন—বাপ ছিলেন কড়া যুক্তিবাদী লোক, প্রত্যক্ষের বাইরে কোনো জিনিষকে তিনি বিশ্বাস করতেন না; যে পরিবারের বধূ হয়ে গিয়েছিলেন সেখানেও এ-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, শুধু কল্যাণীর একটা লক্ষ্মীর আসন আছে, সেখানে সকালে দুখানা বাতাসা সাজিয়ে দেন তিনি—বিশ্বাসের চাইতেও অভ্যাসটাই বড়ো। আর অমিতাভ ছিল পুরো সাহেবী ধাঁচের মানুষ, বাড়ির প্রথা অনুযায়ী বিজয়া দশমীর দিন অন্তত একবার একখানা নতুন ধুতি পরতে হত তাকে—তাতেই তার বিরক্তির অন্ত থাকত না।

শর্মিলা বলতেন, 'বছরের একটা দিনও ধুতি পরতে চাও না?'

'আমি পরতে জানি না।'

'ধুতি পরতে জানো না বাঙালীর ছেলে হয়ে?'

'লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই।'—অমিতাভ পাইপে আগুন ধরাতো: সেলাইবিহীন কাপড় মেয়েদের জন্যে আর বাঙালী বাবুদের জন্যে। বাট্ নট ফর অ্যান এঞ্জিনীয়ার।'

শর্মিলা হাসতেন: 'আমার পিসেমশাইও কিন্তু বিলেত ফেরৎ এঞ্জিনীয়ার। তিনি তো ধুতি-পাঞ্জাবী পরতে ভালোবাসেন।'

'ওঁরা কম্প্রোমাইজ করতে চান। কিন্তু আমরা ইয়ঙ্গার জেনারেশন, ও-সবের মধ্যে নেই।'

কোথায় অমিতাভ, কোথায় সে বিলিতী ধরণে ফার্নিসড্ কোয়ার্টার—কোথায় সেই সব দিন। যে স্মৃতিগুলোকে কৃপণের ধনের মতো বুকের মধ্যে লালন করতে চান শর্মিলা, সেখানে অমিতাভকে দেখা যায় শর্টস পরা, চোখে কালো গগ্‌লস, শর্মিলাকে পেছনের সীটে বসিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটিয়েছে মোটর সাইকেল; কিংবা ক্লাবের সেই গ্র্যাস-কোর্ট—টেনিস স্যুট পরে কামানের গোলার মতো বলটা ড্রাইভ করেছে নেটের ওপারে প্রতিদ্বন্দ্বী মিস্টার খোসলার দিকে। শর্মিলা চকিত হয়ে উঠলেন—এবার গুরুদেব নিজেই গান ধরেছেন, তালে তালে মাথা নড়ছে ভক্তদের। এর মধ্যে কোথায় তিনি আনবেন অমিতকে, কোন্‌খানে তাকে জায়গা দেবেন।

পাশ থেকে গায়ত্রী বললেন, ভালো লাগছে?

লজ্জিত হয়ে শর্মিলা বললেন, ভালো লাগছে বই-কি, খুব ভালো লাগছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে আসর শেষ হল। গুরুদেব বললেন, যাও, এবার সবাই প্রসাদ নাও গে।

ঘর শুদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়ালেন। একে একে গুরুদেবকে প্রণাম করে এগিয়ে চললেন বাঁ দিকের দরজা দিয়ে। গায়ত্রী আর শর্মিলার

প্রণামের পালা এল। দুজনেরই মাথায় হাত রাখলেন তিনি, হাসলেন প্রসন্নভাবে।

গায়ত্রী বললেন, গুরুজী, আমার বন্ধু। আপনাকে দেখতে এসেছেন।

—প্রফেসার?

—জী মহারাজ।

—আনন্দ রহো বেটি, রাম কহো।

দাঁড়াবার সময় দিল না, পিছনে লাইন পড়ছে ভক্তদের। কিন্তু বাঁ পাশের দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েই থেমে দাঁড়ালেন শর্মিলা।

—মিসেস শর্মা?

—কী হল?

—আমাকে মাপ করতে হবে, এখন আমি কিছু খেতে পারব না।

—ওকথা বলতে নেই ভাই, পাপ হয়। খেতে না চাও, একটু কপালে ঠেকিয়ে যাও অন্তত।

বাঁধানো উঠোন জুড়ে উজ্জ্বল আলোর দীপাবলী। সারি সারি কলাপাতা পড়েছে। গায়ত্রীর পাশে শর্মিলাও বসে পড়লেন।

খিচুড়ি এল, তরকারী ভাজা-ভাজি এল, লুচি-মোহনভোগ-পায়েস এল, নানা রকমের মিষ্টি এল। শর্মিলার একবার মনে হল, শুধু এই আকর্ষণই কি ভক্তদের টেনে আনবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? কিন্তু এ-রকম একটা অন্যায় চিন্তা করে পরক্ষণেই তিনি লজ্জিত হলেন।

গায়ত্রী সামান্য কিছু খেলেন, শর্মিলা একটুখানি খিচুড়ি কপালে ঠেকিয়েই পাতা সরিয়ে রাখলেন। গৃহস্বামী এসে দাঁড়ালেন সামনে।

—একি—আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না মিসেস রায়চৌধুরী।

—ক্ষমা করবেন, আমার শরীর ভালো নেই।

—গুরুদেবের প্রসাদ, স্বচ্ছন্দে খান আপনি কোনো ক্ষতি করবে না।

—আর একদিন হবে।

আচ্ছা—বলে অন্য ভক্তদের আপ্যায়নে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মুখ দেখে মনে হল, খুব খুশি হয়ে গেলেন না। শর্মিলার ভারী অপরাধী মনে হল নিজেকে, টের পেলেন এই আসরে তিনি সম্পূর্ণ বেমানান। কিন্তু প্রসাদ হোক আর যাই হোক, রাত্রে এ সমস্ত খাওয়া তাঁর অভ্যাস নেই, খেতেও পারবেন না।

প্রসাদ পর্ব শেষ হলে ফিরে যাওয়ার পালা। আবার প্রণাম।

ভাঙা বাংলায় গুরুদেব বললেন, আবার এসো মা।

—কী করে বুঝলেন আমি বাঙালী ?

গুরুদেব সস্নেহে হাসলেন, কথাটার জবাব দিলেন না। তারপর বললেন, মন খুব চঞ্চল হয়েছে—না? ভগবান রামচন্দ্রজীর শরণ নাও মা—তিনিই শান্তি দেবেন তোমাকে।

অভিভূত হয়ে বেরিয়ে এলেন শর্মিলা।

পুরুলিয়া রোড ধরে দুজনে যখন ফিরতে লাগলেন সাইকেল-রিক্সাতে, বেশ রাত হয়েছে তখন। দু'ধারে গাছের ঘন-গম্ভীর ছায়া, পথ প্রায় নির্জন, পাহাড় থেকে অল্প অল্প হিমেল-হাওয়া। শর্মিলা আঁচলটা ভালো করে জড়ালেন শরীরে।

গায়ত্রী তন্ময় হয়ে বসে ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলেন ?

একবার দ্বিধা করলেন শর্মিলা, তারপর বললেন, ভালো।

—মন শান্ত হল ?

—আমরা দুর্বল মানুষ। সময় লাগে।

—তা ঠিক, সময় লাগে।—গায়ত্রী বললেন, কিন্তু সময়ও তো

বেশি দেওয়া যায় না। 'যাই জীবন অাঁজুলিকে পানি।' যত দেরি হবে, ততই বেশি করে হারাব আমরা।

শর্মিলা চুপ করে রইলেন। গায়ত্রী বলে চললেন, সময় আমারও লেগেছিল। অত বড়ো শক সহজে ভোলা যায়? তবু ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এল। দেখলুম, স্বামী-সংসারের চাইতেও কত বড়ো সম্পদ আছে—দেখলুম কী ঐশ্বর্য অপেক্ষা করে আছে মানুষের জন্যে। 'বস্তু অমোলক দী মেরে সদ্‌গুরু কির্‌পা কর আপনায়ো।' তখন মনে মনে বললুম, 'জনম জনমকে পুঁজি পায়ী'—গায়ত্রী হাসলেন; আজ এসব ফেলে দিয়ে আমেরিকা রওনা হব স্বামীর ঘর করতে, অ্যাণ্ড বিকজ হিজ অ্যামেরিকান ওয়াইফ হ্যাজ ডিভোর্সড হিম?

শর্মিলা তেমনি নিঃশব্দেই বসে রইলেন। গায়ত্রী জন্ম-জন্মান্তরের সম্পদ পেয়ে গেছেন, তাঁর আর কিছুই চাইবার নেই; মিস্টার শর্মা তাঁর কাছে লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন—নাম শুনছেন, একদিন সামান্য পরিচয়ও হয়তো ছিল, কিন্তু মনের ভেতর কোথাও এতটুকু ছায়া পর্যন্ত নেই। এই তো তাঁর পরম পাওয়া—তাঁর মুক্তি!

কিন্তু এই মুক্তির সম্ভাবনায় শর্মিলা তো একটুকুও খুশি হতে পারছেন না। এ যেন এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, এক পরিণাম, এক পরিসমাপ্তি!

রিক্সা এসে হস্টেলের সামনে দাঁড়ালো। শর্মিলা ব্যাগ খুলতে যাচ্ছিলেন, গায়ত্রীই ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

নিজের ঘরে যাওয়ার আগে গায়ত্রী বললেন, আজ বড্‌ড ভিড় ছিল, ভালো করে কথা হল না গুরুদেবের সঙ্গে। যাবেন আর একদিন?

—যাব।

—তা হলে সেদিন সকালের দিকেই বেরুনো যাবে। তখন বেশি লোকজন থাকে না, গুরুদেবকে একটু একলা পাওয়া যায়।

—বেশ, তাই হবে।

সেই রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন শর্মিলা। চাঁদ উঠেছে, মোরাবাদী পাহাড়ের মাথাটা দেখা যায়, দেখা যায় না। কয়েকটা ঝাপসা তারা জ্যোৎস্নার বুকে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। শর্মিলা ভাবতে চেষ্টা করলেন, সত্যিই কি ওখানে মুক্তি আছে, শান্তি আছে তাঁর জন্যে? ভজনে, ধূপ-ফুল-চন্দনের গন্ধে, অনেক বেশি ঝলমলে আলোর তীক্ষ্ণ জোয়ারে, বহু মানুষের মুগ্ধ মনের ছোঁয়ায় আর দীর্ঘশ্বাসে একটা মোহাচ্ছন্নতার জগৎ তৈরি হয়েছিল ওখানে। সন্দেহ নেই, ওর মধ্যে শর্মিলাও তলিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরও চোখ দিয়ে জল আসছিল।

কিন্তু এক মোহের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে আর এক মোহ? এক কৃষ্ণচূড়ার-স্বপ্নজগৎ থেকে আর এক ভক্তির নেশার জগতে? কী হবে? কী হবে?

শর্মিলা অমিতাভকে ফিরে পেতে চান। কিন্তু গুরুদের সব কেড়ে নেবেন। তখন অমিতাভ থাকবে না, কিরণ বসু থাকবে না, শুধু থাকবে এমন এক অমূল্য সম্পদ—যা সব চাওয়া-পাওয়ার পাট মিটিয়ে দেয় চিরকালের মতো। শর্মিলা কি তাই চান? জীবন তাঁকে বঞ্চনা করেছে বলেই জীবনের ওপর সব দাবি তিনি ছেড়ে দেন নি, অমিতাভর ধ্যানে মগ্ন-পবিত্র জীবন কাটাতে চান বলেই তিনি সন্ন্যাসিনী হতে চান না!

না—মিসেস শর্মার মতো হওয়া তাঁর সম্ভব নয়। অতখানি নিষ্ঠুর হওয়া তাঁর কল্পনারও বাইরে।

তবু একটা আশ্রয় চাই কোথাও। একটা কিছুকে শক্ত মুঠোয় তাঁর আঁকড়ে ধরতেই হবে। আজ ভজনের আসরে বসেও শর্মিলা বুঝতে পারছিলেন, তাঁর রক্তে কৃষ্ণচূড়ার বন্যা বইছে। সে স্রোতে ভেসে যাওয়া চলবে না—আত্মরক্ষা তাঁকে করতেই হবে।

হয়তো সে সমাধান করতে পারবেন গুরুদেবই।

কিন্তু পরের কথা পরে। আজ সমস্ত রাত ধরে কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন নামুক চোখ ভরে। সব শেষ করে দেবার আগে শেষবারের জন্যে আসুক সেই মাতলামি—যা দুঃসহ, যা দুর্দম।

॥ ষোল ॥

একটা কাগজ থেকে গল্প লেখবার জন্যে জোরালো তাগিদ আছে, গোটা পঞ্চাশেক টাকারও দরকার আছে। সকাল বেলাতেই কাগজ-কলম নিয়ে গল্প লিখতে বসে গিয়েছিল কিরণ।

ঝাপসা একটা চিন্তা মাথার ভেতরে ঘুরছিল, কাগজে কয়েক লাইন লিখতে না লিখতেই কিরণ চকিত হয়ে উঠল, অস্বস্তিতে নামিয়ে রাখল কলমটা। আজ দশ বছরের ভেতরেও যা সে করে নি, ঠিক সেই কাণ্ডটিই ঘটতে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমেই এমন একটি প্রকৃতি-বর্ণনা দিয়ে সে আরম্ভ করছে, যার বিরুদ্ধে এতকাল মনটাকে সে সজাগ প্রহরীর মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

সেই বর্ণনায় একটি সন্ধ্যার নদী। ওপারের শালবনে সোনা বৃষ্টি শেষ হয়ে এল, নদীর জলে তার শেষ রেশটুকু এখনো কাঁপছে। হাওয়ায় অল্প অল্প বালি উড়ছে বক-গাংশালিক-সাইপের ঝরা পালক ; ওদিকে পাহাড়ের মাথায় চাঁদের আভাস পড়ল, ঠিক মনে হল যেন কোনো অরণ্য-কিরাতের কপালে কে যেন শ্বেত আর রক্তচন্দন মাখিয়ে—

প্রকৃতির সেই আত্মাটা। এখনো তার সঙ্গ ছাড়ে নি, চলন্ত ট্রেনের ছায়ার সঙ্গে ছায়া মিলিয়ে, মাঠ-নদী-বন পেরিয়ে ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। আশ্চর্য!

না—এ লেখা নিয়ে আর এগোনো চলে না। শেষ পর্যন্ত জোলো একটা রোমান্টিক গল্প দাঁড়িয়ে যাবে।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে প্রথমে কলমটা মুখে পুরল। তারপর সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখল একটাও নেই। এখন সিগারেট আনাতে হলে হয় গলা ফাটিয়ে চাকরটাকে ডাকাডাকি করতে হয়, না হলে তেতলা ভেঙে নেমে যেতে হয় রাস্তায়। দুটোর একটাতেও উৎসাহ এল না। কিছুক্ষণ মাথার ওপরকার একটা মোটা-সোটা টিকটিকিকে অকারণেই চোখের হিংস্রতা দিয়ে বিদ্ধ করল, একে একে দু-হাতের দশটা আঙুল মটকালো, শেষ পর্যন্ত টেবিলের ওপর আবার ফিরে এল দৃষ্টিটা।

একখানা খাম। কাল এসেছিল। ডাক্তার রায়চৌধুরীর চিঠি।

প্রত্যেকটা লাইন মনে গাঁথা হয়ে আছে। 'অমন করে হঠাৎ চলে গেলেন কেন? আপনাকে বেশ লেগেছিল মশাই। এখানে আমাদের মন-টন এখন খারাপ, বাসব আর লেখা হাজারীবাগে চলে গেল, ওদের স্কুল খুলে গেছে। শর্মিলাও নেই, ভারি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। আপনি কিন্তু আমাদের ভুলবেন না, সময় পেলেই দু-দশ দিন বেড়িয়ে যাবেন এখানে। রাজেনবাবুর বাংলোতে আর ওঠবার দরকার নেই, এবার এলে কিন্তু গরীবের আতিথ্যই নিতে হবে।'

কিরণের মুখে স্বাদহীন হাসি ফুটে উঠল খানিকটা। কেন সে হঠাৎ পালিয়ে এল, তার সত্যিকারের কারণটা জানতে পারলে রায়চৌধুরী কি এমন করে আমন্ত্রণ করতে পারবেন তাকে? শর্মিলা হয়তো এখনো কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে যখন তার দুর্বলতার খবর তাঁরা জানতে পারবেন, সেদিনও কী এই বিশ্বাস ভালোবাসা তাঁদের থাকবে?

আজ আর কোন সন্দেহ নেই, কৃষ্ণচূড়া সেদিন তাকে আর শর্মিলাকে ঘিরে যে বৃত্ত রচনা করছিলো, তা আরণ্যক; মহাকাল যাওয়ার পথে ডাক্তার বলেছিলেন, আগে এ অঞ্চলে বসন্তের সময়

শিমূল ফল খেতে আসত হরিণের পাল, আর হরিণের লোভে ঝোপ-ঝাপের আড়ালে ঝলমলিয়ে উঠত বাঘের চোখ। সে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। যে ইতিহাস শেষ হয় নি। সেই হরিণের চোখ ছিল শর্মিলার, সেই বাঘের সত্তা কিরণের রক্তে দোলা দিয়েছিল। শুকনো পাতার ওপর সতর্ক পায়ের শব্দ শুনেই হরিণ পালিয়েছে, কিন্তু বাঘের আত্মা এখনো তো তার সঙ্গ ছাড়ল না।

কলকাতাও অরণ্য। এখানেও আদিম আগুন। কিন্তু তার ওপর কৃষ্ণচূড়ার প্রচ্ছদপট নেই। এখানকার জ্বালা কোনো দিনান্তের শালবনে সোনা হয়ে ঝরে না। আলো এখানে নগ্ন-নির্লজ্জ, দ্বিতীয় যুদ্ধের রাঙা ধুলোর ঝড়ে এখানকার হরিণরা অদৃশ্য। এখন বাঘ আর বাঘিনী পরস্পরকে খুঁজে বেড়ায়। কে শিকারী, কে শিকার—কেউ জানে না।

আমি তার কথা নিষ্ঠুরভাবে লিখতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার দেশে আমি হরিণ শিকার করতে চেয়েছিলুম। ডাক্তার রায়চৌধুরী আমাকে আর একটি আশ্রমমৃগের বেশি কিছু ভাবতে পারেন নি। কিন্তু আমার মনের চেহারাটা যদি তাঁদের কাছে ধরা পড়ে যায়, তখন—তখন ?

ক্ষতি আমার নয়। নিজের সম্পর্কে আমি ইল্যুশন রাখি না। কিন্তু বিশ্বাস করে যাঁরা ঠকেছেন, তাঁদের বেদনাটাই অত্যন্ত অরুচিকর।

—আসতে পারি কিরণদা ?

কিরণ ফিরে তাকাল দরজার দিকে। তার একটি মুগ্ধ ভক্ত। বাণীব্রত চট্টোপাধ্যায়।

তার মানে, লেখাটা গেল। এমনিতেও যে হচ্ছিল তা নয়, তবু অন্তত চেষ্টা করা যেত।

কিন্তু ফোর্থ ইয়ারের এই মুগ্ধ সরল ভক্তটিকে কেন যেন ফেরানো যায় না। নিজে কিছু কিছু লিখতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনোদিন

যে লেখক হতে পারবে এমন আশা করা শক্ত। তা সত্ত্বেও ছেলেটি আন্তরিক, ভক্তি তার যুক্তিহীন, পয়সা দিয়ে কিরণের বই কিনে তাতে সই করিয়ে নিয়ে যায়। কলকাতার শহরতলী থেকে আসে, বাড়িতে বোধ হয় বাগান আছে, তা থেকে রুমালে বেঁধে আনে কখনো কিছু কনকচাঁপা, কখনো দু'টি যুঁই ফুল। বাণীব্রতের জন্যে কিরণের মায়া হয়।

—এসো।

বাণীব্রত কিন্তু তখনই ভেতরে ঢুকল না। লজ্জিত মিষ্টি হাসি হাসল একটুখানি।

—আমি কিন্তু একা নই কিবণদা, আমার দিদিও এসেছে সঙ্গে।

—দিদি! কী আশ্চর্য—কিরণ বিব্রত হল! বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ? এসো—এসো—ডাকো তোমার দিদিকে—

বাণীব্রতের সঙ্গে তার দিদিও ঘরে ঢুকল। এই মেয়েটিকে এর আগে সে কখনো দেখে নি। কিন্তু বাণীব্রতের কল্যাণে দিদির সম্পর্কে তার কিছুই জানতে বাকী নেই। ভাইয়ের চাইতেও নাকি দিদিটি বেশি ভক্তিমতী, কিরণের কোন কোন লেখা নিয়ে বাণীব্রতের যদি বা কিছু সংশয় থাকে, দিদি নিঃসন্দেহ। তার ধারণা কিরণ বসুর সব লেখাই 'মাস্টারপিস।' সমালোচনার শরশয্যায় এ-রকম আঙুলে গোনা দু'চার জনই পাতালগঙ্গার ধারা।

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই কিরণের পায়ের ধুলো নিলে।

—আরে, আরে করেন কি। ছি-ছি!

মেয়েটি হাসল: কেন, অন্যায় কী হয়েছে?

—মানুষকে এমনিতেই অনেক ছোট হতে হয়—প্রণামটা বাজে খরচ করে নিজেকে আরো নামানো উচিত নয়।

—আপনার সঙ্গে আমার লজিক মিলবে না—মেয়েটি আবার হাসল। কিন্তু তুমি বলেই ডাকবেন আমাকে। আমার নাম কৃষ্ণা।

নামটা বেমানান নয়—রোগা কালো রঙের চেহারা। সুন্দরী বলে মনে হওয়ার কোনে কারণ নেই। শুধু ঐশ্বর্য আছে তার চোখে। সে ছুটি বড়ো। কালো এবং নিবিড়। সে চোখে আকাশের ছায়া পড়ে, সমুদ্র দোলে।

কিরণ বললে, আচ্ছা তাই হবে না হয়। কিন্তু বোসো তোমরা। ঘরের অবস্থা তো দেখছো। বসবার জায়গা নিজেরাই করে নাও।

বাণীব্রত উৎসাহভরে বললে, সে আপনাকে ভাবতে হবে না। কোথায় বসতে হবে আমি জানি।

তক্তপোষের উপর থেকে খবরের কাগজ আর একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা সরিয়ে দিয়ে দু'জনে বসল। তারপর কৃষ্ণা দেখতে লাগল ঘরখানাকে। দেওয়ালে কোনো আর্টিস্ট বন্ধুর উপহার দেওয়া একখানা কিউবিস্ট ধরণের ছবি, বাঁকা হয়ে ঝুলছে, একটা বড়ো শেল্‌ফ থেকে উপচে পড়ছে বই আর মাসিকপত্র। লেখার টেবিলটা যথাসাধ্য অগোছালো, কোন কালে একটা ব্লটিং প্যাড ছিল, এখন সেটা কালি-ঝুলি আর নানারকম রেখাচিত্রে একাকার। ঘরে নিশ্চয় কাল থেকে ঝাঁট পড়ে নি, ধুলো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি, সিগারেটের অসংখ্য টুকরো, ছেঁড়া কাগজ। টেবিলের নীচে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা কাদের একখানা অভিনন্দন-পত্র, সেটা ফাটা কাচ নিয়ে ধুসর হয়ে হয়ে মহাকালের প্রতীক্ষা করছে। একটা ছোট ব্র্যাকেটে এলোপাতাড়ি কয়েকটা জামা-কাপড়, সুটকেসের তলার ওপর দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম ছড়ানো।

আর তক্তপোষ।

এটি বোধ হয় শোবার জন্য। কিন্তু চাদরটা দিন পনেরোর মধ্যেও বদলানো হয়েছে বলে মনে হয় না। ময়লা তোয়ালের নীচে একটা ময়লা বালিশ। চাদরটার দু'তিন জায়গায় পোড়া দাগ, নিশ্চয় সিগারেটের কীর্তি। বালিশটার দু'পাশে একরাশ বই—

কখনো কখনো হয়তো বালিশের কাজ বইগুলো দিয়েই চালান হয়।

কৃষ্ণা বললে, এই ঘরেই থাকেন আপনি ?

কিরণ হাসল : খুব নিরাশ হলে তো ? সাজানো-গোছানো সাহিত্য-সাধনার ঘর দেখতে হলে—ছু'তিন জন দিক্‌পালের নাম করে বললে, ওঁদের ওখানে যেয়ো। দেখবে, সরস্বতীর জন্মে ধূপ-ধুনো জ্বালানো পদ্মাসন সেখানে সাজানোই রয়েছে।

—কিন্তু আপনার এ ঘরেও তো সরস্বতী আসেন—যান।

—না, এ পথ তিনি মাড়ান না। ছেলেবেলায় একবার রাজহাঁসের পালক খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, পাই নি। হাঁসের দেখা পর্যন্ত যখন মিলল না, তখন হাঁসের মালিক ধরা দেবেন এ-আশা বিড়ম্বনা। তাই রাবণের মতো বিরোধী সাধনা স্থরু করেছি, দেখি দর্শন মেলে কিনা।

বাণীব্রত অভিভূত হয়ে বললে : কী চমৎকার করে বললেন, দেখলি দিদি ?

কৃষ্ণা বললে, চমৎকার করে হয়তো বললেন, কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। রাবণের পথ ওঁর নয়, তার জন্মে আলাদা লোক আছে। সে যাক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব কিরণদা ?

—স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে।

—আপনাদের মেসে কি একটা চাকর-বাকরও নেই যে, ঘরটর-গুলো একটু ঝাঁট দিয়ে দিতে পারে ?

—থাকবে না কেন, নিশ্চয় আছে। কাল গোটা বিকেল আমি ছিলুম না, ফিরেছি রাত এগারোটায়, ঘর তালাবন্ধ ছিল। চাকর ঝাঁট দিতে এসে ফিরে গেছে। সকালে সকলকে চা-জলখাবার দিয়ে আসতে একটু দেরি হয়।

—তা হোক।—কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ালো : ঝাঁটা আছে আপনার ঘরে ? আমিই বরং একটু—

—দোহাই তোমার, একটু স্থির হয়ে বোসো। —কিরণ বিব্রত

হল : প্রথম দিনেই আর অতখানি লজ্জা দিয়ো না। চাকরটা আসবে একটু পরেই, সেই সাফ করে দিয়ে যাবে এখন।

কৃষ্ণা বললে, তা হলে বিছানার চাদরটা অন্তত বদলে দেওয়া দরকার। যতদূর মনে হচ্ছে, ও কাজটা নিশ্চয় চাকরে করে দেয় না।

—না, তা দেয় না।—কিরণ আরো বিপন্ন হল : তুমি বোসো, আমিই ঠিক করে নেব।

কৃষ্ণা হাসল : নিলে—সাত দিন আগেই নিতেন। তা যখন করেন নি, তখন হাত আমাকেই লাগাতে হবে। দিন—চাদর বের করে দিন একটা। না কি তাও নেই? কিনে আনতে হবে দোকান থেকে?

কিরণ কিছুক্ষণ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে। প্রথম দিন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—হয় তো সাহিত্যিকের কাছ থেকে কিছু ভালো কথা শোনবার ইচ্ছা নিয়েই এসেছিল। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই গৃহিণীপনা জেগে উঠেছে তার মনে, এই অগোছালো শ্রীহীন পরিবেশটার সংস্কার করাটাই এখন তার কাছে সব চাইতে বেশি জরুরী। একটু সংকোচ নেই, প্রথম পরিচয়ের বিন্দুমাত্র আড়াল নেই কোনোখানে। এই হল সত্যিকারের বাংলা দেশের মেয়ে।

—কী ভাবছেন? চাদর আর নেই না কি?

বাণীব্রত বোধহয় লজ্জা পাচ্ছিল। বললে, দিদি, থাক না এখন এসব। উনি বরং পরেই—

কৃষ্ণা ভ্রূকুটি করল : তুই থাম। চেয়ে দেখ তো বিছানাটার দিকে। মানুষে শুতে পারে এর ভেতরে?

কিরণ হাসল : আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

—অসুবিধে হয় না, সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু অসুখ করলে কী হবে? চাদর নেই?

—আছে একটা ওই সুটকেসটায়। বের করে নাও।

—আমি আপনার সুটকেসে হাত দেব?—কৃষ্ণা একটু কুণ্ঠিত হল।

—এসেই তো শাসন সুরু করেছ—সুটকেসে হাত দিতে আর আপত্তি কি? খোলাই রয়েছে, বের করে আনো।

কৃষ্ণার কালো মুখে লজ্জার আভা পড়ল একটুখানি, নিবিড় গভীর চোখে ছায়া নামল।

—আপনারা শিল্পী-সাহিত্যিক, আপনাদের এভাবে দেখলে আমাদের ভারি খারাপ লাগে। কেন এত কষ্ট করে থাকেন? বৌদিকে নিয়ে এলেই তো পারেন এখানে।

সেই এক কথা। কিরণ একটুখানি চুপ করে রইল, তারপর সুটকেস খুলে ধোয়া একটা বেড্‌কভার বের করে দিয়ে বললে, এই নাও।

ভাই-বোন চলে গেল ঘণ্টা দেড়েক পরে। আর এরই ভেতরে ঘরের শ্রী বদলে দিয়ে গেল কৃষ্ণা। বিছানার রূপ পালটে গেল, লেখার টেবিলটা সাজানো হল, দেওয়ালের ছবিটা সোজা হল, ব্র্যাকেটের জামা-কাপড়গুলো একটু ভদ্ররূপ ধরল। আর টেবিলের ওপর একটি কাচের গ্লাসে রইল ম্যাগ্নোলিয়ার একটা কুঁড়ি—আজকে সেইটেই কিরণকে দেবার জন্যে নিয়ে এসেছিল বাণীব্রত।

কৃষ্ণার কৌতূহল অনেক।

'কখন লেখেন? কতক্ষণ লেখেন? কী ভাবে লেখেন?'

'কখনো টেবিলে বসে, কখনো বিছানায় বালিশ নিয়ে লিখি, যখন ইচ্ছে হয় তখন লিখি। কোনো-কোনো দিন রাত দু'টো তিনটে বেজে যায় লিখতে লিখতে।'

'এত রাত পর্যন্ত?'—কৃষ্ণা শিউরে উঠল: শরীর খারাপ করে না?'

'অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'খুব খারাপ অভ্যেস।'—কৃষ্ণা গম্ভীর হল: 'এই তো মেসে একা একা থাকেন, যদি হটাৎ অসুখ-বিসুখে পড়ে যান, কে দেখবে তখন? না—না, এসব কখনো করা উচিত নয়।'

কিরণ সকৌতুকে বললে, 'অতদিন সে ভাবনা ছিল, এখন আর নেই। তখন তোমাকেই ডেকে পাঠাব। আজ থেকে তুমিই তো আমার লোকাল গার্জেন হয়ে গেলে মনে হচ্ছে।

কৃষ্ণার মুখে আর একবার লজ্জার ছায়া পড়ল। বললে, 'বাণী, চল আজকে যাই। ওঁর আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।'

'এ রকম মাঝে মাঝে এসে আমার সময় নষ্ট করে ঘর গুছিয়ে যেয়ো, খুশিই হবো।'

কৃষ্ণার চোখ আলো হয়ে উঠল: 'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি বলছি।'

'একদিন যাবেন আমাদের বাড়িতে?'

বাণীব্রত কলরব করে উঠল: আমি তো কতদিন বলেছি, কিরণদার সময়ই হয় না।'

কিরণ আস্তে আস্তে বলল, 'না, এই বার একদিন, নিশ্চয় যাব।'

ওরা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলে। আর কিরণের আজ বার-বার মনে পড়তে লাগল প্রতিমাকে। সেই দু'টো বছর। প্রতিমা তাকে স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিল। সে দিন বিছানার চাদর নোংরা থাকত না, লেখার টেবিল ঝকঝক করত, মেস ছেড়ে দিয়ে কিরণ থাকত দেশের বাড়িতে—কলকাতায় যাওয়া-আসা করত। তারপর কোথা থেকে কী ঘটে গেল—

বিকেলে আবার সেই অ্যাসাইলামে।

ডাক্তার ঘোষাল ছিলেন না, তাঁর কম্পাউণ্ডারই ডেকে নিয়ে গেল প্রতিমার কাছে।

প্রতিমা বসে বসে একটা পুরোনো খবরের কাগজ ছিঁড়ছিল। চোখের দৃষ্টি সামনের বিবর্ণ আকাশের দিকে। মুমূর্ষু মেঘের

কোল ঘেঁষে শকুন উড়ছে যেখানে। কিরণকে সে দেখতেও পেলো না।

'প্রতিমা, তুমি কি জাগবে না, তুমি কি কিছুতেই জাগবে না?' একটা অদ্ভুত রুদ্ধ আবেগ থরথর করতে লাগল কিরণের গলার শিরায়ঃ 'তা হলে যে জীবনের অনেক জট একসঙ্গে খুলে যায়।'

প্রতিমা জবাব দিল না। সে মুমূর্ষু মেঘ, উড়ন্ত শকুন আর কয়েকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় তার চেতনা এখনো একাকার।

॥ সতেরো ॥

অতএব, গায়ত্রীর সঙ্গে আবার একদিন গুরুদেবের সাথে দেখা করতে গেলেন শর্মিলা। অনেক আলোচনা শুনলেন তাঁর কাছে।

দেখলেন, মানুষটি পণ্ডিত। ইংরেজি জানেন, কোরাণ পড়েছেন, বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলেন। শেষে বললেন, আসল কথাই হল মন। সেইখানেই অযোধ্যা, সেইখানেই রামের অধিষ্ঠান। লঙ্কাকাণ্ড তো আর কিছুই নয়, নিজের প্রবৃত্তিগুলোর সঙ্গে শুভ-শক্তির সংগ্রাম। আত্মস্থ হয়ে, সদাচারী হয়ে, প্রাণের ভেতরে এই রামকে জাগিয়ে তোলো—'ব্যস, সব ঠিক হো জায়েগা।'

সেদিন অনেক ভক্ত আর উৎসবের সমারোহের ভেতরে গুরুদেবকে অনেকখানি কৃত্রিম বলে মনে হয়েছিল—যেন মানুষকে বশীভূত করার জন্যে রঙ্গমঞ্চের মতো একটা দৃশ্যপট আর পরিবেশ ইচ্ছে করে গড়ে তোলা হয়েছিল। আজ সহজ, স্বাভাবিক, বুদ্ধিমান এবং প্রসন্ন এই লোকটিকে শর্মিলার ভালো লাগল। ধর্মের সম্পর্কে শর্মিলার কৌতূহল বেশি নয়, সে আবহাওয়ায় তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন নি; কিন্তু একটি মানুষ নিজের দিক থেকে খাঁটি, চরিত্রে শক্তি আছে, ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথাটাই বলেন অথচ জোর

করে কারো ওপরে নিজেকে চাপিয়ে দিতে চান না—এই সততা আর ঔদার্যই শর্মিলাকে খুশি করল।

গায়ত্রীর চোখে অন্য দৃষ্টি। তিনি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এতদিন ধরে যে মানস-বৈরাগ্যের সাধনা করে প্রায় একটা নিস্পৃহ উদাসীনতার জগতে পৌঁছে গিয়েছিলেন, শর্মিলা বুঝেছেন সেখানেও কোথায় একটা রন্ধ্ররেখা আছে গায়ত্রীর। আজ উপেক্ষা আর কৌতুক দিয়ে মিস্টার শর্মার আহ্বানকে তিনি যতই ঠেলে সরিয়ে দিন, বুকের মধ্যে নিশ্চয় টান পড়েছে তাঁর। আর সেইটেকে প্রাণপণে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যই তাঁর এত বেশি জোর দিয়ে অস্বীকৃতির পালা, এমনভাবে গুরুদেবের কাছে বারে বারে ছুটে ছুটে আসা, এমন করে মগ্ন হয়ে পুণ্যানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা।

গায়ত্রীর কতটা লাভ হয়েছে, শর্মিলা জানেন না। কিন্তু নিজে তিনি যেন একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিলেন। একসময় মনে হয়েছিল, যে অন্ধ জীবনবন্যা কূলে এসে ঘা দিয়েছে, তার কাছ থেকে পরিত্রাণের বুঝি কোনো পথ নেই কোথাও; শুধু রাঁচীতে এসে কেন, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে পালিয়ে গিয়েও তাঁর নিস্তার মিলবে না—পাহাড়ের চূড়োয় উঠে দাঁড়ালেও সেই বন্যা একটা টাইফুনের মতো মুঠি বাড়িয়ে তাঁকে সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এখন যেন দেখতে পাচ্ছেন—বন্যা বন্যাই, তার শক্তির একটা সীমা আছে; শুধু পাহাড়ের চূড়ো নয়—দূরে-দূরান্তেও খোঁজবার দরকার নেই—মনের ভেতরেই মাথা তুলে রয়েছে হিমালয়ের শিখর। কোনো সদ্‌গুরু যদি একবার সেই শিখর শীর্ষের পথ দেখিয়ে দেয় তা হলে আর ভাবনা থাকে না।

সেখানে কোলাহলহীন চিরকালের স্তব্ধতা; সেখানে বাতাসে দেবধূপের গন্ধ; সেখানে চোখের সামনে একটিমাত্র নক্ষত্রের মতো অমিতাভর স্মৃতি।

সুতরাং শর্মিলাই দিন দুই পরে গায়ত্রীকে বললেন, আজ একবার যাবেন গুরুদেবের কাছে?

গায়ত্রীকে অনুরোধ করবার দরকার ছিল না। তিনি তখনই তৈরি।

পথে যেতে যেতে গায়ত্রী বললেন, আচ্ছা, মিসেস রায়চৌধুরী—

শর্মিলা বাধা দিয়ে বললেন, একটু ছোট করে নাম ধরে বলুন না। শুনতে ভারি খারাপ লাগে কানে।

—আচ্ছা তবে শর্মিলাজী।

—আবার জী কেন?

গায়ত্রী শর্মিলার একখানা হাত নিজের মুঠোর ভেতরে টেনে নিলেন; তাই হবে, নাম ধরেই ডাকব। শর্মিলা!

—বলো বহিন।

—তোমার আমার তো একই দশা। তোমার স্বামী নেই, আমার থেকেও নেই। তোমারও কোনো দায় বইতে হয় না, আমারও কারও জন্যে ভাববার নেই। শুধু মিথ্যে এভাবে খেটে মরছি কেন?

শর্মিলা হাসলেন; কিন্তু গায়ত্রী, একটা কিছু নিয়ে তো আমাদের বাঁচতে হবে।

—ঠিক কথা। কিন্তু এমন করে বেঁচে লাভ কী? চলো—এসব পাট মিটিয়ে দিয়ে চলে যাই এখান থেকে।

শর্মিলা চমকে উঠলেন: কোথায় যাব?

—গুরুজীর আশ্রমে। সেবিকা হয়ে থাকব, আশ্রমের কাজকর্ম করব, সাধন-ভজন করব।

—ওঁর আশ্রমে মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থা আছে?

—আছে।—একটা নতুন উৎসাহে গায়ত্রীর চোখ জ্বলে উঠল: জানো, অনেকবার মনে মনে কথাটা আমি ভেবেছি। কিন্তু কেমন একটা অভ্যাসের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছি। তা ছাড়া গুরুদেবের

কাছে কথাটা বলতেও যেন কেমন সংকোচ লাগে। তুমি যদি রাজী হও, তা হলে বলে দেখতে পারি। মনে হয় অনুমতি দেবেন।

—কিন্তু আমি তো তোমার মতো তৈরি হতে পারি নি, গায়ত্রী।

—বহিন, তৈরি হওয়া কি এত সহজ? আমিই কি পেরেছি? সারা জীবনেও কেউ কি পারে? তবু চেষ্টা করতে হয়।

শর্মিলা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ভেবে দেখব।

—ভেবে তো দেখতেই হবে। আমারও কি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হয়েছে?—গায়ত্রী একটা নিঃশ্বাস ফেললেন: সত্যের 'কষৌটি'তে বিশ্বাসকে যাচাই করতে যাই, কই এখনো তো সোনার দাগ পড়ল না। তাই মধ্যে মধ্যে বড়ো খারাপ লাগে। ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণপণে আত্মস্থ হই একবার।

শর্মিলা চুপ করেই রইলেন, বিষণ্ণ ক্লান্ত মুখে কী ভাবতে লাগলেন গায়ত্রী। পুরুলিয়া রোডের ওপর গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়া খেলে বেড়াতে লাগল। একটা রাধাচূড়ার গাছে অজস্র ফুল ধরেছে, সেই দিকে চোখ পড়তেই শর্মিলার মন চলে গেল মহাকাল পাহাড়ের চূড়োর ওপর; গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুল, বাতাসে কষায় গন্ধ, একটা ঝর্ণার কলধ্বনি—হাজার প্রজাপতি—

চকিত হয়ে উঠলেন শর্মিলা।

—তোমার কাছে রামচরিত মানস আছে গায়ত্রী?

—আছে। পড়বে?

—আমার হিন্দীর বিদ্যেতে তুলসী-দাস পড়া চলবে না বহিন। 'অওধী' আমি বুঝতে পারব না। তুমি পড়াবে আমাকে?

গায়ত্রী খুশি হয়ে বললেন, নিশ্চয় পড়াব। চমৎকার বই, শর্মিলা! আমার বাবা অত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজির ছাত্রী হলেও ছেলেবেলা থেকে ধর্মশাস্ত্রই আমি পড়ে আসছি। কিন্তু 'রামচরিত মানসের' মতো বই আর দেখি নি, ওর প্রত্যেকটা

লাইন যেন ভক্তি আর বিশ্বাসের চন্দন দিয়ে মাখা। এত শান্তি, এত আনন্দ আর কোনো বই থেকে পাওয়া যায় না।

রিক্সাটা বাড়ির সামনে এসে থামল।

ভেতরে পা দিতেই মনে হল, বাড়ির সে আবহাওয়াটা যেন নেই। কোথায় কী ফাঁকা হয়ে গেছে, গুরুদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সেই চেনা মুখগুলোও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই চাকরটা খবর দিল: গুরুদেব এখানে নেই।

গায়ত্রী আশ্চর্য হয়ে বললেন, কিন্তু তাঁর তো আরো ক'দিন থাকবার কথা ছিল।

চাকরটা বললে, হঠাৎ কাল সকালে এক শিষ্যের টেলিগ্রাম এসেছিল এলাহাবাদ থেকে। তারপরে ট্রাঙ্ক-টেলিফোন। শিষ্য মৃত্যুশয্যায়। পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে তিনি একবার গুরুদেবের চরণ দর্শন করতে চান, শেষবার তাঁর মুখে শুনতে চান রামকথা। তাই গুরুদেব আর থাকতে পারলেন না, কাল রাতেই রওনা হয়ে গেছেন এলাহাবাদে।

—এলাহাবাদ? এলাহাবাদের শিষ্য? —গায়ত্রী একবার ভুরু কোঁচকালেন: মহেন্দ্রপ্রসাদ বর্মা?

—জী হাঁ। ওই নামটাই যেন শুনেছিলুম।

—গুরুজীর একজন প্রধান ভক্ত। —স্বগতোক্তির মতো গায়ত্রী বললেন, অনেক টাকা দিয়েছিলেন আশ্রমের মন্দিরের জন্যে। বর্মাজীও চললেন তা হলে।

'জাই জীওন আঁজুলিকে পানি'—

চাকরটা গায়ত্রীকে ভালো করেই চিনত। বললে, আইয়ে, অন্দর আইয়ে। বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।

অন্যমনস্কভাবে গায়ত্রী বললেন, আজ থাক, আর একদিন আসব। চলো শর্মিলা।

নিরাশ, ভারী মন নিয়ে দুজনেই গেটের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

শর্মিলা ভাবছিলেন, মিথ্যেই সকালে এতটা পথ এলেন, কোনো কাজ হল না ; এর চাইতে বটানির সেই টেক্সট্ বইটা লেখার চেষ্টার করলে লাভ ছিল। আর গায়ত্রী বোধহয় ভাবছিলেন, এই জীবন। এমনি করেই মৃত্যু আসে।

'ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়াল বজাওয়ি,—আমরা শুনেও শুনতে পাই না।

গেটের বাইরে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েছেন, প্রায় পাশেই একটা ট্যাক্সি থামল। মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে, হাঁটু পর্যন্ত শাদা পাঞ্জাবী আর ঢোলা পায়জামা পরা বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক। বয়েস ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়, বেঁটে ধরণের বলিষ্ঠ চেহারা, চওড়া কপালে আর ওল্টানো চুলে বুদ্ধির একটা সহজ উজ্জ্বলতা।

ভদ্রলোক হেসে নমস্কার করলেন গায়ত্রীকে।

—এই যে প্রফেসার শর্মা!

—নমস্তে ডক্টর ভৌমিক!

—আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

ম্লানভাবে গায়ত্রী হাসলেন : হাঁ। কিন্তু গুরুজী চলে গেছেন. দেখা হল না।

—তাই বলে ধুলো পায়ে ফিরে যাবেন—তাও কি হয়? চলুন—চা না খাইয়ে ছাড়ব না।—ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ডক্টর ভৌমিক বললেন, গুরুদেব না-ই রইলেন, আমরা দু-চারজন তো আছি, আমাদেরও একেবারে ভুলে যাবেন না।

গায়ত্রী যেন একটু দ্বিধায় পড়লেন। তারপর হঠাৎ শর্মিলার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল।

—ডক্টর ভৌমিক, ইনি আমার কলিগ মিসেস রায়চৌধুরী। আপনার সাবজেক্টই পড়ান। আর শর্মিলা, ইনি ভৌমকজীর বড় ছেলে ডক্টর প্রভাকর ভৌমিক—বটানির ডক্টরেট, বিহার গভর্নমেন্টের ফরেস্ট রিসার্চে আছেন।

প্রভাকর বললেন, নমস্কার—নমস্কার। আপনিও বটানির লোক? তা হলে মিসেস শর্মা, ওঁর অনারেও একটু বসে যাওয়া উচিত আপনাদের।

শর্মিলা লক্ষ্য করলেন, গায়ত্রী তবুও যেন সহজ হতে পারছেন না, কোথায় কী একটা তাঁর বাধছে। বললেন, আজ তা হলে থাক ডক্টর ভৌমিক, আমরা বরং আর একদিন—

গায়ত্রী অনুভব করলেন, কেমন যেন অসৌজন্য ঘটছে তাঁদের দিক থেকে। জোর করে হাসলেন একটু।

বললেন, আপনার সেই স্পেশ্যাল লেমন-টী যদি খাওয়ান, তা হলে বসতে রাজী আছি কিছুক্ষণ।

—ওহো, লেমন-টী! হা হা করে হাসলেন প্রভাকর: দেন ইউ হ্যাভ চেঞ্জড্ ইয়োর টেস্টস এ বিট? সেবার কিন্তু খেয়ে একদম খুশি হননি।

—কী করে বুঝলেন খুশি হই নি?

—আপনার মুখ দেখে।

—আপনার অনুমান যে সত্যি নয়, সেটা প্রমাণ করব। চলুন।

সুতরাং আবার ফিরতে হল দুজনকে।

বাড়ির কর্তা তখন একদল মক্কেল আর একরাশ নথিপত্র নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সাত-আটদিন ধরে গুরুর সেবা নিয়ে বিব্রত ছিলেন, এখন স্তূপাকার কাজের নীচে চাপা পড়েছেন। সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।

—আসুন, আসুন। গুরুদেব কাল হঠাৎ—

গায়ত্রী বললেন, শুনেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, কাজ করুন। আমরা ডক্টর ভৌমিকের সঙ্গে গল্প করব।

—আচ্ছা—আচ্ছা—কিছু মনে করবেন না—আমি কয়েকটা জরুরি কেস—খোকা, এঁদের একটু চা-টা—

খোকা অর্থাৎ প্রভাকর বললেন, সব হবে বাবা, তুমি ভেবো না।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার ফাইলের স্তূপে বিলীন হলেন ভদ্রলোক।

টানা বারান্দার ডান দিকে উকিল বাবুর ঘর, বাঁয়ে ড্রয়িংরুম। মাঝখানে বড়ো হলটা খালি, শুধু কয়েকটা ফরাস পড়ে আছে এখনো। সাজানো রয়েছে গুরুদেবের বেদীটা। সেদিকে তাকিয়ে গায়ত্রী নিঃশ্বাস ফেললেন।

ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকলেন তিনজনে। প্রভাকর বললেন, বসুন এক মিনিট, চায়ের কথা বলে আমি এখুনি আসছি।

সাজানো বসবার ঘর, যেমন হতে হয়। কিন্তু সোফায় বসতে গিয়েও শর্মিলা অন্যদিকে আকৃষ্ট হলেন। কাচের সারি সারি জানালার পাশে নানারকমের পাত্রে বিচিত্রবর্ণ পাথরের টুকরোর ওপর বিভিন্ন জাতের ক্যাক্‌টাস সাজানো। তাদের একটিতে কমলারঙের একটি ফুল দীর্ঘ বৃন্তের ওপর শিখার মতো ফুটে উঠেছে।

ক্যাক্‌টাস! তাঁর নেশা। সঙ্গে সঙ্গে ফুলগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন শর্মিলা।

গায়ত্রী বসে পড়েছিলেন। হেসে বললেন, বটানিকাল ইণ্টারেস্ট?

শর্মিলা বললেন, হাঁ। কয়েকটা রেয়ার স্পেসিমেন দেখছি ক্যাক্‌টাসের। বাড়িতে যে বটানিস্ট আছেন, সে বুঝতে পারা যায়।

একটু পরেই ফিরে এলেন প্রভাকর।

—কী দেখছেন? ক্যাক্‌টাস?

শর্মিলা প্রভাকরের দিকে তাকালেন: কয়েকটা একেবারে নতুন ধরণের। দুএকটার ছবি যেন কাগজে দেখছি মনে হচ্ছে, কিন্তু—

প্রভাকর হাসলেন: এখানকার নয়, বাইরে থেকে আনানো।

তবে মরুভূমির মাটিতে রোদে আর শীতে যে-ভাবে আনন্দে বাড়তে পারত, এখানে আর সে সুযোগ কোথায় পাবে। জাপানী 'বোন-সাই'য়ের মতো অস্তিত্ব রক্ষা করে টিকে আছে—এই—যা।—প্রভাকর একটা পোর্সিলেন ভাসের দিকে আঙুল বাড়ালেন: এই যে একে দেখেছেন—লম্বা একটা ল্যাটিন নাম উচ্চারণ করে বললেন দশ-বারো ফুট পর্যন্ত ওঠে। তাহার মাথার ওপর তুলে ধরে আরো দশফুট একটা স্টক—তার মাথায় ছাতার মতো ফুল ধরে—কী তার রঙ। এদেশেও দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে এর একটা গ্রুপ দেখা যায়, কিন্তু এর সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

শর্মিলা বললেন, আমার অদ্ভুত লাগে এদের।

প্রভাকর মাথা নাড়লেন: অদ্ভুতই বটে। বাইরে রুক্ষ নিষ্ঠুর কাঁটায় সশস্ত্র হয়ে রয়েছে, মরা মাটিতে যেখানে একফোঁটা জল মেলে না—আশ্চর্য শক্তিতে সেখানেও প্রাণ সংগ্রহ করছে। মানুষের শুকনো পাঁজরা রোদে শুকিয়ে আছে, আর সেখানে কয়েকটা ক্যাক্‌টাস দাঁড়িয়ে—এই হল মৃত্যুর ছবি। কিন্তু হঠাৎ একদিন ওদের বুক চিরে যখন উজ্জ্বল রঙের একটা ফুল ফুটে ওঠে—তখন বোঝা যায়, আসলে এতদিন দুঃখের তপস্যা করছিল, এইবারে সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। তখন চেনা যায়, ওরা মৃত্যুর প্রহরী নয়, মরণের ভেতরে জীবনের তপস্যা করছে!

শর্মিলা বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি সাহিত্যচর্চা করেন নাকি ডক্টর ভৌমিক?

—ক্ষেপেছেন। ও-সব রোগ আসে ইন্‌ডাইজেশন আর ইন্‌সোমনিয়া থেকে। ক্যাক্‌টাস আমার প্রিয় জিনিস, তাই তাকে নিয়ে একটু কাব্য করে ফেললুম। কিন্তু দোহাই আপনার, এ থেকে আমার সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন না।

শর্মিলা বললেন, কিছু মনে করবেন না, আমিও ক্যাক্‌টাস নিয়ে একটা পেপার তৈরি করবার কথা ভাবছি কিছুদিন

থেকে। আপনার কি কোনো হেল্প পেতে পারি না ডক্টর ভৌমিক?

—তার মানে এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাবে?—প্রভাকর হেসে উঠলেন: না, ওটা অন্যায় বলা হল, আপনাকে অন্ধ বলব আমি কোন্ সাহসে?

—ঠাট্টা নয়।—শর্মিলা গম্ভীর হলেন: আমি সত্যিই আপনার সাহায্য চাইছি।

—আমি কী সাহায্য করব—কী জানি? তবে বিত্তের ফাঁকিটা ধরে ফেলবার জন্যে সত্যিই যদি আপনার কৌতূহল হয়ে থাকে, আপনাকে সে সুযোগ দিতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু আমি তো পাটনায় পোস্টেড্—মাঝে মাঝে আসি এখানে।

—তখন এসে ধরব আপনাকে। পাটনা পর্যন্তও তাড়া করতে পারি—সেটা কিছু অসাধ্য হবে না।

এবার গলা-খাঁকারি দিলেন গায়ত্রী।

—ডক্টর ভৌমিক, লেমন-টী খাওয়ানোর কথা ছিল—আমাকে চুপ-চাপ বসিয়ে রেখে বটানিক্যাল ডিস্কাশন নয়।

শর্মিলা আর প্রভাকর দুজনেই লজ্জা পেলেন। এতক্ষণ যেন গায়ত্রীর অস্তিত্বের কথাও তাঁদের খেয়ালই ছিল না।

প্রভাকর জিভ কেটে বললেন, সরি মিসেস শর্মা, এক্স্ট্রিমলি সরি। আন-কন্ডিশন্যাল অ্যাপলজী চাইছি। একজন দলের লোক পেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলুম। নো মোর ক্যাক্টাস—আসুন মিসেস রায়চৌধুরী, বসা যাক।

মৃদু স্বরে শর্মিলা বললেন, আমার নাম শর্মিলা।

প্রভাকর বললেন, রবীন্দ্রনাথের একটা উপন্যাসে নামটা পেয়েছিলুম মনে হচ্ছে—আই লাইক্ ইট। আসুন শর্মিলা দেবী। মিসেস শর্মা—হিয়ার ইজ্ ইয়োর লেমন-টী।

চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছিল চাকরটা।

তারপর চা খাওয়া, এলোমেলো গল্প, সাঁওতাল পরগণা—হাজারীবাগ—গয়া ডিস্ট্রিক্টের বন-বাদাড়ের কাহিনী। বিহারের বনভূমি যে কত সমৃদ্ধ, এ নিয়ে প্রভাকরের আক্ষেপ, তার সঙ্গে গায়ত্রীর সৌজন্যের খাতিরে সায় দিয়ে চলা।

এবার চুপ করে বসে রইলেন শর্মিলাই। কমলারঙের একটা ঝুমকোর মতো ক্যাক্টাসের মঞ্জরীটি হাওয়ায় দুলছে। ঠিক যেন কৃষ্ণচূড়ার রং। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া রাশি রাশি ফোটে, রাশি রাশি ঝরে, আর ক্যাক্টাসের একটিমাত্র ফুল ফোটানোর জন্যে অপেক্ষা করতে হয় দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর। সে শুধু ফুল নয়, মৃত্যুর বুকে জীবনের তপস্যা।

ফেরবার সময় গায়ত্রী বললেন, ডক্টর ভৌমিককে কেমন দেখলে?

শর্মিলা খুশি মনে বললেন, বেশ। খুব পণ্ডিত লোক।

—পণ্ডিত লোক নিশ্চয়। বাইরের ডিগ্রী আছে, পাটনা ইউনিভার্সিটির নামকরা স্টুডেন্ট। কিন্তু—গায়ত্রী থামলেন।

—কিন্তু কেন?—শর্মিলা কৌতূহলী হলেন।

—লোকটা বড্ড বেশি মেটিরিয়ালিস্ট।

শর্মিলা বললেন, সায়েন্সের লোক, হওয়াই তো স্বাভাবিক।

—তা জানি। কিন্তু ডক্টর ভৌমিক দস্তুরতো অ্যাগ্রেসিভ। এই জন্যে বাপের সঙ্গেও ওঁর সব সময় বনে না।

—তাই নাকি?

গায়ত্রীর মুখে ছায়া পড়ল; আচ্ছা, আমরা তো গুরুদেবের কাছে দু'দিন এলুম। এর মধ্যে প্রভাকরজীকে একদিনও দেখেছ তুমি?

শর্মিলা স্বীকার করলেন, না দেখেন নি।

—অথচ, এইখানেই উনি ছিলেন। প্রভাকরজী ধর্ম বিশ্বাস করেন না—ঈশ্বর মানেন না। তিনি বলেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা

করার অর্থই হল, কতগুলো অকর্মা লোককে প্রশ্রয় দেওয়া। এরা হচ্ছে একদল সোশ্যাল প্যারাসাইট, যাদের কাজ হল মানুষের ঘাড়ে বসে খাওয়া আর লোকের বোকামোর সুযোগ নিয়ে তার মনকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে ঠেলে দেওয়া।

গায়ত্রীর ক্ষোভের অর্থটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল শর্মিলার কাছে।

গায়ত্রী বললেন, এই নিয়েই ভৌমিকজীর সঙ্গে প্রভাকরজীর গোলমাল। ভৌমিকজী রাগ করে বলেছেন, সব সম্পত্তি তিনি গুরুদেবের নামে লিখে দেবেন—যদি প্রভাকরজী তাঁর কাছে দীক্ষা না নেন। প্রভাকরজী বলেছেন, সম্পত্তির চাইতেও সত্যকে তিনি দামী বলে মনে করেন।

শর্মিলা চুপ করেই রইলেন। গায়ত্রী বললেন, সত্যের অহঙ্কার। কিন্তু, সত্য কোথায় আছে—কে তার সন্ধান জানে! প্রভাকরজীর ভুলও একদিন ভাঙবে। বুঝবেন, এ-সব সায়েন্স-ল্যাবরেটরী কত মিথ্যে—মানুষ এ-সমস্ত দিয়ে কোনোদিন শান্তি পাবে না।

শর্মিলা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে ওঁর প্রায়ই তর্ক হয় —না?

—তর্ক করে কী করব? আমরা তো পৃথিবীর দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছি দুজনে। বরং প্রভাকরজী মাঝে মাঝে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, আমি চুপ করে শুনি।

—এই সমস্ত নাস্তিকের থিয়োরী শুনতে খারাপ লাগে না তোমার?

গায়ত্রী হাসলেন। বললেন, রহীম খান খানানজী কি বলেছেন, জানো?

'জো রহীম উত্তম প্রকৃতি কা করি
সকত কুসঙ্গ,
চন্দন বিষ ব্যাপত নঁহি লপটে
রহত ভুজঙ্গ—

শর্মিলা আস্তে আস্তে বললেন, তা ঠিক।

মেসে ফিরে অনেক দিন পরে যেন আবার আত্মস্থ হলেন শর্মিলা। প্রভাকর নাস্তিক, ধর্মকর্ম কিছুই মানেন না, সাধু-মহান্তদের ওপর তাঁর একটা সহজাত বিদ্বেষ আছে। এ নিয়ে গায়ত্রী রাগ করতে পারেন, কিন্তু শর্মিলা কেন অনুযোগ করতে যাবেন? তাঁরও তো ভক্তি-বিশ্বাস কিছুই নেই। তিনি মনের কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, যে কৃষ্ণচূড়া তাঁর বুকের রক্তে বন্যার ডাক পাঠিয়েছে—যা কোনোমতেই তাঁকে স্থির হতে দিচ্ছে না, তার সেই মোহগ্রাস থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিলেন তিনি। গুরুদেবের বদলে প্রভাকর যদি তা দিতে পারেন, কোনো নালিশ নেই শর্মিলার।

প্রভাকরের সত্যিকার পড়াশুনো আছে। তাঁরও বিশেষ অনুরাগ রয়েছে ক্যাকটাস সম্পর্কে। প্রভাকর বলেছেন, সময় সুযোগ করে একবার বেরিয়ে পড়ুন আমার সঙ্গে—ঘুরবেন বনে-জঙ্গলে, সত্যিকারের অভিজ্ঞতা হবে। বইয়ের ছবি আর ছাত্রীদের নিয়ে দুটো-একটা সৌখীন এক্সকার্শন—ওতে কি আর কাজ হয়।

অবশ্য বনে-জঙ্গলে ঘোরবার সুযোগ শর্মিলার কখনো হবে না। কিন্তু প্রভাকর যেন কাজ করবার একটা নতুন প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভেতরে। কিসের জন্যে নিজের ভেতর অনর্থক জটিলতার জাল বুনছেন তিনি? এবার থেকে কাজের ভেতরে ডুবে যাবেন, বইটা শেষ করবেন, তারপর হাত দেবেন তাঁর থীসিসের কাজে। প্রভাকর তাঁকে সাহায্য করবেন, কথা দিয়েছেন।

সন্ধ্যায় শর্মিলা লেখা নিয়ে বসলেন। একটানা লিখে গেলেন প্রায় দশটা পর্যন্ত। অনেক দিন পরে যেন তিনি সহজ আর স্বাভাবিক হতে পেরেছেন।

তবু রাতে ঘুমোবার আগে আবার কোথা থেকে পাহাড়ী নদীর

ধারে সেই আরক্তিম বিকেলটি ফিরে এল। সেই মানুষটির ছায়া পড়েছে লাল আলোর মাঝখানে। বলছে—

শর্মিলা চোখ বুজলেন প্রাণপণে। দু' হাতে কান চেপে ধরলেন। দেখবেন না, শুনবেন না, ভাববেন না। কৃষ্ণচূড়ার ফুল-ঝরার দিন শেষ হয়ে গেছে, এবারে ক্যাকটাসের পালা।

এক সাহিত্যিক বন্ধুর অসুখ। চিঠি লিখেছে, 'হয়তো আমি আর বাঁচব না। পারো তো একবার দেখে যেয়ো।'

চিঠিটা পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল কিরণের। বাংলা দেশের দুর্ভাগা লেখক একজন। বাজারে প্রায় বিশখানা বই আছে, কিন্তু জনপ্রিয়তা নেই। লেখাই একমাত্র উপজীবিকা, আর সংসারটিও ছোট নয়।

বয়েসে ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো, পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কিন্তু দেখলে পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োর মতো মনে হয়। ক্রনিক অসুখে জরাজীর্ণ। শুকনো চোয়াল ভাঙা মুখে তীক্ষ্ণ ঘৃণার হাসি ফুটে থাকে, চোখ দুটো কোটরের ভেতরে আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে।

—সেক্সের সুড়সুড়ি আর ক্রাইমমার্কা প্লট ছাড়া পপুলার হওয়া যায় না এদেশে। আমি পপুলার হতে পারব না—অতটা নীচে নামবার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই। তার চেয়ে বরং না খেয়ে মরব।

না খেয়েই মরছে।

পত্র-পত্রিকার বাজারে তার চাহিদা কম, তিন বছরে বইয়ের সংস্করণ হয় না। তাকে দেখলেই প্রকাশকের মুখের রং বদলায়। এদিকে পাঁচ-ছটি ছেলে মেয়ে, বড়ো ছেলেটা দু-দুবার স্কুল ফাইনাল ফেল করেছে। লোকটা মরছে।

কিরণ সেই টালীর ঘরে অপরিচ্ছন্ন শয্যায় দেখল তাকে। দড়িতে ময়লা জামা-কাপড়। একটা টুলের ওপর কতগুলো ওষুধের শিশি। একটা মাটির ভাঁড়ে থুথু আর ছাই। এক ফালি বারান্দায় কয়েকটা ছেলে-মেয়ের কান্নাকাটি। সেলাই করা কাপড় পরা স্ত্রী, হাতে ছু' গাছা শাঁখা ছাড়া কোনো আভরণ নেই।

আর কেমন একটা অদ্ভুত চিমসে গন্ধ চারদিকে। ব্যাধির গন্ধ।

—কিরণ, আমি আর বাঁচব না।

—কী বকছ দাদা পাগলের মতো? মরবার কী হয়েছে এখুনি। তোমার তো এ ক্রনিক অসুখ—ছু'চার দিন ভুগেই আবার উঠে দাঁড়াবে।

—উঠে কোথায় দাঁড়াব? আমি তো তোদের মতো পপুলার রাইটার নই। আবার উঞ্ছবৃত্তি—আবার তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো পাবলিশারের দোরে দোরে ঘোরা। তার চাইতে একেবারে ছুটি পেলেই বেঁচে যাই।

কিরণ রাগ করল।

—এ সব তুমি কী বলছ স্বার্থপরের মতো? স্ত্রী, ছেলেমেয়ে—এরা কোথায় যাবে?

—কোথায় যাবে? কেন, ভিক্ষে করতে। জানিস তো, আমিও বাঙাল। রিফিউজীর বউ, ছেলেমেয়ের ভিক্ষেয় কোনো লজ্জা নেই। আর থাকবার ভাবনা? শেয়ালদার সাউথ স্টেশন আছে কী করতে? দেখেছিস তো, মানুষ মরা গরুর মতো কি ভাবে গাদাগাদি করে পড়ে থাকে ওখানে?

—তুমি থামো দাদা। বৌদি কী ভাবছেন বলো তো?

—কী আবার ভাববে? ওর পরিণাম ও জানে। শুধু ছুঃখ কী জানিস? সাহিত্যকে বড্ড বেশি ভালোবেসেছিলুম ছেলেবেলা থেকে। টাকা চাই নি—কিন্তু লেখাগুলোর যদি সত্যিকারের

বিচার হত, তা হলেও খানিকটা সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারতুম। কিন্তু দলের মুখ চেয়ে যেখানে বুক-রিভিউর রেওয়াজ—সেখানে আমাকে কেউ বুঝতে পর্যন্ত চেষ্টা করল না।

অনেকখানিই অভিমানের কথা—অভিযোগের সবটা সত্যি নয়। অভাবের তাড়ায় বইয়ের পর বই লিখে লেখক শুধু শক্তির অপচয়ই করছেন, কোথাও সম্পূর্ণ দানা বেঁধে ওঠে নি তাঁর সাহিত্য—এই অপ্রিয় আলোচনা করবার সময় এ নয়। কিরণ বললে, সময় এখনো যায় নি দাদা, একটু ধৈর্য ধরো।

—সময় হয়তো আসবে। কিন্তু আমি মরে যাওয়ার পর। তখন তোরা ঘটা করে শোকসভা করবি, প্রবন্ধ লিখবি আমাকে নিয়ে—নিচের ছাইঢাকা পিকদানিতে খানিক থুথু ফেলে দাদা বললে, হয়তো আমার বইয়ের বিক্রিও শোকের ধাক্কায় মাস কয়েক ভালোই চলবে। কিন্তু আমাব কী লাভ বলতে পারিস?

কিরণ বিরক্ত হয়ে বললে, বকুনি যদি না থামাও, আমি উঠে যাব এখান থেকে।

—যাবি বইকি। রোগীর ঘরে বেশিক্ষণ বসতে নেই, শরীর-মন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তোকে ডেকেছি অন্য কারণে। তুই সেই হাঙর-মার্কা ঘোষকে বলিস, যেন অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমাকে অ্যাডভান্স করে—হয়তো এর পরে ওর কাছে কিছুই আমার আর চাইবার দরকার হবে না। আর তোর পকেটে যদি কিছু থাকে তো দিয়ে যা—পাঁচ দশ যা হয়। আজ ঘরে চাল ছিল না—এদের কিছু জোটে নি।

কুড়িটা টাকা সঙ্গে ছিল, দিয়ে কিরণ রাস্তায় বেরুল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা তলিয়ে আছে। এই মানুষটা তাদের সকলের আয়নার মতো। এখনো তার বাজার আছে, বই কিছু কিছু চলে, এখনো ঠিক ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে তাকে প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয় না। কিন্তু যেদিন তার বাজার থাকবে না, নতুন

জনপ্রিয় লেখকদের আড়ালে হারিয়ে যাবে, সেদিন এই পরিণাম তারও ঘনিয়ে আসবে। এমনিতেই সে হট্‌কেক-সেলার নয়, সেদিন —সেই দুঃসময়ে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, হয়তো রাজেনবাবুও তাকে চিনতে পারবেন না।

কলকাতার উদ্বাস্তু উপনগর—এক সময়ে মাঠ আর জলায় একাকার ছিল। এখন টালির ঘর থেকে তেতলা পর্যন্ত ছাড়া ছাড়া বাড়ি। কাঁকরের রাস্তা অসমতল, অন্যমনস্ক হয়ে চললে হোঁচট লাগে। পাথরের ধারে দুর্গন্ধ কাঁচা ড্রেন—প্রায় আধ মাইল দূরে সবে-ধন বাসটির স্টপেজ। কিরণ এগিয়ে চলল সেইদিকে।

আকাশের পশ্চিমে মেঘ ঘনাচ্ছিল, নজরেই আসে নি এতক্ষণ। হটাৎ বিকেলের সব আলো যেন কার একটা ফুঁয়ে নিবে গেল, কিরণ চমকে চেয়ে দেখল মাথার ওপর অন্ধকারের একটা কালো পর্দা টানা হয়ে গেছে। তারপর বিদ্যুতের ভ্রূকুটি বজ্রের ধমক আর ঝড়ের হাওয়া।

একমুঠো ধুলো আর কাঁকর উড়ে এল মুখের ওপর। বৃষ্টি নামল।

কিরণ ছুটল। দূরে একটা মুদির দোকান দেখা যায়। ওর ঝাঁপের তলায় গিয়ে হয়তো দাঁড়ানো যেতে পারে আপাতত। ছুটল সেই দিকে।

—কিরণদা—কিরণদা!

ঝড় আর বৃষ্টির শব্দের ভেতরে যেন দৈববাণী শুনল কিরণ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

পাশেই বাগানওয়ালা একটা একতালা বাড়ি। তারই বারান্দা থেকে কে যেন ডেকে চলেছে : কিরণদা, এদিকে—এদিকে—চলে আসুন এখানে—

গলার স্বরটা চেনা চেনা ঠেকল, কিন্তু তখন আর ভাববার সময় নেই। বৃষ্টির ছাটে আর ধুলোয় চশমার কাচ ঝাপসা। যেই ডাকুক—আশ্রয় পাওয়াটাই এখন বড়ো কথা। আর চিনেই যখন

ডেকেছে, তখন শুধু আশ্রয় নয়, এক পেয়ালা চা-ও হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

কাঠের গেট ঠেলে সে ঢুকে পড়ল। বাগানে শিউলি, চাঁপা আর চন্দ্রমল্লিকার গাছ। ঝড়ের ধাক্কায় আর বৃষ্টির ঘায়ে কনক-চাঁপার পাপড়ি ঝরছে। বারান্দায় দাঁড়ানো ছেলেটি ব্যাকুল হয়ে বললে, ইস, এর মধ্যেই যে প্রায় ভিজে গেছেন। আসুন—আসুন, ঘরে বসবেন।

চশমার কাচ না মুছেও কিরণ চিনতে পারল এবার। ছেলেটি বাণীব্রত। বাণীব্রত চট্টোপাধ্যায়।

॥ আঠার ॥

ধুলোর ঝড় শেষ হয়ে গিয়ে বাইরে বৃষ্টি নামল। মেঘের অন্ধকার আর আকাশভাঙা বৃষ্টিতে বাড়িটার চারদিকের পৃথিবীটা যেন লুপ্ত হয়ে গেল আপাতত। ঠিক সময় মতোই কিরণকে ডাক দিয়েছিল বাণীব্রত, নইলে মুদীর দোকানটা পর্যন্ত পৌঁছতে জামা-কাপড়ের কিছু আর অবশিষ্ট থাকত না।

বাণীব্রত বললে, আসুন কিরণদা, এঘরে আসুন।

এইটেই নিশ্চয় বাণীব্রতর শোবার আর পড়বার ঘর। একটি ছোট চৌকি, বইয়ের শেলফ, লেখাপড়ার চেয়ারটেবিল, দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি; বইয়ের শেলফের খানিকটা অংশ জুড়ে অনেকগুলো পত্র-পত্রিকা। সামনের জানলার ধারে ফুলে ভরা একটা লবঙ্গ-লতিকা বৃষ্টিতে থর থর করে কাঁপছে—জলের ছাট আসছিল সেখান দিয়ে—বাণীব্রত জানালাটা বন্ধ করে দিলে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে লতাটা এসে মাঝে মাঝে জানলার গায়ে আছড়ে পড়ছিল, কিরণের মনে হল যেন মাথা খুঁড়ছে।

ঘরে আবছা অন্ধকার। বাণীব্রত সুইচ টিপে আলো জ্বালল। খুশিতে মুখ-চোখ ঝক ঝক করছে তার।

—আপনি তাহলে সত্যিই এলেন আমাদের বাড়িতে।

—ইচ্ছে করে আসি নি। ঝড়-বৃষ্টিতেই টেনে আনল এখানে। আমি তো তোমাদের বাড়ি চিনতুম না।

বাণীব্রত অভিমান করে বললে, আমি তো অনেকবার ঠিকানা দিয়েছি আপনাকে। আপনি ভুলে গেছেন!

কিরণকে স্বীকার করতে হল। সত্যিই সে ঠিকানাটা ভুলে গিয়েছিল।

—বসুন কিরণদা—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?—চেয়ারটা পরিষ্কার করবার দরকার ছিল না, তবু একটা তোয়ালে দিয়ে সসম্ভ্রমে মুছে দিলে বাণীব্রত: বসুন। ভিজে গেছেন নাকি? শুকনো কাপড়-টাপড় এনে দেব?

কিরণ হেসে ফেলল: আমি বসছি, তার আগে তুমি স্থির হয়ে বোসো দেখি। শুকনো জামা-কাপড়ে দরকার নেই, বৃষ্টির দু'একটা ছিটে ছাড়া আমার গায়ে কিছু লাগে নি।

কিন্তু বাণীব্রত দাঁড়িয়েই রইল।

—ভাগ্যিস আমি বারান্দায় ছিলুম, তাই দেখতে পেলুম আপনাকে। এখানে কোথায় এসেছিলেন? ভবেশ মুখুজ্জের বাসায়?

—তুমি কী করে জানলে?

—বা রে, পাড়ায় রয়েছেন, লেখক—আপনার মতো লোক আর কার কাছেই বা আসবেন?

কিরণ কোমল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাণীব্রতর দিকে। নামজাদা লেখকরা তার কাছে প্রায় কল্প-জগতের অধিবাসী। বাণীব্রত বোধহয় ভাবে, লেখকেরা সব সময় উচ্চ চিন্তায় ব্যাপৃত, গভীর জীবনদর্শন ছাড়া আর কোন তুচ্ছ সাংসারিক ভাবনা তাদের কখনো পীড়ন করে না; তারা স্বপ্নে প্লট পায় এবং দাড়ি কামাতে কামাতে নায়িকার মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে। কিন্তু লেখকেরাও যে বাজারে ঝিঙের দর নিয়ে ঝগড়া করতে পারে, সাহিত্যচর্চার চাইতে

পরচর্চায় যে তাদের বেশি আনন্দ এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোমাণ্টিক কবিরও যে নাক ডাকে, এ-সব খবর জানলে বোধহয় এক মাস তার মন খারাপ হয়ে থাকবে।

বাণীব্রত বললে, বাবা-মা আজ দক্ষিণেশ্বরে মাসিমার বাড়িতে গেছেন—রাতে সেখানেই থাকবেন। বাবা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুব খুশি হতেন। বাবা হেড্ মাস্টার, অঙ্কের লোক, কিন্তু সাহিত্য খুব ভালোবাসেন। আপনি এমন দিনে এলেন, যে ওঁর সঙ্গে দেখাই হল না।

—তাতে কী হয়েছে, আর একদিন আসা যাবে।

—নিজে থেকে কি আর আসবেন আপনি? আমিই গিয়ে ধরে আনব। কিন্তু দাঁড়ান—দিদি বোধহয় রান্না করছে, ওকে ডাকি। আর চা করতে বলি আপনার জন্যে।

—চায়ের দরকার নেই আমার—ভদ্রতা করে বলতে গেল কিরণ, কিন্তু তার আগেই চটির জোরালো আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল বাণীব্রত। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়েও তার উল্লসিত ডাক শোনা গেল: দিদি—এই দিদি—

কিরণ বসে রইল চুপ করে। বৃষ্টি চলছে একভাবেই—কতক্ষণে যে থামবে বলা মুস্কিল। রাস্তাঘাটে জল দাঁড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, ফেরবার পথে অনেক দুর্ভোগ বইতে হবে তা হলে। টালীগঞ্জে একটু কাজ ছিল, সে বোধহয় হয়ে উঠবে না—ব্রীজের তলায় সমুদ্র দুলতে থাকবে। কিরণ অন্যমনস্ক চোখ মেলে দেখতে লাগল, বাইরে থেকে লবঙ্গলতার মঞ্জরী তেমনি করেই মাথা খুঁড়ে মরছে কাচের গায়ে। কেন কে জানে, অল্প বয়েসে পড়া 'উদারিং হাইটস' উপন্যাসটা ভেসে এল মনের সামনে।

বাণীব্রত ফিরে এল। বললে, দিদি এক্ষুণি আসছে।

—রান্না পুড়িয়ে তোমার দিদিকে আসতে হবে না—অত অভ্যর্থনার দরকার নেই।

—রান্না কিসের আর? আজ তো বাড়িতে আমি আর দিদি—চালে-ডালে স্রেফ খিচুড়ি। সে যখন খুশি হলেই হবে। আপনি খিচুড়ি খান কিরণদা?

কিরণ বললে, তুমি কি ভাবো, লেখকেরা হাওয়া খেয়ে থাকে?

—তা নয়—বাণীব্রত লজ্জা পেল। তারপর মাথা নামিয়ে বললে, ইয়ে, কিছু যদি মনে না করেন, খেয়ে যাবেন এখান থেকে?

কিরণ হাসল: নেমন্তন্নটা কা'র? তোমার, না কৃষ্ণার?

—দিদি তো চটেই উঠল। বললে, মাছ-টাছ কিছু নেই—খানিক চাল-ডাল সেদ্ধ করে দেব নাকি ভদ্রলোককে? আমি বললুম, তা কেন—আমরা যা খাই, তাই নয় একদিন—

—নেমন্তন্ন মনে রইল। কিন্তু আজ নয়।

—আপনার কখনো সময় হবে না—বাণীব্রতর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—সময় আমার নিশ্চয় হবে, আজ তোমার দিদিকে লজ্জা দিতে চাই না। তাকে সুযোগ দিয়েই আমি আসব। সে যাক। ভবেশদার সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ আছে তোমার?

বাণীব্রত একটু চুপ হয়ে রইল। আস্তে আস্তে বললে, কিছু মনে করবেন না কিরণদা, ভদ্রলোক যেন একটু—। মানে, কারো সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেন না। আমরা দু-একটা মিটিঙে ডাকতে গিয়েছিলুম, বলেছেন বক্তৃতা করা আমার পেশা নয়, অন্য লোক দেখো; দু-একবার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলুম, হাই তুলে বলেন, আচ্ছা এখন এসো তা হলে—আমি একটু ব্যস্ত আছি।

—ভবেশদা খুব অসুস্থ, তা জানো?

—আমরা কী করব, বলুন? বাড়িতে গেলে হয়তো দেখাই করবেন না—যা তা অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন।

ভবেশদা সিনিক হয়ে গেছে, কাউকে আর সহ্য করতে পারে

না। সাহিত্যিক জীবনের সব ব্যর্থতা আর দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্ব-সংসারকে অভিসম্পাত দিচ্ছে এখন। একটু আগেই নিজের চোখে তা দেখে এসেছে কিরণ। বাণীব্রতদের কোনো দোষ নেই—ভবেশদার সঙ্গে কারুর সদ্ভাব থাকবার কথা নয়।

কিরণ বললে, তবু তোমাদের উচিত চাঁদা করে ওঁকে কিছু সাহায্য করা। খুব কষ্টে আছেন।

—চাঁদা আমরা তুলতে পারি, কিন্তু উনি নেবেন ?

—তা নেবেন।

—আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে।

—গবর্ণমেন্ট থেকে বোধহয় শ' দেড়েক টাকা পেনশন পান। কিন্তু কিছুতেই কুলোয় না।

—কী জানেন কিরণদা, ওঁর বই পড়তে ভালো লাগে না। কেমন যেন শুকনো মনে হয়। ওঁর থিয়োরীগুলোই অদ্ভুত। মেয়েরা মাত্রেই চোর, পুরুষ মাত্রেই শয়তান আর মানুষ মাত্রেই এক-একটা ছদ্মবেশী খুনী—এ ধরণের পার্ভারশন বেশিক্ষণ ভালো লাগে কারুর ? এই জন্যেই ওঁর বই লোকে পড়তে চায় না।

—এক একজন এক একভাবে জীবনকে ব্যাখা করে, বাণীব্রত। তার মধ্যেও সত্য আছে।

—কিন্তু কিরণদা, এ তো আংশিক সত্য।

—সব সত্যই আংশিক বাণীব্রত, আপেক্ষিকও। সকলের সত্য, সম্পূর্ণ সত্যকে আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না। সেইখানেই তো দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ।

—সাহিত্য আলোচনা থেকে আমি বুঝি বাদ পড়ে গেলুম ?

ঘরে ঢুকল কৃষ্ণা। হাতে ট্রে। তাতে বেগুনী, ফুলুরি, চায়ের পেয়ালা।

বাণীব্রত শিউরে উঠল : ছি-ছি দিদি, তুই শেষে কিরণদাকে ফুলুরি—

এইবারে চোখ পাকিয়ে একটা ধমক দিলে কিরণ : তুমি থামো। এই বর্ষার সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে ফুলুরিই তো আইডিয়াল। থ্যাঙ্ক ইউ কৃষ্ণা—তোমার ফুলুরির ভাঁড়ার অক্ষয় হোক।

কৃষ্ণা হাসল, চা খাবার এগিয়ে দিলে সামনের টেবিলে। বললে, যা বৃষ্টি, এ ছাড়া আর—

—তুমিও।

—আচ্ছা থাক, বলব না।—কৃষ্ণা বাণীব্রতর পাশে তক্তা-পোষটিতে বসে পড়ল। কিরণ এবার চেয়ে দেখল তার দিকে। আজ এই বর্ষার সন্ধ্যায়, তার নিজের বাড়ির পরিবেশে, মেয়েটিকে আরো সহজ, আরো ধারালো বলে মনে হচ্ছে। তার কাছে ভাইবোন যেদিন গিয়েছিল, সেদিন কৃষ্ণার পরণে ভালো শাড়ি ছিল একখানা, একটুখানি প্রসাধন ছিল চোখে মুখে। আজ কোনো আতিশয্য কোথাও নেই। কালো রোগা একটি মেয়ে—দুটি চোখের ঐশ্বর্য নিয়ে সাধারণ বাঙালী সংসারের জীবনযাত্রার ভেতরে নিঃশেষে মিশে গেছে।

খেতে খেতে বাণীব্রত বললে, জানেন কিরণদা, দিদি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে।

—থাম তুই।

—বা-রে, লজ্জার কি আছে। এই যে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা দেখছেন না ? দিদিরই তো আঁকা।

—তাই নাকি ? ভালো করে খেয়াল করি নি তো।—কিরণ ছবিটার দিকে চেয়ে দেখল। হাতে আঁকা বলে চেনা গেল এতক্ষণে, কোণায় যেন ছোট একটা স্বাক্ষরও পাওয়া গেল।

—কিছু না—কিছু না—টুকটাক এই সব করেই সময় কাটে।—কৃষ্ণা প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইল : সাহিত্যের কথা বরং বলুন।

—সাহিত্যের কথা তো রোজই হয়, আজ বরং আর্টের

আলোচনাই হোক। বাণীব্রত, তোমার দিদির দু-একখানা ছবি নিয়ে এসো তো।

বাণীব্রত খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কৃষ্ণা তার হাত চেপে ধরল।

—এই খবর্দার। মারব কিন্তু।

—দেখছেন—যেতে দিচ্ছে না।

—আচ্ছা, পরে হবে—কিরণ হাসল: এখন গোলমাল করে লাভ নেই। কিন্তু কৃষ্ণা কি শুধু ছবিই আঁকে? লেখে-টেখে না তোমার মতো?

—না, লেখে না। শুধু আমার সামালোচনা করে। বলে 'এ হয়নি সে হয় নি। আমি বলি, 'বেশ তো, নিজে লিখে দাও না'—বলে, লিখব কেন? তা হলে ক্রিটিক হবো কী করে?'

কৃষ্ণা বললে, অন্যায় বলি—বলুন?

কিরণ হেসে উঠল: না, আদৌ নয়। বরং ক্রিটিক হওয়ার আসল তত্ত্বটা বুঝে ফেলেছ দেখে খুব খুশি হলুম।

বাণীব্রত সগর্বে বললে, জানেন, দিদি খুব ভাল ছাত্রী ছিল। কিন্তু থার্ড ইয়ারে উঠে সেই যে হার্টের অসুখ করল, এক বছর পড়ে রইল বিছানায়। আর লেখাপড়া করতেই পারল না। নইলে সত্যিই ও ভালো ক্রিটিক হত।

কিরণ বললে, বাণীব্রত, তা হলে মনে মনে দিদির সমালোচনার ওপর তোমার শ্রদ্ধা আছে।

—বড্ড ড্রাসটিক যে! নইলে আপত্তি করতাম না।

—ড্রাসটিক না হয়ে কি করব?—কৃষ্ণা হাসল: তোর বাজে লেখার প্রশ্রয় দেব নাকি? এখনো তোর লেখার কোনো ফর্মই তৈরী হয় নি। কনটেন্ট কোনো নতুন কথা নয়—

—শুনুন কিরণদা—শুনছেন তো?—তারস্বরে প্রতিবাদ তুলল বাণীব্রত।

—সবই শুনছি।—কিরণ চা শেষ করে সিগারেট ধরালো: ভাবছি, আড়ালে আমার অদৃষ্টে কী ঘটে।

—আপনার সম্বন্ধে?—বাণীব্রত বললে, বাপ রে, আপনার যা ভক্ত, সে আর কী বলব।

—তোমার চেয়েও বেশি ভক্ত?—কিরণ হাসল।

—আমি যদি কখনো বলেছি কিরণদার এই গল্পটা আমার ঠিক—বাণীব্রত একটু সামলে নিলে: মানে আমি ভালো বুঝতে পারলুম না, ব্যস—কী চটে গেল। বলে বসল, 'তোর একদম ব্রেন নেই, কী করে বুঝবি?'

—এই, চুপ কর—কৃষ্ণা রাঙা হয়ে উঠল।

—না-না, ওকে বলতে দাও—কিরণ সকৌতুকে কৃষ্ণার লজ্জিত মুখের দিকে চাইল: লেখক হিসেবে একটুখানি প্রশংসা শোনবার আকুলতা সকলেরই আছে, আমাকেই বা তার ব্যতিক্রম ভাবছ কেন?

—ওর কথায় কান দেবেন না। বড্ড বাজে বকে।

—তার মানে, তুমি বলতে চাও ও বানিয়ে বলছে? কিন্তু কোনো কোনো মিথ্যেও শুনতে ভালো লাগে। অন্তত আমার তো লাগেই।

—আমি বানিয়ে বলি নি কিরণদা—বাণীব্রত আবার প্রতিবাদ করল: বরং—

—আঃ চুপ কর না—কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ: একটু বসুন কিরণদা, আমি আসছি।

কিরণ বললে, না, আর বসব না। বৃষ্টিটা থেমেছে মনে হচ্ছে। এবার যেতে হবে আমাকে।

বৃষ্টি সত্যিই থেমেছে। কালবৈশাখী যেমন আকাশ ভেঙে হঠাৎ নেমে এসেছিল তেমনি হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। কাচের জানালার বাইরে লবঙ্গ-লতার মঞ্জরীটি নুয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে,

কোথাও নালা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাওয়ার শব্দ আসছে, ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে—ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে সন্ধ্যার তারা দেখা দিয়েছে।

কৃষ্ণা বললে, শুধু এক মিনিট বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।

কৃষ্ণা বেরিয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হয়ে বাণীব্রত বললে, এতদিন পরে তো হঠাৎ এসে পড়লেন। বসবেন না আর একটু ?

—না, একটা কাজ রয়েছে টালীগঞ্জে। যাই হোক, বাড়ি যখন চেনা হয়েই গেল, তখন সুযোগ পেলেই আসব। তা ছাড়া ভবেশদার যা অবস্থা দেখলুম—তাঁর জন্যেও আসতে হবে এদিকে। পথে তোমাদের বাড়ি তো রইলই।

—ভবেশবাবুর জন্যে আমরা চাঁদা তুলব।

—তুলো। ওটা জরুরি।—কিরণ উঠে দাঁড়ালো।

কৃষ্ণা ফিরে এল। হাতে তার শ্রীনিকেতনের ধরণে কাজ করা চামড়ার একটা ফাইল কেস।

—এইটে নিয়ে যান কিরণদা।

—সে কি ! কেন ?

—আমি তৈরি করেছি আপনার জন্যে। হাতে করে দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু আমার শরীর খারাপ বলে বাবা বিশেষ বেরুতে দেন না—কবে যে গিয়ে দিয়ে আসতে পারব তারও ঠিক নেই। তাই আজ যখন আপনাকে কাছে পেলুম—কৃষ্ণার চোখ নেমে এল মাটির দিকে।

ফাইলটা হাতে নিয়ে মুগ্ধ হল কিরণ। অনেক যত্নে তৈরি। সুন্দর একটি ছবি খোদাই করা হয়েছে চামড়ার ওপর, তাতে রং তুলিও বোলানো হয়েছে। ছবিটি চিনতে দেরি হল না। বলয়ভ্রংশ-প্রকোষ্ঠ বিরহী যক্ষ অঞ্জলি ভরে কুর্চি ফুল নিয়ে চেয়ে আছে সামনের আকাশের ঘনিয়ে আসা নীল মেঘমালার দিকে।

—চমৎকার হয়েছে তো !

সগর্বে বাণীব্রত বললে, দিদি চামড়ার কাজের জন্য মেডেল পেয়েছে—জানেন কিরণদা ?

—আঃ, বাণী !

কিরণ বললে, এবার ওর সার্টিফিকেটের দরকার নেই। আমি এমনিতেই বুঝতে পারছি !

মেসে ফিরতে রাত ন'টা। বাসস্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বাণীব্রত। শেষ পর্যন্তও এক কথা : কবে আসছেন আবার ?

—আসব, আসব, শীগ্‌গিরই আসব।

কৃষ্ণা অনুরোধ করে নি। ওর চোখেই ওর কথা বলে দিয়েছিল।

কিরণ ঘরে ফিরে ফাইল কেসটা খুলল। দেখল, ভেতরটা একেবারে খালি নয়, একটি ছবি আছে। স্কেচ। তারই স্কেচ ; কোনো পত্র-পত্রিকা কিংবা বইয়ের ছবি দেখে আঁকা হয়েছে।

আর স্কেচটির তলায় ছোট ছোট অক্ষরের লেখা : 'লহো প্রণাম।'

॥ উনিশ ॥

পাটনায় ফিরে যাওয়ার আগে আর একবার ডক্টর প্রভাকর ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হল শর্মিলার।

বিকেলে কিছু মার্কেটিং করে ফিরছিলেন শর্মিলা, অন্যদিক থেকে আসছিলেন প্রভাকর। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুজন।

—নমস্কার।

—নমস্কার।—প্রভাকর হাসলেন : আপনাকে একা দেখছি যে ? মিসেস শর্মা কোথায় ?

এবার শর্মিলাও হাসলেন: ভুল করলেন ডক্টর ভৌমিক। আমরা দুজনে সব সময় একসঙ্গে বেরুই না। তা ছাড়া আজ আবার ঠাণ্ডা লেগে গায়ত্রীর একটু জ্বর জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে চুপ করে।

—এখনো মিসেস শর্মা দিনে রাতে সেই বার-কয়েক স্নান করেন তো? ঠাণ্ডা লাগার দোষ কী!

—আপনি তো সবই জানেন দেখছি।

প্রভাকর বললেন, জানি, অনেক দিনের আলাপ। কিন্তু মিসেস শর্মা আমাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। ওঁরা ধার্মিক, আমি নাস্তিক। অ্যাণ্ড দ্য টু এণ্ড্স নেভার মীট্ টুগেদার।

শর্মিলা বলেলেন, এ-সব আলোচনা ছেড়ে দিন—এগুলো বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু গায়ত্রীর জীবনের ইতিহাস তো আপনি ভালো করেই জানেন। এই বিশ্বাসই ওকে এক ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছ, নইলে কবে ও দেউলে হয়ে যেত।

—হয়তো। হয়তো নয়।—প্রভাকর চিন্তিতের মতো মাথা নাড়ালেন: বাঁচার এর চাইতেও ভালো রাস্তা ওঁর ছিল।

—কোন্ রাস্তা কার পক্ষে ভালো সেটা কি অনেকখানি ব্যক্তিগত বিচারের ওপরেই নির্ভর করে না?

—ব্যক্তিগত বিচার?—প্রভাকর একটু থামলেন: সেখানেও ব্যক্তি-সম্পর্কে কতগুলো প্রশ্ন আসে। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর এ-সব তর্ক নয়। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই। মেসেই তো ফিরছেন?

—তা ফিরছি। কিন্তু আপনি কোথায় চলেছিলেন, নিজের কাজ নষ্ট করে—

—কাজ আমার কিছুই নেই, বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সুতরাং আপনার সঙ্গে গেলে ক্ষতি কিছুই নেই, বরং খানিকটা গল্প করা যাবে। লাভেরও কিছু সম্ভাবনা আছে।

শেষ কথাটায় একটু রাঙা হলেন শর্মিলা।

—কিসের লাভ ?

—মেস পর্যন্ত এগিয়ে দিলে তখন কি আর ধুলো পায়ে রাস্তা থেকে বিদায় করতে পারবেন ? অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও বলতে বাধ্য হবেন, আসুন না ডক্টর ভৌমিক, এক কাপ চা খেয়ে যান। এমন কি মিসেস্ শর্মা পর্যন্ত এ-কাজটুকু না করে পারেন নি, চায়ের সঙ্গে কাশী থেকে আনা চমচম আর ডালমুট খাইয়েছেন।

শর্মিলা হেসে উঠলেন ঃ এই কথা ! কিন্তু আপনাকে ভদ্রতা করে বলতে হবে কেন, আপনি দয়া করে পায়ের ধূলো দেবেন, সেইটেই তো বড়ো কথা। কিন্তু কাশীর চমচম আর ডালমুট খাওয়াতে পারব না—তবে গায়ত্রীর কাছে খোঁজ নিতে পারি।

—পাবেন না। উনি আজকাল নির্দয় হয়ে গেছেন। নিজেও খান না, কাউকে খাওয়ানও না।

—চলুন না, দেখা যাক।

দুজনে এগিয়ে চললেন।

সাধারণত বেশি কথা বলতে শর্মিলা ভালোবাসেন না—নতুন মানুষের কাছে মুখ খুলতে তাঁর একটু দ্বিধা আসে। কিন্তু প্রভাকরের কাছে আপনিই সহজ হওয়া চলে, তাঁকে ঘিরে একটি শক্তিময় স্বাভাবিকতা আছে, উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন মন—কোথাও ছায়া নেই, কোথাও সেই নিভৃত নিঃসঙ্গতার আড়াল সেই—অনেকের ভেতরেই যেটাকে বাধার মতো অনুভব করা যায় ; যেন কাছে গিয়েও সরে আসতে হয়—মনে হয় লোকটিকে কখনো সম্পূর্ণ করে জানা যাবে না। হঠাৎ একজনের কথা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল, আর মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন শর্মিলা, একটা চাপা যন্ত্রণা যেন একবারের জন্যে তাঁর হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করল।

প্রভাকর বললেন, যদি অনুমতি করেন—

শর্মিলা চকিত হয়ে উঠলেন ঃ কী বলছেন ?

—একজন পুরুষ সঙ্গে থাকতে অত বড়ো একটা প্যাকেট

আপনি বয়ে চলেছেন, এটা শিভালরির দিক থেকে সম্পূর্ণ বে-আইনী। ওটা দিন আমাকে।

—না—না—থাক।

—থাকবে কেন? দিন।

না দিয়ে পারা গেল না। কোথায় এক ধরণের অদ্ভুত জোর আছে প্রভাকরের, ভয় করে—ভালোও লাগে।

—ডক্টর ভৌমিক, আর ক'দিন আপনি আছেন রাঁচীতে।

—ক'দিন নয়। কাল ভোরেই চলে যাব।

—আবার কবে আসবেন?

—কিছুই ঠিক নেই। কাজের জন্মেই তো আসতে হয়। হয়তো পনেরো দিনের মধ্যেই আসতে পারি, আবার ছু' মাস দেরিও হতে পারে।

শর্মিলা একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনার দরকার ছিল।

—বলেছি তো, আমার পুঁজি-পাটা যৎসামান্য, আপনাকে নতুন কথা কিছুই বলতে পারব না। তবু যদি আপনার কৌতূহল থাকে, চিঠিপত্রে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ঠিকানাটা বরং রেখে যাব আপনার কাছে। আর যদি কখনো পাটনায় আসেন, সে তো আমার সৌভাগ্য।

—গিয়ে হয়তো দেখব আপনি 'টুরে' বেরিয়ে গেছেন। নিরুদ্দেশ হয়েছেন কোনো ফরেস্ট বাংলোয়।

—হতে পারে সে-রকমটা, অসম্ভব নয়। কিন্তু যদি একটা চিঠি লিখে আসেন—

—উঃ, কতগুলো বাধাই যে তৈরি করে রেখেছেন নিজের চারদিকে! রাঁচীতে কখন আসবেন, তার ঠিক নেই; পাটনায় কখন থাকবেন তার নিশ্চয়তা নেই। আপনারা বড়ো বলেই আপনাদের নাগাল পাওয়া এত শক্ত।

—উল্টো কমপ্লিমেণ্ট দিলেন মিসেস রায়চৌধুরী।

—উঁহু, অত বড়ো একটা নাম নয়, শর্মিলা বলবেন। কিন্তু উল্টো কম্‌প্লিমেণ্ট কেন বলছেন?

—আমি আদৌ বড়ো লোক নই, একেবারে বুনো। তাই ভদ্র-সমাজে বেশিক্ষণ থাকতে পাই না।—একটু চুপ করে রইলেন প্রভাকর : কিন্তু শর্মিলা দেবী, জঙ্গলের যে কী অদ্ভুত আকর্ষণ আছে সে আমি আপনাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। বটানিস্ট হিসেবে এক একদিন এক একটা নতুন বিস্ময় আপনাকে চমকে দেবে, প্ল্যাণ্ট লাইফের রহস্য আপনাকে মগ্ন করে দেবে। বাই দি ওয়ে—জানেন, আমাদের এই বিহারেই স্যাণ্ডাল উডের সন্ধান পাওয়া গেছে?

—চন্দন গাছ? বিহারে?—শর্মিলা চমকে উঠলেন : সিলোন আর সাউথ ইণ্ডিয়া ছাড়া আর কোথাও কি—

—হয়, হতে পারে দেখা যাচ্ছে। পরেশনাথ হিল্‌সেই আমরা চন্দন গাছ পেয়েছি।

—বলেন কি।

—খুব হেলদি গাছ নয়—মাইসোর ফরেস্টের সঙ্গে অবশ্য তুলনা করাই চলে না। কিন্তু গাছ যখন পাওয়া গেছে—তখন কালচার করলে নিশ্চয় ডেভেলপমেণ্ট সম্ভব। কী করে এল, বলা কঠিন। শোনা যায়, অনেক কাল আগে নাকি একজন বাঙালী ফরেস্ট অফিসার কিছু চন্দন গাছ এনে এখানে লাগিয়েছিলেন। সে যাই হোক—গাছ হয়েছে, বেঁচে আছে, এইটেই বড়ো খবর। শুধু সায়েন্টিফিক নয়—এর ইকনমিক পসিবিলিটিও ভেবে দেখুন।

—নিশ্চয়, সন্দেহ কি!

প্রফেসারস মেসের কাছে এসে গিয়েছিলেন দুজনে। প্রভাকর দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—নমস্কার, এবার আমি যাই।

—বা-রে, চা খাবেন বললেন—

প্রভাকর হাসলেন ঃ সে তো রইলই, পরে যে-কোনোদিন হতে পারবে। কিন্তু আজ আর আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না।

—আমরা কিসে বিরক্ত হবো না হবো সেটা আমাদেরই ভাবতে দিন। আসুন।

—কিন্তু কাশীর চমচম নেই।

—না থাক, রাঁচীতেও কিছু পাওয়া যায়। তাইতেই আপাতত খুশি থাকতে হবে আপনাকে

প্রভাকর দুই চোখ ভরে সস্নেহ দৃষ্টি ফেললেন শর্মিলার ওপরে। বললেন, সত্যি, আমি ঠাট্টা করেছিলুম। আজ চলি, আর একদিন আসা যাবে।

—এমনি জোর করে ধরে না আনলে আপনি কখনো আসবেন না। চলুন।

বলেই লজ্জা পেলেন শর্মিলা। ঠিক এইটুকু পরিচয়েই কি এমন করে দাবি করা যায় কারো ওপর? কতটুকু তিনি চেনেন প্রভাকরকে? পরক্ষণেই মনে হল, প্রভাকরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বাভাবিকতা আছে; তিনি নিজের মধ্যে কোনো আড়াল রাখেন না—তাঁর সব স্পষ্ট, সমস্ত উজ্জ্বল। তাই স্পষ্ট হয়েই তাঁর সঙ্গে মিশতে হয়, জোর করে কোনো কুণ্ঠার আবরণ টেনে রাখবার দরকার হয় না।

শর্মিলা আবার বললেন, আসুন।

এবার হার মানতে হল প্রভাকরকে।

ঘণ্টা দেড়েক বসলেন—গল্প হল, চা-মিষ্টি এল। গায়ত্রী মনে মনে প্রভাকর সম্পর্কে যা-ই ভাবুন, গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে হাসিমুখে তিনিও এসে আসরে বসলেন।

শর্মিলা ভেবেছিলেন, দরকারী কথা কিছু আলোচনা করবেন, তা আর হয় না। একটুখানি সূচনা হতেই গায়ত্রী বললেন,

'এই রে, প্রফেশ্যনাল ডিসকাশন স্থরু হল, আমি উঠি।' কাজেই সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিতে হল। তার বদলে চলল গল্প, বন-জঙ্গলের গল্প।

প্রভাকর বলছিলেন, কী যে আকর্ষণ আছে অরণ্যের! এক এক সময় মনে হয় গাছপালাগুলো যেন কথা কইছে, একটু কান পেতে থাকলে ওদের সব কথা শুনতে পাওয়া যাবে। এক একদিন রাত্রে আকাশ ভরে জ্যোৎস্না ওঠে, বাংলোর বারান্দায় বসে বসে দেখি সমস্ত জঙ্গল জ্যোৎস্নায় ঘুমুচ্ছে—কখনে কখনো হাওয়া লেগে পাতার আওয়াজ উঠছে। যেন কী একটা স্বপ্ন দেখে কথা বলে উঠল। আবার কোনোদিন ঝড়-বৃষ্টি আসে—অন্ধকারে গাছপালা মাথা খুঁড়তে থাকে—একটা ওয়েলিংয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, যেন কতকালের কান্না জমে রয়েছে ওদের বুকের ভেতর। তখন ভাবি, ওদের সব কথা সব কান্নার যদি মানে বোঝা যেত—

শর্মিলা আবার বললেন, ডক্টর ভৌমিক, আপনি কবি।

—একেবারে না, ও-সব বালাই আমার নেই।—প্রভাকর হাসলেন: আমার ইন্টারেস্ট পুরো সায়েন্টিফিক। বোঝা গেলে বটানিস্টের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনি পাওয়া যেত, দিনের পর দিন নেচারের ব্লাইণ্ড মিস্ট্রির সামনে মাথা খুঁড়ে মরতে হত না।

—কথাটা আপনি ঘুরিয়ে নিলেন ডক্টর ভৌমিক।

গায়ত্রী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, হ্যাঁ, অরণ্যের অনেক কথা আছে। কিন্তু প্রভাকরজী আপনার সায়েন্টিফিক কিউরিসিটি সে-কথা কোনোদিন শুনতে পাবে না। তার জন্যে হেনরি ডেভিড থোরোর মতো মন থাকা চাই, রুশোর মত মেজাজ থাকা চাই, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথের মতো কান থাকা চাই।

—থোরোর কথা কিছু জানি না, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথ ভালো বুঝি না—প্রভাকর দুটো উজ্জ্বল চোখ তুলে গায়ত্রীর দিকে চাইলেন: তবে ডারউইনকে খানিকটা জানি। বনভূমি সব সময়

দেবতার কণ্ঠস্বর বহন করছে—বৈজ্ঞানিক হিসেবে এ থিয়োরীতে আমার সমর্থন নেই। আমি বিশ্বাস করি—ইট্‌স এ লাইফ। অ্যাণ্ড হোয়াট এ লাইফ! কামনা-বাসনা, সংগ্রাম-হিংসা—অর্থাৎ অ্যানিম্যল-ওয়ার্ল্ডের সব মৌলিক উপকরণগুলো সব চাইতে আদিমভাবে জেগে আছে ওখানে।

—এখানেই আপনাদের সকলের চাইতে বড়ো ভুল।—গায়ত্রীর চোখও ঝকঝক করে উঠল: এই দৃষ্টির জন্যেই আপনারা ঈশ্বরের সঙ্গে কমিউনিকেশন হারিয়েছেন। যেখানে তাঁর বন্দনা উঠেছে—সেখানে আপনারা হিংসার মন্ত্রণা শুনছেন।

প্রভাকর একটু চুপ করে রইলেন কী একটা বলতে গিয়েও একবার সামলে নিলেন, তারপর শান্ত গলায় বললেন গায়ত্রীজী, আবার সেই নর্থ পোল আর সাউথ পোল। কিছুতেই আপনার সঙ্গে আমার মিলবে না, আজ সারাটা রাত ধরে তর্ক করলেও নয়। আসুন আপাতত সন্ধি করে ফেলি।—একবার ঘড়িটার দিকে তাকালেন: অনেকক্ষণ আপনাদের সময় নষ্ট করা গেল, এবার ওঠা যাক। অ্যাণ্ড মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্‌ ফর ইয়োর টী অ্যাণ্ড সুইট্‌স।

শর্মিলা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কালই চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। ভোরবেলাতেই।

—আপনার ঠিকানাটা আমাকে দেবেন, বলেছিলেন।

—হোয়াই, অফ কোর্স।—পকেট থেকে একটা কার্ড বের করলেন প্রভাকর, এগিয়ে দিলেন শর্মিলার দিকে: যদি কখনো আসেন অনুগ্রহ করে, দিনকয়েক আগে একটা পোস্টকার্ড ফেলে দেবেন। আর পারেন তো গায়ত্রীজীকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, প্রাণভরে তর্ক করা যাবে ওঁর সঙ্গে।

উত্তরে গায়ত্রী একটুখানি বিরস হাসি হাসলেন, জবাব দিলেন না।

প্রভাকর বললেন, চলি—নমস্কার।

—নমস্কার—নমস্কার।

গায়ত্রীও আর বসলেন না শর্মিলার কাছে। 'আমার ভারী মাথা ধরেছে'—বলে উঠে পড়লেন। শর্মিলার এতক্ষণে মনে হল আজ মেসে প্রভাকরকে ডেকে আনা গায়ত্রীর ভালো লাগে নি। আরো ভালো লাগে নি তার কাছে প্রভাকরের ঠিকানা রেখে যাওয়া, কিন্তু গায়ত্রীর সেন্টিমেণ্ট মেনে চলতে গেলে শর্মিলার চলে না, প্রভাকরকে দিয়ে তার অনেক সাহায্য হবে, অনেক উপকার পাবেন তাঁর কাছ থেকে। এখানে কিছু নিয়ে আলোচনা করবার হতো একটা লোকও তো কেউ নেই।

গায়ত্রী চলে গেল শর্মিলা লক্ষ্য করলেন, টেবিলের ওপর বিকেলের চিঠিপত্র রয়েছে। একটা পত্রিকা, একটা দিল্লীর সেই পাবলিশারের বিনীত তাগিদ, আর একখানা খাম। গোটা গোটা কাঁচা হাতের ঠিকানা ঃ লেখার চিঠি।

'জানো কাকীমা, আমাদের হাতে লেখা ম্যাগাজিনের জন্যে সেই লেখক কিরণ কাকার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলুম। উনি আমাদের চার লাইন কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে লাইনগুলো এই ঃ

'বুকে আঁকা আছে কৃষ্ণচূড়ার দিন
এ জীবন ভরে বয়ে যাবো তার ঋণ
হয়েছি ধন্য, পেয়েছি সুধার স্বাদ
কৃতজ্ঞ আমি—কী দেব আশীর্বাদ ?'

কাকিমা, মেয়েরা জিজ্ঞেস করছে, এই কবিতার মানে কী। আমিও কিছু বুঝতে পারলুম না। তাই তোমাকে চিঠি লিখলুম। তুমি—'

শর্মিলা আর পড়তে পারলেন না। বুকের ভেতরে আবার বন্যা ভেঙে পড়ল। ভুলতে দেবে না, কিছুতেই কি এরা ভুলতে দেবে না ?

॥ কুড়ি ॥

সামনের জানলাটা দিয়ে পূবের হাওয়ায় যেমন হঠাৎ কখনো কখনো এক-আধটা পাতা রাস্তা পার হয়ে উড়তে উড়তে চলে আসে, ঠিক তেমনি করেই এল লেখার চিঠিটা।

'কিরণ কাকা, আপনি নিশ্চয় আমাদের ভুলে গেছেন। আপনারা বড়ো লেখক, কত কাজ আপনাদের। আমাদের কথা কি আর মনে থাকে? আমরা কিন্তু আপনাকে ভুলি নি। মা-বাবা সব সময় আপনার কথা বলেন। আর ডগলাস যে আপনার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, সেই মজার ব্যাপারটা নিয়েও আমরা খুব গল্প করি।

আমাদের স্কুল খুলেছে, আমরা হাজারীবাগে চলে এসেছি। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিন আছে, কিন্তু আমরা সবাই মিলে হাতে লেখা একটা কাগজ বের করছি। আপনি আমাদের কাগজের জন্যে চার লাইন কবিতা লিখে দেবেন। মেয়েরা বলেছে আপনি কিছুতেই কবিতা দেবেন না, কিন্তু আমি এক টাকা বাজি ধরেছি ওদের সঙ্গে। আপনি নিশ্চয় কবিতা দেবেন—দেবেন তো? প্রণাম নেবেন। ইতি লেখা।'

প্রথমটা স্মৃতির স্নিগ্ধতায় মন ভরে উঠল। কিরণ চোখ বুজে কিছুক্ষণ সেই মাঠ—সেই হু-হু বাতাসের স্পর্শ নিলে, কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী কিছুক্ষণ তাকে ঘিরে রইল। কয়েক মিনিটের জন্যে পাহাড়ী নদীটার ওপরে সোনালি সন্ধ্যা নেমে এল, তারপরেই যন্ত্রণার মূর্তির মতো সেখানে ফুটে উঠলেন শর্মিলা। তৎক্ষণাৎ কিরণের চিঠি লিখতে ইচ্ছে করল, 'আমি পারব না, কবিতা আমি কোনোদিন লিখি নি।' তারপরেই মনে হল, লেখা ছেলেমানুষ, সে এক টাকা বাজি হেরে যাবে, এটা কোনো কাজের কথাই নয়।

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে চার লাইন কবিতা লিখে ফেলল, একটা খামে পুরে মেসের চাকরকে ডেকে তখুনি ডাকে পাঠিয়ে দিলে। আর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুতপ্ত হল। এ কবিতা কার জন্যে লিখল সে? কেনই বা লিখল? এই চারটি লাইনের আড়ালে যার উদ্দেশ্যে অন্তরের কৃতজ্ঞতা সে পাঠিয়ে দিয়েছে, এ কবিতা কোনোদিন সে পড়বে না।

সেই ব্যর্থ সন্ধ্যাগুলোর পরেই তো তার আত্মস্থ হওয়া উচিত ছিল। তারপর সেই একটি চিঠি—নিজের মনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দূরে সরে গেছেন শর্মিলা। তিনি তো কৃতজ্ঞতা চান নি। মুক্তিই চেয়েছিলেন তার কাছ থেকে। এ কবিতা শর্মিলা পড়বেন না, উপযাচক হয়ে কৃষ্ণচূড়ার ঋণ স্বীকার করবার কিছুমাত্র দরকার ছিল না।

কিন্তু চিঠিটা ডাকে দিয়ে হাতের তীর বেরিয়ে গেছে এখন। ও আর ফেরানো যাবে না। নিজের সম্পর্কে ভারী একটা ঘৃণা বোধ করল কিরণ। সেই ছেলেবেলায় একদিন রাজহাঁসের কলম খুঁজতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। পথ-ঘাট কিছুই চিনত না, কতদূরের সেই পদ্মবিলে শেষ রাতের জ্যোৎস্নায় রাজহাঁসের ঝাঁক নেমে আসে, সে-সব খবর কিছুই জানা ছিল না তার। তবু সূর্য ওঠবার আগেই সে সামনের মাঠ দিয়ে চলতে সুরু করেছিল, পার হয়ে গিয়েছিল শীতের নদীটার হাঁটুজল, একটা পুরোনো দীঘির উঁচু পাড়ের ওপরে ভাঙা মন্দিরকে হাজারো পাঁকে জড়ানো বটগাছটার ছায়ায় জিরিয়ে, আদি-অন্তহীন বেনা আর কুঁজি কাঁটার বনে সে পথ হারিয়ে ছিল।

তারপর বেলা দুটো পর্যন্ত সে কি খিদে, কী ভয়, কী যন্ত্রণা। মাথার ওপরে উড়ন্ত শঙ্খচিল, কোথা থেকে হাড়গিলার কর্কশ চিৎকার, তিনটে লাল লাল বাচ্চা নিয়ে একটা শেয়ালের ছুটে পালানো। যখন মনে হয়েছিল, এই বেনাবনের ভেতরেই সে

চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে, তাকে আর কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে না তখন—

তখন সেই মুসলমান ফকির।

'বাবা, কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

রাজহাঁসের পালক আর নয়, তখন মৃত্যুভয়। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল।

'আমার পথ হারিয়ে গেছে!'

সেই ফকিরই তাকে গ্রামের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বাবা, ও-সব মাঠ-ঘাটে অমন করে ঘুরতে নেই। ওখানে নানারকম সাপ আছে, বুনো শূয়োর আছে, কখনো কখনো চিতাবাঘও বেরোয়। এ রকম পাগলামি কোনোদিন আর কোরো না।'

রাজহাঁসের পালক মেলে নি, তার বদলে মৃত্যু এসে ছায়া ফেলেছিল। কিরণ জানে, রোমান্টিক ছেলেমানুষীর বিরুদ্ধে তার অবচেতন মনে বিদ্রোহ জেগেছিল সেই প্রথম। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম ন্যাকামিকে সে আঘাত করতে চেয়েছে, রূঢ় সত্য দিয়েই যাচাই করতে চেয়েছে জীবনকে, সেই জীবনের চোরা গলির গোলকধাঁধায় আবিষ্কার করতে চেয়েছে তার আত্মাকে। বাংলা দেশের পাঠকেরা এই কিরণ বসুকেই জানে, তার যা কিছু খ্যাতি-অখ্যাতি এরই ওপর।

প্রতিমা যখন স্ত্রী হয়ে এল, তখন কিছুদিন আবার চিরকালের ছেলেমানুষীর পালা। কিন্তু কাঁটা উঠে এল এক বছরের ভেতরেই। অবিশ্বাসে সন্দেহে এক মুহূর্তে সব কাঁচা রঙ গলে গেল, বেরিয়ে এল জীবনের বীভৎস কালো—আর সেই কালোর পটভূমিতে কিরণ আর একবার নিষ্ঠুরভাবে সত্যের মুখোমুখি হল।

তারপরে মনে হয়েছিল রঙ আর কোনোদিন ধরবে না, সম্পূর্ণ মোহমোচন ঘটেছে তার। কিন্তু আশ্চর্য কৃষ্ণচূড়া, আশ্চর্য সেই

নীল মেঘের মতো দূরের পাহাড়, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুলে ভরা মহাকাল, সেই সন্ধ্যার সোনালি নদী। শুধু একটি রঙ নয়, সাত রঙে রাঙিয়ে দিল, একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ করে তুলল, আর কিরণ যে-কোনো তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নায়কের মতো—

কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য, এখনো নেশা কাটল না। আজও সে লেখাকে উপলক্ষ করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে শর্মিলার কাছে।

একটা সিগারেট ধরিয়েছিল কিরণ, দু-তিনটি টান দিয়ে সেটাকে নির্মমভাবে চেপে ধরল অ্যাশট্রের ভেতর। আর নয়, এইখানেই এর শেষ হওয়া দরকার।

কৃষ্ণাকে মনে পড়ে গেল।

সেই শান্তিনিকেতনের কাজ-করা ফাইল কেসটি, কিরণের একটি স্কেচ, তার তলায় দুটি শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ কথা: 'লহো প্রণাম'। কৃষ্ণা তাকে ভক্তি করে। যুক্তির দিক থেকে ভক্তি জিনিসটাকে কিরণ বিশ্বাস করে না, সে জানে ওটা শুধু অকারণে মানুষের ছোট হয়ে যাওয়া, আত্মমর্যাদার অপমান করা। কিন্তু রোগা মেয়ে কৃষ্ণার গভীর চোখ দুটি তার ভালো লাগে, তার কাছ থেকে এইটুকু শ্রদ্ধা নিতে তার দ্বিধা হয় না।

আর শর্মিলা—

মেসের চাকর এসে ডাকল: বাবু!

কিরণের ধ্যান ভাঙল। বিরক্ত হয়ে বললে, কী হল?

—টেলিফোন এসেছে।

এই এক যন্ত্রণা। মেসে একটা টেলিফোন আছে ম্যানেজারের ঘরে। যখন কোনো ফোন আসে, তখন দোতলার ঘরে নেমে যেতে হয় এবং প্রায়ই সেটা বিরক্তিকর ঠেকে। বিশেষ করে কাজকর্মের সময় কেউ যখন ডেকে এনে জানায়: আপনাকে আমাদের সাহিত্য-সভায় বক্তৃতা করতে হবে—তখন সাধারণ সৌজন্যটুকুও বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠে।

কিরণ বিরস দৃষ্টিতে চাকরটার দিকে চাইল। বললে, কে ডাকছে?

—আজ্ঞে কোন্ এক হাসপাতাল থেকে কথা কইছেন। নাম বললেন, ডাক্তার ঘোষাল।

ডাক্তার ঘোষাল। অ্যাসাইলাম থেকে ডাকছেন। কিরণ চমকে উঠল। নিজের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর ডাক্তারকে সে দিয়ে রেখেছিল বটে, কিন্তু এর আগে কোনোদিন তাঁর তো ফোন করবার দরকার পড়ে নি।

পায়ে চটি গলিয়ে তখুনি নীচে নেমে গেল সে।

—কিরণ বসু কথা বলছি।

ওপার থেকে ডাক্তারের এক গলা শোনা গেল: দয়া করে এখুনি একবার আসতে পারেন? বড্ড জরুরি।

কিরণ ব্যাকুল হয়ে বললে, কী হয়েছে?

—অ্যাকসিডেণ্ট।

—অ্যাকসিডেণ্ট? কার অ্যাকসিডেণ্ট?—জিজ্ঞাসা করবার দরকার ছিল না, তবু যেন কিবণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না।

—মানে মিসেস বসু হঠাৎ—

কিরণ প্রায় চিৎকার করে উঠল: বেঁচে আছে তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। তবে পারেন তো একবার চলে আসুন।

—আমি এখুনি আসছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে তেতলায় ছুটল কিরণ।

অনেকদিন যেন ভালো করে ঘুমোয় নি প্রতিমা, এমনিভাবে চোখ দুটি তার গভীর শান্তিতে বুজে আছে। ক্লান্ত করুণ মুখে মানসিক ঝড়-বিপর্যয়ের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। অসম্ভব রোগা হয়ে গেছে—চোখের কোটর ছায়ায় ঢাকা, গালের হাড় উঠে

পড়েছে, শুধু ক্লান্তি আর শীর্ণতা ছাড়া কোথাও তার পাগলামির কোনো লক্ষণই নেই। যা কিছু অন্ধকার অবিশ্বাস আর ভয় তার দুই চোখেই জমাট হয়ে থাকত, সে চোখ দুটি এখন অতল বিশ্রামে মগ্ন।

প্রতিমা ঘুমুচ্ছে।

না, ঘুম নয়। প্রতিমার সব অসুস্থ, অসংলগ্ন চিন্তাগুলো এখন নিশ্চেতনার আড়ালে। তার জ্ঞান নেই।

পাশের চেয়ারটাতে বসে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে প্রতিমার দিকে চেয়ে রইল কিরণ। তার স্ত্রী। জীবনে মানুষ যা কিছু কামনা করে—বিশ্রাম, আশ্রয়, প্রতিদিনের কাজ আর ভাবনার ভার থেকে অন্তত খানিকটা মুক্তি, তার সব তাকে দিতে পারত প্রতিমা। কিন্তু কোথা থেকে কিভাবেই যে বিষ উঠে এল! রাজহাঁসের পালক খুঁজে বেড়ানোর শেষ মোহটুকুও একটা অন্ধকার বিসর্পিলতায় বিলীন হয়ে গেল।

ডাক্তার কথা কইছিলেন। ঝাপসা দৃষ্টিতে কিরণ তাকালো তাঁর দিকে।

—আমার সেই ওষুধটায় খুব কাজ হয়েছিল, জানেন? আগে মধ্যে মধ্যে ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠতেন, সব থেমে গিয়েছিল। এখন খালি চুপ করে বসে থাকতেন। এমন কি এ-ও মনে হত, যেন অল্প অল্প বুঝতে পারছেন। কিন্তু হঠাৎ—

কিরণ অপেক্ষা করতে লাগল।

—হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন ওদিকের বাড়িটার ন্যাড়া ছাতে। বেলা এগারোটা তখন, ঝি-টা ওঁর জন্যে খাবার আনতে গিয়েছিল। ইদানীং এত শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, দুম করে কিছু একটা করে ফেলতে পারেন সে-কথা কারুর মনেই হয় নি। কিন্তু তবু ওঁকে ছাতে যেতে দেখে দুজন চাকর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে। কিন্তু তারা ধরে ফেলবার আগেই ছাত থেকে লাফিয়ে পড়লেন।

বিবর্ণ গলায় কিরণ বললে, সুইসাইড করতে চেয়েছিল।

—কিন্তু সে ম্যানিয়া তো ওঁর ছিল না। এতদিন ধরে আমি ওঁকে ওয়াচ করে আসছি, কোনোদিন সে লক্ষণ তো কিছু দেখি নি।

—মনের গতি তো অন্যদিকেও ঘুরে যেতে পারে।

—সাধারণত তা তো হয় না। এক একজনের এক-একটা ফিক্সেশন, এক-একটা কম্‌প্লেক্স। মন থেকে তারই জটটা ছাড়িয়ে দিতে পারলেই পেশেণ্ট ভালো হয়ে ওঠে। মিসেস বসু সম্পর্কে এ দিকটা আমার কখনো স্ট্রাইক করে নি। মৃত্যু ভয়টাই ওঁর বেশি করে ছিল, ইচ্ছে করে মরতে চাইবেন এ কথা মনেই হয় নি কখনো।

কিরণ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, বাঁচবে ?

—নিশ্চয় বাঁচবেন। একতলার নীচু ছাত, তা ছাড়া ফুলের গাছগুলোতে কিছু বাধাও পেয়েছিলেন। হাত-পায়ে কতটা লেগেছে বুঝতে পারছি না, তবে ফ্র্যাক্‌চার কিছু হয় নি। যা লেগেছে মাথায়।

—কিন্তু সেইটেই তো মারাত্মক।

ডাক্তার ঘাড় নাড়লেন। বললেন, আমারও তো ভয় সেই-খানেই ছিল। তবে চোখ পরীক্ষা করে দেখেছি, কনকাশন হয়েছে বলে মনে হল না। তা হলে পেশেণ্টের চেহারাই অন্যরকম হয়ে যেত। তবু আমি মেজর সিন্‌হাকে কল দিয়েছিলুম। তিনি দেখে শুনে বললেন, শকটা আজই কেটে যাবে, বিকেলেই হয়তো সেন্স ফিরে পাবেন। আর একটা এক্স-রেও দরকার হতে পারে, অবস্থা বুঝে কাল তার ব্যবস্থা করব।

—তা হলে আপনি বলছেন ভয়ের কিছু নেই ?

—না—না। ইউ মে টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।

অতএব আর কিছু করবার নেই। ডাক্তার ঘোষাল তার সব ভাবনায় ভার তুলে নিয়েছেন। এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে, একটার পর একটা সিগারেট খেতে পারে, আর শুধু অলস কৌতূহলে এই ধাঁধাটার একটা জবাব খুঁজতে পারে; প্রতিমা মরতে চায় নি, মৃত্যুকে সে ভয় করত—তবু কেন সে আত্মহত্যা করতে চাইল?

বাইরে দুপুরের রোদ বিকেলের ছায়া লেগে কোমল হয়ে এল। এদিকে পুকুরের জলটা সেই রোদের ছোঁয়ায় নীলোজ্জ্বল। বাতাসে শুকনো ঘাস আর গাছপালার শব্দ আসছে, শালিকের আলাপ শোনা যাচ্ছে। অনেক দূরে ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ। লাল রঙের একটা গরু পুকুরের ধারে ধারে চরে বেড়াচ্ছে।

শান্তি আর বিশ্রাম। এখানে চারদিকে কোথাও তাড়া নেই, কলকাতার ব্যস্ততা নেই, জীবনের ঝড় নেই; যারা মনের তুফানে ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেছে এ যেন তাদের এক নির্জন সমুদ্রতীর, সাগরের ঢেউ তাদের এইখানটিতে এনে ফেলে গেছে তাদের কোনো দায় নেই, কোনো দুশ্চিন্তাও নেই।

প্রতিমা তাই ঘুমুচ্ছে। না—ঘুমুচ্ছে না। ঘুমও তো সম্পূর্ণ বিশ্রাম নয়—সেখানে স্বপ্নেরা এসে ভিড় করে। অচেতনার অতলে তলিয়ে রয়েছে প্রতিমা। একেবারে মুক্তি। মৃত্যুর সিংহ-দুয়ারের মুখোমুখি।

কিরণ একটা নিশ্বাস ফেলল।

—ডক্টর ঘোষাল, আজ আমি থাকতে পারি এখানে?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়। গেস্ট রুম তো রয়েছেই আমাদের। কোনো অসুবিধে হবে না।

—আর—এতক্ষণে একটা জরুরি কথা মনে পড়ে গেল: অরবিন্দদা—মানে প্রতিমার দাদাকে একটা খবর দিতে চাই। আপনার টেলিফোনটা ইউজ করতে পারি?

—কী আশ্চর্য, সে-কথা জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? আসুন আমার সঙ্গে।

সারা শরীরে যেন বিশ মণ ভার নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কিরণ। কর্তব্য। জীবনের অর্থ আর কিছু নয়, শুধু কর্তব্যের আংটাগুলোকে পর পর গেঁথে নিয়ে সেই শিকলে নিজেকে পাকে পাকে জড়ানো।

॥ একুশ ॥

কলেজ খুলেছে, কাজের চাপ বেড়েছে শর্মিলার। বইটার কাজও খানিকটা এগিয়েছে। তা ছাড়া থীসিসটা শেষ করবার ভাবনাও পেয়ে বসেছে নতুন করে। প্রভাকর এর ভেতরে আর রাঁচীতে আসেন নি, কিন্তু চিঠিপত্রে শর্মিলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। প্রভাকর কিছু নতুন তথ্য দিয়েছেন, অনেকগুলো ভালো বইয়ের সন্ধানও জানিয়েছেন।

গায়ত্রীর সঙ্গে এক সময় যে ঘনিষ্ঠতাটা বেড়ে উঠেছিল, সম্প্রতি একটু ভাঁটা পড়েছে তাতে। শর্মিলার কাজ করতে চান, রিসার্চ করতে চান। নিজের নিঃসঙ্গ মনের ভেতরে যে কৃষ্ণচূড়ার আলো জ্বলছে, তার দরজাটা বন্ধ করে রাখতে চান; গায়ত্রীও মিস্টার শর্মার চিঠিতে ভুলে থাকতে চান—যে জীবন একদিন তাঁকে বঞ্চনা করে চলে গেছে, তার সব প্রলোভনকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চান তিনি। একদিন একই বেদনার সূত্রে দুজনে এক সঙ্গে মিলেছিলেন, গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব যেন কিছুক্ষণের জন্যে শর্মিলার ওপর মোহও ছড়িয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে ডক্টর প্রভাকর ভৌমিক এসে সব অন্যরকম করে দিয়েছেন। কিরণ বসু শর্মিলাকে এক নিভৃত বেদনার বৃত্তের মধ্যে নির্বাসন দিয়েছিল, প্রভাকর তাঁকে একটা পরিব্যাপ্ত চিন্তা আর কাজের জগতে মুক্তি দিয়েছেন।

শর্মিলা ভেবেছেন, এই-ই ভালো। কাজ— কাজ—কাজ। রাত্রির

পর রাত্রি অনিদ্র জাগরণ, অর্থহীন যন্ত্রণায় বার বার পীড়িত হতে থাকা, অমিতাভর স্মৃতিকে তিনি অসম্মান করছেন—দিনের পর দিন এই গ্লানিবোধ—এ সমস্ত দুঃসহতা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে প্রভাকরের একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। এখনো এক-একটা রাত স্মৃতিতে মন্থর হয়ে ওঠে, কখনো সেই পাহাড়, সেই ফুল আর সেই মানুষটি নেশা-জড়ানো স্বপ্নের মতো চেতনাকে অভিভূত করে। শর্মিলা পেয়েছেন, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত ভেবেছেন, থাক। মনের অ্যালবামে মানুষ অনেক ছবি জমিয়ে রাখে, এও থাক। মাঝে মাঝে পুরোনো ছবিগুলো দেখতে দেখতে যদি কিছুক্ষণের মগ্নতা আসে, তাতে কোনো অপরাধ নেই। কাজের জীবনটা তো সামনে পড়েই রইল।

আপাতত এই ভাবেই একটা সমাধান এসেছে। শর্মিলা কলেজের ক্লাস, পাবলিশারের কপি আর ক্যাকটাসের জীবন-রহস্য নিয়ে যথাসম্ভব ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু গায়ত্রীর সঙ্গে একান্তে বসবার সুযোগ হয় নি। গায়ত্রী আবার নিজের যোগবাশিষ্ঠে ডুব দিয়েছেন, শর্মিলার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মৃদু হাসির বিনিময় ছাড়া আর বিশেষ কোনো কথা হয় না। এক সঙ্গে 'রামচরিত মানস' পড়বার পরিকল্পনাও সূচনাতেই শেষ হয়ে গেছে। অন্য প্রফেসারেরাও এসে পড়েছেন, দুজনের জন্যে কিছুক্ষণ নিভৃত সময় খুঁজে পাওয়াও কঠিন।

কলেজের ল্যাবারেটরীর জন্যে কিছু রিকুইজিশন দিয়েছিলেন শর্মিলা। কতকগুলো স্পেসিমেন দরকার, কিছু যন্ত্রপাতিও চাই। সেই সূত্রেই প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠালেন।

—মিসেস রায়চোধুরী, কাল সেক্রেটারী কলকাতা যাচ্ছেন তিন দিনের জন্যে। আপনার ল্যাবরেটরীর জিনিসপত্রগুলো কেনবার জন্যে দরকার হলে আপনিও সঙ্গে যেতে পারেন।

শর্মিলা একটুখানি ভাবলেন। এসব ব্যাপারে নিজে যাওয়াই সুবিধে। দেখে শুনে নেওয়া যায়।

প্রিন্সিপ্যাল আবার বললেন, শেষে আপনিই কম্‌প্লেন করবেন, এটা ঠিক হয় নি, ওটা এল না। আমি ওসব ঝামেলার মধ্যে যেতে চাই না। আপনার ডিপার্টমেণ্টের জিনিস আপনিই পছন্দ করে নেবেন।

—বেশ, যাব।

—তা ছাড়া আর একটা কাজও করতে হবে। কলেজে এত বাঙালী স্টুডেণ্ট, অথচ ওরা বলে, লাইব্রেরীতে ভালো বাংলা বই নেই। আমি তো বাংলা বইয়ের খবর কিছু জানি না, আপনি বাংলার প্রফেসারের সঙ্গে কথা বলে একটা লিস্ট করে নিয়ে যান। শ' পাঁচেক টাকার মতো একটা অর্ডার দিয়ে আসবেন।

—তাই হবে।

শর্মিলা খুশি হয়ে বলে এলেন। বছর তিনেক কলকাতা যাওয়া হয় না—সেদিক থেকে একটা আকর্ষণ আছেই। বড়ো মামা কলকাতায় আছেন, শর্মিলাকে ভারী ভালোবাসেন, তাঁর ওখানেও আনন্দে ছুটো দিন কাটিয়ে আসা যাবে। অবশ্য কেনা-কাটার বাইরে বেশি সুযোগ-সময় পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেটুকু পাওয়া যাবে, তাই লাভ।

আর—

সারা শরীর-মন শিউরে দিয়ে আর একটা কথা চমকে উঠল। কিরণের সঙ্গেও তো একবার দেখা হয়ে যেতে পারে।

শর্মিলা করিডরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে মাতলামি সুরু হল হৃৎপিণ্ডে। জানতেও পারলেন না, মুখের রঙ তাঁর বদলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি।

লক্ষ্য করলেন আর একজন। রেজেস্ট্রী নিয়ে ক্লাসে চলেছিলেন ইকনমিক্সের মিস্ সেন। শর্মিলার দিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন, কী হল আপনার শর্মিলাদি? এমন করে দাঁড়িয়ে যে?

শর্মিলা লজ্জায় চকিত হয়ে উঠলেন। বললেন, না—কিছু নয়।

পাশেই জুয়োলজীর ল্যাবরেটরী। পর্দা সরিয়ে শর্মিলা ঢুকে পড়লেন তার ভেতরে। এখন কোনো প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস নেই, দুজন অধ্যাপিকা অফ পিরিয়ডে বসে সেখানে চা খাচ্ছিলেন এবং আড্ডা দিচ্ছিলেন। তাঁর একজন সদ্যোবিবাহিতা এবং আর একজনের পূর্বরাগ চলছে। সুতরাং আলোচনাটার সঙ্গে জুয়োলজীর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

তাঁকে দেখেই বিবাহিতা পাঞ্জাবী মেয়েটি কলধ্বনি করে উঠলেন।

—আসুন শর্মিলাদি, আসুন। আপনি ইলার একটা প্রব্‌লেম সল্‌ভ্‌ করে দিয়ে যান।

কুমারী ইলার মুখ সিঁদূরের মতো রাঙা টকটকে হয়ে উঠল।

—কী হচ্ছে কমলেশকুমারী। না শর্মিলাদি, ও বড্ড বাজে বকে, ওর কথায় কান দেবেন না।

কমলেশকুমারী বললেন, চালাকি নয়, শর্মিলাদি সোবার লোক। ওঁর কাছ থেকে একটা অনেস্ট অ্যাডভাইস পাওয়া যাবে। শর্মিলাদির এখন ক্লাস নেই তো? ভেরী গুড। আসুন—হ্যাভ এ কাপ অফ টী উইথ আস, তারপর ইলাকে একটুখানি ভরসা দিয়ে যান।

ইলা পালাতে চাইছিল, কমলেশকুমারী তাঁর টেনিস-খেলা শক্ত মুঠোতে ইলার বাহু চেপে ধরলেন।

—উঁহু, পালালে চলবে না, দ্য ম্যাটার ইজ ভেরী আর্জেন্ট।

মৃদু হেসে একটা চেয়ার টেনে শর্মিলা বসে পড়লেন। তারপর হাসিতে গল্পে যে আলোচনা চলতে লাগল, তা অ্যাকাডেমিক নয়, একস্ট্রা-অ্যাকাডেমিকও নয়, একান্তই মেয়েদের। সে আলোচনা সম্পর্কে পুরুষের কৌতূহলের অন্ত নেই, আর সৃষ্টির আদিম কাল থেকে সেই আলোচনায় চিরদিন পুরুষের শ্রুতি নিষিদ্ধ।

আর ধীরে ধীরে শর্মিলার রক্ত নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল, বুক ভরে যেন ফুটে উঠতে লাগল কৃষ্ণচূড়া। কলকাতায় গেলেই

কিরণের সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে। কিন্তু দেখা করা উচিত হবে? যে সুখে ঝলমল করছে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী কমলেশকুমারী, কিশোরী মেয়ের মতো ছোটখাটো ইলা যে স্বপ্নে তন্ময়, তাতে কতটুকু দাবি আছে শর্মিলার? হাসি-গল্পের ক্ষেত্রে কড়া পিউরিটান তিনি নন, ধর্ম নিয়ে যেমন সহজেই আলাপ করতে পারেন গায়ত্রীর সঙ্গে, তেমনি সম্পূর্ণ বিজাতীয় আলোচনাতেও তাঁর সেই নিরাসক্ত সান্নিধ্য আছে। অন্তত এতদিন এমনি করেই চলছিল। কিন্তু আজ কমলেশের প্রতিটি রসিকতা তাকে স্পর্শ করছে, ইলার লজ্জার রঙ ছড়িয়ে পড়ছে তাঁরও মনে।

কিরণের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না। দেখা করা উচিত নয়। এ সেই আদিম বন্য আকর্ষণ—যা অমিতাভর স্মৃতি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে আনে, যা প্রভাকরের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত প্রেরণাকে ভুলিয়ে দেয়, যা মহাকাল মন্দিরের ঝর্ণায় পা পিছলে যাওয়ার মতো একটা মৃত্যুর অতলে তাঁকে আকর্ষণ করে।

কমলেশ উঁচু গলায় হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু শর্মিলা আর কোনো কথা শুনতে পেলেন না। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে সামনের কাচের জারের দিকে। একটি শিশু অক্টোপাস ফর্মালিনের মধ্যে ডুবে আছে—যেন শর্মিলার দিকেই বাড়িয়ে রেখেছে একটি শুঁড়—দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ভ্যাকুয়াম বিবর—যার হাত থেকে শিকারের কোনোদিন নিষ্কৃতি মেলে না।

শর্মিলা কিরণের সঙ্গে দেখা করতে চান না। কিন্তু সামলাতে পারবেন প্রলোভন?

হঠাৎ মনে হল, অক্টোপাসের শুঁড়টা যেন নড়ে উঠল একবার। শর্মিলা চমকালেন। না—মনের ভুল। দু'বছর ধরে অক্টোপাসটা ওইভাবেই ফর্মালিনের ভেতরে তলিয়ে আছে।

শর্মিলা ঘড়ির দিকে তাকালেন। আর মিনিটদশেক দেরি আছে ঘণ্টা পড়তে।

—উঠি, ক্লাস আছে।

কমলেশ বললেন, কিন্তু অ্যাডভাইসটা কী হল, শর্মিলাদি?

শর্মিলা জোর করে হাসলেন। বললেন, ভেবে দেখব।

ল্যাবরেটরীর বাইরে এসে একবার ভাবলেন, এখুনি প্রিন্সি-প্যালকে গিয়ে বলবেন, কাল তিনি কলকাতায় যেতে পারবেন না, তাঁর শরীর ভাল নেই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, ছিঃ—ছিঃ এতটুকু আত্মবিশ্বাস নেই তাঁর?

কলকাতায় তিনি যাবেন। কিন্তু কিরণের সঙ্গে দেখা করবেন না। না, কিছুতেই নয়।

রাজেনবাবু বলছিলেন, বেশ ইণ্টারেস্টিং তো।

বিমর্ষ ক্লান্ত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কিরণ। তারপর বললে, হ্যাঁ এও একরকম শক-থেরাপী। তবে মারাত্মক শক। সামলে উঠতে বেশ সময় লাগবে।

—তা লাগুক, কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ডাক্তারেরা বলছেন, আপনার স্ত্রীর মেমোরি রিভাইভ করবে? সেরে উঠতে পারেন?

—অসম্ভব নয়। অল্প অল্প লোক চিনতে পারছে মনে হয়।

—অদ্ভুত ব্যাপার।

—খুব অদ্ভুত কিছু নয়।—কিরণ শীর্ণভাবে হাসল: মেণ্টাল শকে পাগল হয়ে গিয়েছিল, ভায়োলেণ্ট ফিজিক্যাল শক আবার এলোমেলো যন্ত্রটাকে চালু করে দিয়েছে। অনেক সময় যেমন বন্ধ ঘড়ি হঠাৎ ঝাঁকুনি লেগে আবার চলতে সুরু করে দেয়।

—তা হোক। ভালো হওয়া নিয়ে কথা। আপনি জীবনে সুখী হোন মশাই, এই কামনাই আমরা করি।

—সুখ? কিরণ আবার হাসতে চেষ্টা করল: ও জিনিসটা ঠিক বুঝি না, মানুষ কোথা থেকে কী ভাবে যে পায় তাও জানি না।

কিন্তু প্রতিমা সেরে উঠলেই কি সব কিছুর জট খুলে যাবে? তার যে মনটা এমন করে তাকে পাগলামির অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সে মন তো বদলাবে না। আবার কোথায় একটা নতুন ঝাঁকুনি লাগবে, চলতি ঘড়িটা হয়তো ফের এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে রাজেনবাবু বললেন, কিছু মনে করবেন না। সেই ঝাঁকুনিটা যাতে না লাগে সেদিকে তো আপনিও দৃষ্টি দিতে পারেন, মানে সাধ্যমতো সজাগ থাকতে পারেন।

কিরণ বললে, পারি। কিন্তু পৃথিবীর সবই কি ঠেকাতে পারি আমি? কোনো গাছ যদি বাতাস থেকেও বিষ টেনে নিয়ে নিজের ডালে পাতায় ছড়িয়ে দেয়, তাকেও কি রক্ষা করবার শক্তি আমার আছে?

কথাটা রূপকের মতো ঠেকল। রাজেনবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না, কিরণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ঠিক এমনি সময় পাশের টেলিফোনটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

রাজেনবাবু রিসিভার তুললেন।

—মেট্রোপলিস পাবলিশার্স। রাজেন ব্যানার্জী বলছি।

ফোনের আর একপ্রান্ত থেকে মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল: আপনাদের একজন অথরের অ্যাড্রেস আমাকে দিতে পারেন?

—বলুন।

—আমি—আমি—কিরণ বসুর ঠিকানা চাইছি—।

কিরণের দিকে মাথা ঘুরিয়ে রাজেনবাবু হাসলেন। বললেন, কিরণবাবু এখন এখানেই বসে আছেন। তাঁকেই ফোনটা দেব কি?

ফোনের ওধারে হঠাৎ স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ভীরু অনিশ্চিত গলায় মেয়েটি বললেন, না—থাক, তাঁকে আর বিরক্ত—আচ্ছা, দিন একবার।

রাজেনবাবু কিরণের দিকে রিসিভার বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আপনারই ফোন।

—কে ডাকছে ?

—একটি মহিলা। আপনার অ্যাড্রেস চাইছিলেন।

—অ্যাড্রেস দিলেই পারতেন, আবার ধরিয়ে দিলেন কেন ? মেয়েরা কথা কইতে শুরু করলে আর ছাড়ে না—বিরক্ত হয়ে কিরণ টেনে নিলে : কিরণ বোস বলছি।

ফোনের ওপারে আবার কয়েক সেকেণ্ড অনিশ্চিত স্তব্ধতা জমে রইল। তার একটা দ্রুত নিশ্বাসের সঙ্গে শোনা গেল প্রায় অস্পষ্ট গলার স্বর : আমি—আমি শর্মিলা।

—কে ?—সমস্ত স্নায়ুকে উদগ্র চঞ্চল করে কিরণ জিজ্ঞেস করল : কে ?

—শর্মিলা। শর্মিলা রায়চৌধুরী।

রাজেনবাবু কী ভাবছেন,কী অর্থ করে নিচ্ছেন—তার কোনো কিছু কিরণ চিন্তা করতে পারল না। রুদ্ধশ্বাসে বললে, আপনি—তুমি কলকাতায় ?

—কাল এসেছি।—আবার টেলিফোনে কয়েকটা দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ল : আজ সন্ধ্যায় একবার দেখা হতে পারে ?

—নিশ্চয় পারে। দেখা আমায় করতেই হবে। তুমি কোথায় আছো ?

—আমার মামার বাড়িতে। সেভেনটি ফাইভ ওয়ান ·এ একডালিয়া রোড, ধরুন সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ—

—আমি আসব, আমি আসব। কিন্তু তুমি ফোনটা ছেড়ে দিও না—একটু ধরো, ঠিকানাটা আমি লিখে নিচ্ছি।

॥ বাইশ ॥

কলকাতায় আসবার সময় হাওড়া স্টেশনে নেমেই চমকে গিয়েছিলেন শর্মিলা। সামনের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট থেকে নামছেন প্রভাকর।

—ডক্টর ভৌমিক—আপনি ?

প্রভাকর হাসলেন ঃ পৃথিবী গোলাকার।

কলেজের প্রেসিডেণ্টও প্রভাকরকে ভালো করেই চিনতেন। বললেন, কখন উঠলেন দেখি নি তো ?

—মুরিতে। রামগড় গিয়েছিলুম, ওখানে টেলিগ্রাম পেলুম একটা জরুরি কনফারেন্স আছে কলকাতায়। আপনারা ?

—কতকগুলো পার্চেজের জন্যে। মিসেস রায়চৌধুরীর ডিপার্ট-মেণ্টের অনেক জিনিসপত্র কিনতে হবে, তাই ওঁকে সঙ্গে করে আনলুম।

—খুব ভালো।—প্রভাকর হাসলেন, কোমল ভাবে চেয়ে রইলেন শর্মিলার দিকে। শর্মিলার মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

তিনজনে তিন জায়গায় উঠবেন। প্রেসিডেণ্ট যাবেন বড়-বাজারের একটা হোটেলে, শর্মিলা যাবেন একডালিয়া রোডে বড়-মামার বাড়ি, প্রভাকর যাচ্ছেন তাঁর কাকার ওখানে। স্টেশনে প্রভাকরের জন্যে গাড়ি এসেছিল।

প্রভাকর বললেন, বাইরে গিয়ে আবার ট্যাক্সির জন্যে কিউ করবেন কেন ? আমার গাড়ি তো খালি ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। চলুন পৌঁছে দিই আপনাদের।

বুড়ো প্রেসিডেণ্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ঃ থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর ভৌমিক—আপ মুঝে বচা দিয়া। কলকাত্তেমে ই ট্যাক্সি বিজনেস—

বড়া খতরনাক। এই জন্যেই আমার এখানে আসতে ইচ্ছে করে না।

শর্মিলা তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা সংকোচের আড়াল কিছুতেই যেতে চাইছে না।

প্রভাকর বললেন, কী হল ?

—আমি বরং একটা ট্যাক্সি—

—একটি ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওদিকের শেডের তলায়। কেন মিথ্যে কষ্ট করবেন :

প্রেসিডেন্ট বললেন, ঠিক বাত। ডক্টর ভৌমিক ভি তো বালীগঞ্জ জা রহা হ্যায়। চলিয়ে মিসেস রায়চৌধুরী—ঝুটমুট ঘণ্টাভর কেঁও ঠহরেগী ?

শর্মিলা চুপ করে রইলেন। এর ওপর তর্ক চলে না। প্রভাকর কুলিদের ডাক দিয়ে বললেন, উঠাও সামান—কার পার্কমে চলো।

শর্মিলাকে মামার ওখানে নামিয়ে দিয়ে প্রভাকর চলে গেলেন হিন্দুস্থান পার্কে। গাড়িতে যে সামান্য দুটো-চারটে কথা হয়েছিল, তারই জের টেনে বললেন, তা হলে দিন তিনেক আছেন ?

—হ্যাঁ বুধবারে ফিরে যাবো। আপনি।

—আমার কিছু ঠিক নেই। দু'দিন কনফারেন্স—অন্য কাজ না জুটলে পরশুই ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে। যদি সময় পাই, দেখা করে যাব আপনার সঙ্গে।

—নিশ্চয় আসবেন, খুব খুশি হবো।

—দেখি—মৃদু হেসে প্রভাকর চলে গেলেন।

দুটো দিন কেনাকাটার ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল শর্মিলার। প্রভাকরের কথা আর মনে পড়ল না। কিন্তু একটা চাপা অস্বস্তি, রক্তের ভেতরে একটা মৃদু মর্মর সব সময় বেজে চলতে লাগল; একদিন যে মানুষটার আদিম বন্য আকর্ষণে শর্মিলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে

পালিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে তারই কত কাছে চলে এসেছেন তিনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই কলকাতা—পথেঘাটে দম আটকানো ভিড়, ট্রাম-বাস মোটরের নিরবচ্ছিন্ন ছুটোছুটি, তবু এরই ভেতরে—যে কোনো একটা চকিত মুহূর্তে কিরণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যেতে পারে। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বই কিনতে গিয়ে রক্তের সেই মৃদু মর্মর যেন ঝড়ের অরণ্য হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল তাঁর। এই তো সারি সারি প্রকাশকের দোকান—এখানে লেখকদের সব সময় আনাগোনা, এখানে যে-কোনো মুহূর্তে—

নিঃসন্দেহ, যে কোনো মুহূর্তে। ওই যে সোনার ফ্রেমের চশমা, রোগা কালো মানুষটি গাড়িতে উঠিলেন—শর্মিলা রোমাঞ্চিত হয়ে চিনলেন: তারাশঙ্কর! অনেকবার অনেক ছবি দেখেছেন, ভুল করবার কারণ নেই। ফুটপাথে যে ছোটোখাটো প্রশান্ত চেহারার লোকটিকে ঘিরে পাঁচ-ছ'টি ছেলে কথা কইছে—উনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। রাঁচীতেই একটা সাহিত্য-সম্মেলনে ওঁকে দেখেছিলেন শর্মিলা। এঁদের মাঝখানে কখন আর একটি মানুষ—

প্রেসিডেন্টের কথায় তাঁর চমক ভাঙল।

—কী হল, মিসেস রায়চৌধুরী? দাঁড়িয়ে গেলেন কেন?

লজ্জিত হয়ে শর্মিলা বললেন, না—কিছু নয়।

দু'দিন এভাবে কাটল, কিন্তু তৃতীয় দিনে মন আর বশ মানল না। সব চেষ্টা, সমস্ত বিচারবোধকে ছাপিয়ে একটা অন্ধ আবেগের উচ্ছ্বাস উঠে তিলে তিলে তাঁকে গ্রাস করতে লাগল। ফিরে যাবেন? অন্তত একটিবারও দেখা না করে ফিরে যাবেন? হয়তো আর পাঁচ বছরের ভেতরেও তাঁর কলকাতা আসা সম্ভব হবে না, হয়তো এই তাঁর শেষ সুযোগ।

নিজের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন শর্মিলা, উদ্দাম মনটাকে শক্ত মুঠোয় চেপে রাখতে চাইলেন, ইচ্ছে করল যে কোনো একটা নিষ্ঠুর শারীরিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে এই আবেগটাকে তিনি স্তব্ধ করে

দেন। কিন্তু কিছুই হয়ে উঠল না। অন্ধ ইচ্ছার আকুলতা শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তি ঠেলে তুলল মনের সামনে।

ভারি অন্যায় হয়েছে, অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করা হয়েছে কিরণের সঙ্গে। লোক যে যেমনই হোক, যে চোখেই সে মানুষকে দেখুক, একটা উপন্যাস ছাপা হয়ে গেল তাকে ভুলে যাওয়ার মতো কৃষ্ণ-চূড়ার দিনগুলোকে যেমন করেই পেছনে ফেলে যাক—শর্মিলা তো তাকে কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আসবেন নদীর ধারে, দেখা করবেন তার সঙ্গে। কিন্তু নিজের মনের তাড়নাতেই শর্মিলা কথা রাখেন নি, পালিয়ে গেছেন ভীতুর মতো, কয়েক লাইন সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে দিয়ে নিজের দুর্বলতার চেহারাটাই কিরণের কাছে মেলে ধরছেন।

তার অর্থ হার মেনেছেন শর্মিলা। ছোট হয়ে গেছেন কিরণের কাছে।

কিন্তু এ-ভাবে পরাজয় স্বীকার করা নয়! তিনি দেখা করবেন কিরণের সঙ্গে, সহজভাবে ভদ্রতার আলাপ করবেন, কয়েকটা দিনের দুর্বল দীনতাকে কাটিয়ে উঠেছেন—পরোক্ষ ভাবে সেইটেই তাঁকে জানিয়ে যাবেন। নিজের কাছ থেকে মুক্তি পাবেন, দূরে থেকেও কিরণের অদৃশ্য আকর্ষণ আর তাঁকে বিড়ম্বিত করবে না।

যুক্তিটা ক্রমশ একটা সুপষ্ট আকার নিতে লাগল। তৃতীয় দিনে ডিরেকটারী খুঁজে ফোন করলেন কিরণের প্রকাশককে।

দ্বিধা এল, গলা কাঁপল, তারপর বুকের স্পন্দন যেন থেমে যেতে চাইল। লাইনের ওপার থেকে ভেসে এল কিরণের গলার স্বর। সমস্ত যুক্তিতর্ক তলিয়ে গেল সেই বন্যার আড়ালে, একটা তারবাঁধা যন্ত্রের মতো তাঁর সারা দেহমন একসঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

কী বললেন ভুলে গেলেন শর্মিলা, কিরণের সব কথা গুলো যেন স্পষ্ট করে শুনতে পেলেন না তিনি। ফোন নামিয়ে রেখে বসে পড়লেন সোফার ওপর, দু'হাতে নিজের কপালটা চেপে

ধরলেন। মাথার ভেতরে সব ঝাপসা হয়ে গেছে, শুধু নিয়মের চঞ্চল আলোর মতো দপ্ দপ্ করে একটি উপলব্ধি : কিরণ আজ আসবে, আসবে সন্ধ্যা ছ'টার পরে।

শেষবার তার শুভচেতনা বলে উঠল—পালানো উচিত, ছ'টার আগেই কলকাতা ছেড়ে পালানো উচিত। একটা দারুণ দুঃখের নিয়তিকে তিনি অকারণে আহ্বান করে আনছেন, এ তাঁকে কোথাও নিয়ে যাবে না।

কিন্তু—

কিরণ ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, সাড়ে চারটে। মিডিক্যাল কলেজ কাছেই, একবার প্রতিমাকে দেখে আসা যেতে পারে। সওয়া পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় বেরুলেই সময়মতো শর্মিলার ওখানে পৌঁছানো যাবে।

প্রতিমার এতোদিনের বিলুপ্ত চেতনা একটা সন্ধিলগ্নে এসে দুলছে এখন। মাথায় সেই চোটটা লাগবার ফলে বিকল যন্ত্রটা যেন একটু একটু করে চলতে শুরু করেছে, অল্প অল্প মানুষ চিনতে পারে মনেহয়। সেই শূন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে থেকে থেকে কিসের ছায়া পড়ে চোখ পিট পিট করে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন কিছু একটা বুঝতে চাইছে সে।

ডাক্তারেরা বলছেন, একটা ভায়োলেণ্ট শক-থেরাপী হয়ে গেছে। এখন কিছু বলা যায় না। হয়তো সাময়িকভাবে ভালো হয়ে যেতে পারেন, একেবারে ভালো হয়ে যেতে পারেন, আবার যেটুকু চেতনা ভেসে উঠেছে তা আবার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারে।

কী চায় কিরণ ?

আজ ক'দিন ধরেই নিজেকে প্রশ্ন করছে, সে কী চায় ? প্রতিমা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাক ? বিয়ের পর দুটি বছর যেমন করে সুধায়

ভরে দিয়েছিল তেমনইভাবে উজ্জ্বল বিকশিত হোক? আর তা যদি না হয়? যদি আবার সেই অবিশ্বাস আর সন্দেহের কালো ছায়াটা ঘনিয়ে আসতে থাকে, আবার যদি নিজের বিষে তিলে তিলে সে জ্বলতে আরম্ভ করে, তা হলে—

তা হলে যন্ত্রণার সেই কুম্ভী পাকের চাইতে এই অচেতনাই তার ভালো। সেই প্রতি পলের মৃত্যুর চেয়ে এই জীবন্ত মৃত্যুই তার পক্ষে সুখের। কিরণের পক্ষেও।

ভাবতেই কিরণ চমকে উঠল। এই কি তার অচেতন মনের কামনা? সে কি চায় না—প্রতিমা আর কখনো ভালো হয়ে উঠুক? অরবিন্দের সেই ডিভোর্স প্রস্তাবে মুখে সে যাই বলুক, তার মনের কথাটা সম্পূর্ণ আলাদা।

কিরণের পিঠে কে যেন চাবুক হানাল। এক মুহূর্তের জন্যে তার পা থমকে গেল মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে।

হাতের ঘড়িতে চারটে পঁয়ত্রিশ। ছ'টার মধ্যেই শর্মিলার ওখানে তার যাওয়ার কথা তার আগে তার প্রতিমাকে অন্তত কিছুক্ষণ দেখে যাওয়া উচিত। সেটা তার কর্তব্য।

শুধু কর্তব্য?

কিরণ জোরে পা চালিয়ে দিল ভিতরে। আর কোনো কথা সে ভাববে না।

কেবিনে অরবিন্দ বসেছিল। কিরণকে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

—এসো, সাহিত্যিক।—তারপর গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললে, অনেকটা নর্ম্যাল।

—নর্ম্যাল?

প্রতিমা পাশ ফিরে শুয়েছিল, হঠাৎ উঠে বসল। তার সেই আচ্ছন্ন অবশিষ্ট চোখের উপর দিয়ে যেন পর পর বিদ্যুৎ চমকে গেল খানিকটা। তারপর তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে বললে তুমি—তুমি!

কিরণ শক্ত হয়ে গেল।

—আমাকে চিনতে পারছ প্রতিমা ?

—কেন চিনতে পারব না, আমি কি পাগল ?—চোখের বিদ্যুতের ওপর চকিতে কয়েকটা বৃষ্টির বিন্দু ঘনিয়ে এল : আমার খুব অসুখ—আমি দেখতে বিশ্রী হয়ে গেছি তাই তুমি আমাকে ঘেন্না করো না ? তাই বুঝি আমার কাছে তুমি আসতে চাও না ?

কে বলছে আমি আসি না ? প্রায় রোজই তো আসি। তুমি ঘুমিয়ে থাকো, তাই আমাকে দেখতে পাও না।

—আর আমি ঘুমোব না।—একটা আকুল উত্তপ্ত মুঠোতে, শীর্ণ আঙুলে প্রতিমা কিরণের হাত চেপে ধরল, আজ তোমাকে আমার কাছে ধরে রাখব, কোথাও যেতে দেব না। তুমি বসো, বসো আমার কাছে।

রোগা শরীরের সব শক্তি দিয়ে প্রতিমা তাকে টেনে বিছানার ওপর বসিয়ে দিলে।

গলা খাঁকরি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অরবিন্দ। সমস্ত মুখ তার উজ্জ্বল আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে, আচ্ছা—তুমি একটু তা হলে ওর কাছে বোসো সাহিত্যিক, আমি বাইরে থেকে একটা সিগারেট খেয়ে আসছি।

ছ'টা—সাড়ে ছ'টা—সাতটা—সাড়ে সাতটা—

অনেকক্ষণ ধরে বারন্দায় পায়চারি করে রেলিং ধরে রাস্তায় ঝুঁকে থেকে থেকে সাড়ে সাতটায় শর্মিলা এসে আবার বসে পড়লেন সোফার উপর। আবেগের বন্যাটা এখন গ্লেসিয়ারের মতো স্তব্ধ আর শীতল হয়ে গেছে। এখন নীচের ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছিল শর্মিলার। ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে। কিরণের সামনে নিজের দীনতাকে কাঙালের মতো মেলে ধরেছিলেন, আর চূড়ান্ত

অপমানে সে তার জবাব দিয়েছে। একদিন তাকেও নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন সেই ঋণ আজ সে শোধ করে নিয়েছে।

কেন টেলিফোন করেছিলেন? কেন কিরণকে তাঁর কাছে আসবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন? লজ্জায় অপমানে তাঁর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। সব জেনে সব বুঝে কেন এত বড়ো গ্লানি শর্মিলা টেনে নিলেন নিজের ওপর? কী লাভ হল, কী পেলেন?

নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে চাইলেন নিজেকে, একটা ভয়ঙ্কর কোনো শারীরিক যন্ত্রণা কামনা করলেন, সামনে টেবিলে থেকে পেতলের ফুলদানিটা তুলে নিয়ে আঘাত করতে চাইলেন মাথার ওপর। এর পরে নিজের মুখোমুখি কেমন করে আর দাঁড়াবেন শর্মিলা, এ গ্লানি তিনি কেমন করে ভুলবেন? শর্মিলার মনে হল, বিশ্রীভাবে একটা চিৎকার করে উঠবেন তিনি। ঠিক সেই সময় মামা এসে ঘরে ঢুকলেন।

—খুকু, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন তোর সঙ্গে।

শর্মিলার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে!

—কে?

—বললেন, রাঁচীর লোক। প্রভাকর ভৌমিক।

প্রভাকর! নিস্তব্ধ গ্রেসিয়ারে যেন কেউ এক ঝলক আগুন ছিটিয়ে দিলে। যেন একটা দুরন্ত শক্তি এসে সবেগে অন্ধকারের রুদ্ধ দুয়ার খুলে ফেলল। তীরবেগে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে শর্মিলা। ডেকে আনো মামা, ডক্টর ভৌমিককে ডেকে আনো এখানে।

॥ তেইশ ॥

কিরণ এসেছিল রাত সাড়ে আটটায়।

দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা দেরি করে আসবার কোনো অর্থ হয় না, এমন ভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবার রেওয়াজ কোনো দেশে নেই। তা ছাড়া এ তো শুধু শর্মিলার সঙ্গে দেখা করাই নয়। আজকের এই সাক্ষাতের মূল ছিল রক্তের গভীরে, আজ এই সন্ধ্যাটা জীবনকে আর এক দিগন্তের দিকে এগিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সুধু লগ্নই যে বয়ে গেল তা নয়, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার সঙ্গে কিরণ অনুভব করল, কোথায় যেন চিরদিনের মতো একটা পর্দা পড়ে গেল, সুরু না হতেই সারা হয়ে গেল এমন একটা অধ্যায়—যা হয়তো তাকে আর একটা নতুন জগতে পৌঁছে দিতে পারত।

শর্মিলা নেই।

শর্মিলার মামা বললেন, সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বাড়িতেই তো ছিল। তারপর এক ভদ্রলোক এলেন—তার সঙ্গে এই আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেল।

—কখন ফিরবেন ?

—কিছু বলে যায় নি।

—ওঃ!—কিরণ ফেরবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, ভদ্রলোক আবার ডাকলেন।

—কিছু বলতে হবে ? কোনো কথা আছে ?

—না, কোনো দরাকর নেই। আমি এমনিই এসেছিলুম। আচ্ছা—নমস্কার।

কয়েক পা এগিয়ে এসে কিরণ ট্রাম ধরল। টার্মিনাস থেকে সবে ছেড়েছে, গাড়িটা এখনো ফাঁকা। একেবারে সামনের সীটে এসে পড়ল কিরণ, দু হাতের ভেতরে মাথা গুঁজল।

একেবারে জন্যে মনে হল, ভদ্রলোকের টেলিফোন নম্বরটা নিয়ে এলে হত, কাল সকালে শর্মিলাকে বলা যেতে পারত, দেরি সে ইচ্ছে করে করে নি, যা ঘটেছে তার ওপরে তার নিজের কোনো হাত ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল কী হবে?

কী হবে?

আজ সন্ধ্যায় কোনো নিরিবিলি একটুখানি অবকাশে, কোনো গাছের ছায়ায়, একফালি জলের ধারে হয়তো শর্মিলাকে নিয়ে সে কিছুক্ষণ রোমান্টিক হয়ে উঠত। কৃষ্ণচূড়ার দেশে যে কথা তার বলা হয় নি, সেইকথাগুলো বলা যেতে পারত, হয়তো এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা মগ্ন হয়ে বসে থাকা যেত, কিন্তু তারপর?

একদিন অরবিন্দের অনুরোধেও সে প্রতিমাকে ডিভোর্স করতে রাজী হয় নি। ভালোবাসার জন্যে? না—নিজের কাছে অতখানি মিথ্যাবাদী হতে রাজী নয় কিরণ। প্রতিমাকে ভালো সে বেসেছিল কিন্তু তার কাচের ঘর প্রতিমাই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে। অর্থহীন সন্দেহ, অকারণ বিদ্বেষ, মনোমন্থনের বিষ—সব মিলে কী নিদারুণ যন্ত্রণা। তারপর প্রতিমা নিজেই একদিন অন্ধকারের অতলে ডুবল। সেই থেকে কিরণ এক ধরণের আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটিয়ে এসেছে। সে অনুভূতির মুক্তিব নয়, বেদনারও নয়, যেন তীব্র জ্বরের ঘোরে স্নায়ুগুলো অভিভূত হয়ে থাকা।

আর কিরণ দিনের পর দিন কাটিয়ে গেছে। মনের একটা বঞ্চিত ক্ষুধিত জগৎকে নির্বাসনে সরিয়ে রেখে, অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করেছে, বই লিখেছে, গল্প লিখেছে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে, সাহিত্য নিয়ে তর্ক করেছে। লেখার ভেতরে নিজের অজ্ঞাতেই কখনো কখনো বিষ জমে উঠেছে হয়তো, কিরণ অকারণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কুটিল হয়েছে, সে চিরদিনের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধক নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকার করেছে। এই কলকাতা, এই বেঁচে থাকা, মানুষে মানুষে প্রতিদিনের সম্পর্ক, চোখের কালো চশমার ভেতর

দিয়ে আদিম অরণ্যের তমসায় মিশে গেছে, পায়ের নীচের মাটিকে মনে হয়েছে সরীসৃপের বিবর-ছিদ্রিত, মাথার ওপর কালো আকাশ একটা রোমশ ভালুকের মতো নক্ষত্রে নক্ষত্রে কতকগুলো ধারালো নখের নির্মমতা ছড়িয়ে দিয়েছে।

সব কিছুর মূলে একটি সত্য। নিজের যন্ত্রণায় পৃথিবী বিষাক্ত।

ঠিক কথা, রোমান্টিক সে কোনোদিনই নয়। রাজহাঁসের পালক খুঁজে না পাওয়ার সেই ছেলেবেলা তাকে সেই যে সচেতন করে তুলেছিল সে শিক্ষাও তার ভোলার নয়। কিন্তু তবু, কয়েকটা স্বাভাবিক পাওয়ার ওপরে তার দাবি আছে। শুধু চিন্তাই তাকে মুক্তি দিতে পারে না, শুধু বুদ্ধিই মানুষের শেষ আশ্রয় নয়।

তা যদি হত, তা হলে 'ভেন্যু নোয়ার' কে কেন্দ্র করে অমনভাবে শর্ল বোদল্যায়ের জীবন বিষিয়ে উঠত না, জঁা হ্যু ভাল তাঁকে অমন-ভাবে রাহুগ্রাসে নিঃশেষ করে নিত না; অমন করে নিজের কান কেটে গণিকার জন্যে অর্ঘ্য সাজাতে হত না ভ্যান গখ্‌কে। আমি যে রঙেরই ফুল ফোটাতে চাই, একটু মাটি যদি না থাকে, কোথায় আমি শিকড় মেলব, কোথা থেকে জীবনের রস পাব?

তবু শূন্যতাও অভ্যাস হয়ে যায়, যেমন কিরণের হয়ে গিয়েছিল। তারপরে সেই কৃষ্ণচূড়ার ক'টি দিন হঠাৎ নিজের ভেতরের ফাঁকটা হা হা করে উঠল, সেই পড়ন্ত বিকেলে কোথা থেকে ছবির মতন দেখা দিলেন শর্মিলা। দূরের পাহাড় সেই নদীটি, মহাকালের চূড়োয় সেই উজ্জ্বল হলুদের উৎসব—কিছুক্ষণের স্বপ্ন। সে স্বপ্নের ঘোর এখনো কাটল না—কলকাতা তার সমস্ত কালো দিয়েও তার রংটুকু মুছে নিতে পারল না।

কিন্তু কী লাভ?

প্রতিমাকে সে ডিভোর্স করতে চায় নি। দুটো কারণ ছিল তার। একদিকে আত্মসম্মানের প্রশ্ন—তার জন্যে অরবিন্দ পর্যন্ত অনুকম্পা বোধ করছে, সেই গ্লানি, অন্যদিকে একটা করুণা

—প্রতিমার সেই ধূসর উদাস নিঃসঙ্গতার দিকে তাকিয়ে একটা সীমাহীন মমতা। সেও যদি সুযোগ বুঝে প্রতিমাকে ত্যাগ করে, তা হলে শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে সে, কার কাছে দাঁড়াবে?

তা সত্ত্বেও শর্মিলার জন্যে কোথায় একটা প্রত্যাশা ছিল, কোথায় যেন একটা জায়গা ছিল তাঁর জন্যে। কিন্তু এখন? প্রতিমার চেতনা একটু একটু করে স্বাভাকি হয়ে আসছে—এতদিনের অন্ধকার থেকে একটু একটু করে ফুটে উঠছে আলোর সীমারেখায়। হয়তো ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ভালোও হয়ে উঠবে। তখন?

তখন শর্মিলার সঙ্গে কিসের যোগ রাখবে সে? কোন্ সম্পর্ক থাকবে?

আজ চেতনার সীমান্তে ভেসে উঠে প্রতিমাই তো বাধা দিয়েছে সকলের আগে। কিরণ ভেবেছিল, আধঘণ্টা পরেই যে উঠে পড়বে হাসপাতাল থেকে, কিন্তু প্রতিমাই আসতে দেয় নি। সেই যে অরবিন্দ তাকে বসিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেল গেল সিগারেট খেতে, তারপর প্রতিমা দুহাতে তার ডান হাতখানা শক্ত বাঁধনে জড়িয়ে রাখল।

—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

—আমি তো তোমার কাছেই ছিলুম, প্রতিমা।

—তা হলে আমি কেন তোমায় দেখতে পাই নি?

—দেখেছিলে, ভুলে গেছ। তোমার অসুখ করেছিল কিনা।

এখন আমি ভালো হয়ে গেছি তো?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

—তুমি আমার কাছে থাকবে, কখনো ছেড়ে যাবে না?

—না—না।

একবার নয়, বারবার এই আশ্বাস দিতে হয়েছে প্রতিমাকে। চেতনা যখন একটু একটু করে জাগতে সুরু করেছে, মন যখন শিশুর

মতো অবুঝ আর অসংলগ্ন—তখন বারবার করে বোঝাতে হয়েছে—আমি আছি, পাশে পাশেই আছি, এই ভাবেই থাকব অনন্তকাল ধরে। আর থেকে থেকে চোখ পড়েছে ঘড়ির দিকে, পাঁচটা—ছ'টা—সাড়ে ছ'টা—সাতটা।

নার্স এল, প্রতিমাকে খাইয়ে গেল, তারপর ঘুমিয়ে পড়তে আরো আধঘণ্টা। ছুটি। এইবারে যাওয়া যেতে পারে শর্মিলার কাছে। ছ'টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখা যেতে পারে রাত সাড়ে আটটার সময়।

কিন্তু শর্মিলা অপেক্ষা করেন নি।

ভালোই হয়েছে—এই সব চেয়ে ভালো হয়েছে—নিজেকে প্রাণপ্রণে বোঝাতে চাইল কিরণ। যতক্ষণ প্রতিমা তার অন্ধকারে মগ্ন ছিল, যতক্ষণ ডিভোর্সের জন্যে অরবিন্দের প্রস্তাব ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের কাছে অপরাধ-বোধ তীক্ষ্ণ ছিল না—এমন কি, শর্মিলাকে নিয়ে একটা রোমান্টিক সন্ধ্যা কাটাবার সম্পূর্ণ অধিকারই ছিল তার। কিন্তু এখন কি আর সে দাবি করা চলে? আজ যদি দেখা হত, তা হলে প্রতিমার ওপব বিশ্বাস ঘাতকতা করত সে, প্রতিটি তন্ময় মুহূর্তকে একটা চিন্তাই বিদ্ধ করত কাঁটার মতো; সে যেন একটি নিরীহ শিশুর অসহায় সরলতাব সুযোগ নিয়ে চোরের মতো তার গলার হার আর হাতের বালা খুলে নিচ্ছে।

এই ভালো হল যে একটা অধ্যায়ের ওপর সম্পূর্ণ করে যবনিকা পড়ে গেল। কিরণ বাঁচল।

বাঁচল?

—টিকেট?

চমকে মাথা তুলল সে। পাশে এসে হাত বাড়িছে ট্রামের কণ্ডাক্টার, গাড়িটা ভরে উঠেছে, পার হয়ে চলেছে ভবানীপুর। বাইরে কলকাতা। অনেক মানুষ আর অনেক মনের সেই আদিম অরণ্য।

মেসে ফিরে পেল বাণীব্রতের চিঠি। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে গলানো।

'দাদা, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আপনার জন্যে। বিকেলে ভবেশবাবু মারা গেছেন। কাকে কাকে খবর দিতে হবে জানি না, আমি আরো কয়েকজন সাহিত্যিকের কাছে যাচ্ছি। আপনি আসবেন নাকি একবার?

ভবেশদা মারা গেছে! একবারের জন্যে হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। মনে পড়ল তাঁর স্ত্রীর মুখ, মনে পড়ল বাচ্চাগুলোর কথা। দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল কিরণ।

যাবার মুখে ম্যানেজারকে বলে গেল, রাতে বোধ হয় আজ আর ফিরতে পারব না।

॥ চব্বিশ ॥

অনেক বেশি শোকের উচ্ছ্বাস আশা করেছিল কিরণ, কিন্তু গিয়ে দেখল একটা শান্ত স্তব্ধতার ভেতরে সব একাকার হয়ে আছে। ছেলেমেয়েগুলো বারান্দায় চুপ করে বসে রয়েছে, ব্যাপারটাকে তারা যেন বুঝতেই পারে নি। ভবেশদার পায়ের কাছে বৌদি একটা পলকহীন পাথরের মূর্তি। চোখে শুকনো জলের রেখাটি পর্যন্ত নেই। কিরণের মনে হল, বৌদির কাছে ভবেশদার মৃত্যুটা অনেকদিন আগেই ঘটে গিয়েছিল, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আজ তার উৎসটা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

চারদিকের কুৎসিত দারিদ্রের ভেতর ভবেশদার শীর্ণ চেহারাটা অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়েছে। যে লেখক শুধু নিজের জন্যেই লিখে গেল, কোনোদিন যে জনপ্রিয় হতে চায় নি, শুধু সাহিত্যের ওপর নির্ভর করেই বাংলা দেশে যে বাঁচবার চেষ্টা কবেছিল, এ ছাড়া কোন্ মৃত্যু তার পক্ষে শোভন হতে পারত!

বাণীব্রত খবর দিয়ে জনকয়েক লেখককে যোগাড় করে এনেছে তাদের মধ্যে তরুণের সংখ্যাই বেশি। অনেকখানি জীবনীশক্তি আছে বলে তারুণ্যই মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে পারে। প্রবীণেরা ভয় পান—একজনের মৃত্যুর দর্পণে তাঁরা নিজেদের প্রতিফলন দেখতে পান। তাই বয়স্ক লোকেরা বিশেষ আসেন নি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভবেশদা কখনো মিশতেন না, অবজ্ঞাই করতেন বরাবর, কিন্তু মৃত্যু সব বিরোধ মুছে দিয়েছে—তারা হাজির হয়েছে দল বেঁধে। স্থানীয় বয়স্কেরাও এসেছেন—এরই মধ্যে শান্ত চেহারার একজন প্রৌঢ়ের সঙ্গে কিরণের পরিচয় করিয়ে দিলে বাণীব্রত: আমার বাবা।

বাণীব্রতের বাবা সত্যব্রত—নামটা কিরণের আগেই জানা ছিল—বললেন, আপনার কথা ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক শুনেছি, আলাপ করবারও খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এমন অবস্থা দেখা হল, যে—

বলতে বলতে থেমে গেলেন। চোখ ছলছল করে উঠল সত্যব্রতের। এই দারিদ্র্য আর মৃত্যুর ছবিটা তাঁকে নাড়া দিয়েছিল।

কিছু ফুল এসেছে, দুটি মেয়ে চন্দন দিয়ে সাজাচ্ছিল ভবেশদাকে। কিরণ দেখল, তাদের একজন কৃষ্ণা। কিরণ ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

সাহিত্যিকদের মধ্যে টুকরো টুকরো আলোচনা। চাপা গলাতেই চলছে।

—খুব কষ্ট পেয়েছেন ভদ্রলোক।

—বলতে গেলে না খেয়েই মারা গেলেন।

—দোষ নিজেরও ছিল খানিকটা। এত একগুঁয়ে হলে—

কিরণ সরে এসে খানিকটা শীর্ণ ঘাসের ওপর বসে পড়ল। দোষ ভবেশদার অনেক ছিল, সন্দেহ নেই কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কথা—একটা চরিত্র ছিল। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর চরিত্র নিয়ে

একা সৈনিকের মতো লড়াই করে গেলেন, একবারের জন্যেও নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবলেন না। সেদিনকার কথাগুলো মনে পড়ল—ভবেশদা বলেছিলেন।

'স্ত্রী ছেলেমেয়ে ? বাড়ি তো আমার পাকিস্তানে, নয় পাকিস্তানী রিফিউজীদের মতো ভিক্ষে করেই খাবে।'

স্বার্থপর ? অবিবেচক ? না—সে অপবাদ ভবেশদাকে কেউ দেবে না। কাঁধছেঁড়া ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী, মোটা ধুতি, পায়ে সস্তা দামের চটি ; বিড়ি ছাড়া সিগারেট কখনো খান নি। নিজের জন্যে একটা পয়সা অপব্যয় করেন নি কোনোদিন, যা পেয়েছেন সংসারের জন্যেই খরচ করেছেন।

ভবেশদার অপরাধ, তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। নিজের বিশ্বাসের বাইরে একটি কথা লিখতে চান নি কোনোদিন।

এই রকম একটা মৃত্যু কিরণ কামনা করতে পারে কোনোদিন ? সে সাহস কি তার আছে ? সেও তো সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের একটা নিষ্ঠুর বাস্তব ইতিহাসকে ফোটাতে চেয়েছিল, সে কাজ সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে ? তার সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণ নির্মমতার মধ্যেও কি একটা চোখ সব সময় মেলা থাকে নি পাঠকের দিকে ? সেও কি নিজের বিশ্বাস আর পাঠকের প্রত্যাশার ভেতরে একটা চুক্তি করে নেয় নি ? তা না হলে কৃষ্ণা-বাণীব্রতর কেন ভবেশদার লেখা ভালো লাগে নি, কেন শর্মিলা তার মুগ্ধ পাঠিকা হয়ে—

শর্মিলা ! কিরণ চিন্তার গতিটাকে তৎক্ষণাৎ যেন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে থামিয়ে দিতে চাইল। আর তখন ব্যতিব্যস্ত বাণীব্রত এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

—কিরণদা !

কিরণ চমকে মুখ তুলল ঃ কী বলছ ?

—অনেক রাত হল, এবার তো নিয়ে যেতে হয়।

—বেশ, চলো।

ফুল দিয়ে খাট সাজানো হয়েছিল, এবার ভবেশদাকে তোলা হল তার ওপর। জীবনে কোনো সভায় ভবেশদা বোধ হয় মালা পান নি, মৃত্যুর পরে আর কোনো ক্ষোভ হয়তো তাঁর রইল না। আর বৌদি তেমনিভাবে চেয়ে রইলেন নিষ্পলক চোখে—তাঁর শোকদুঃখ-আবেগ যেন অনেক আগেই শূন্যের ভেতরে হারিয়ে গেছে।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল শবযাত্রা। ভবেশদার ধর্মে বিশ্বাস ছিল না—কোনো সাহিত্যিক হয়তো হরিধ্বনি দিতে বারণ করে থাকবেন। কিরণ সঙ্গে সঙ্গে চলল খানিকদূর। হঠাৎ কয়েকজন তরুণের চোখ পড়ল তার ওপর।

—দাদা, আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

শুধু ক্লান্তি নয়। শর্মিলার কাছে গিয়ে ফিরে আসা, মনের ভেতরে কতকগুলো ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা, মাথায় একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা—সব মিলে পা আর যেন চলতে চাইছিল না। তবু কিরণ ম্লানভাবে হাসল।

—না, ওসব কিছু নয়।

—কিন্তু আপনাকে কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে। —আর একজন বললে, আমরা তো অনেকেই রয়েছি—সব ঠিক করে নেব। আপনাকে আর শ্মশান পর্যন্ত যেতে হবে না, আপনি ফিরেই যান।

সত্যব্রত সঙ্গে সঙ্গেই আসছিলেন। বললেন, সেই ভালো, ফিরেই চলুন।

মাথার যন্ত্রণাটা ক্রমশ বাড়ছে—কপাল ছাড়িয়ে ঘাড়ের দুধারের শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে এখন। কিরণও আর ভদ্রতার জের টানতে চাইল না, দাঁড়িয়ে পড়ল।

—তা হলে তোমরা—

—আমরা ঠিক আছি। কোনো অসুবিধা হবে না, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন।

কিরণ ফিরল, তার সঙ্গে সত্যব্রতও ফিরলেন।

—চলুন কিরণবাবু, আমার ওখানে একটু বসবেন।

কিরণ হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল।

—আজ থাক সত্যব্রতবাবু। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে।

সত্যব্রত বললেন, আপনি এখন মোড় পর্যন্ত গিয়ে লাস্ট বাসও পাবেন না। ফিরতে হবে ট্যাক্সি করেই। বরং একটু বসবেন চলুন।

পা আর চলতে চাইতে চাইছে না, মাথার যন্ত্রণাটাও বাড়ছে। তখন কিরণের মনে পড়ল, আজ বিকেলে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত তার খাওয়া হয় নি। স্বপ্ন ছিল, শর্মিলার সঙ্গে কোথাও গিয়ে—

কিরণ জোরে নিঃশ্বাস ফেলল একবার। তারপর বললে, একটুখানি চা খাওয়াবেন তা হলে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

কৃষ্ণা দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে, তখনো বোধ হয় মৃত্যুর মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল সে ; বাবার সঙ্গে কিরণকে দেখে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

—কিরণদা? আসুন—আসুন—

—এক পেয়ালা চা খেতে এসেছি।

—বসুন, করে আনছি এক্ষুণি।

আজ আর সেদিনের মতো বৃষ্টি নেই, জলের ছাটও আসছে না। বারান্দায় খানতিনেক চেয়ার পাতা ছিল, সত্যব্রত কিরণকে সেখানেই বসালেন।

বাইরে শান্ত অন্ধকার, বাগানে লতা-পাতার শব্দ। হাওয়ায় কনক-চাঁপার গন্ধ আসছে। সামনে আকাশে তারার ভিড়। মাথার ভেতরে তীব্র যন্ত্রণার চমক ধীরে ধীরে কিরণকে কেমন আচ্ছন্ন করে আনছিল। সত্যব্রত ধীরে ধীরে কথা বলে চলেছেন, ভবেশদার মৃত্যু, সাহিত্যিকের দুর্ভাগ্য—এখন ভবেশদার স্ত্রী ছেলে-

মেয়ের কী হবে, তার দুশ্চিন্তা। অবশ্য ভবেশদার এক মামাতো ভাই খবর পেয়ে এসেছেন, তিনি অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু—

কিরণ কিছু শুনছিল, কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। সেই আচ্ছন্নতার ভেতরে মাঝে মাঝে অল্প কথায় সত্যব্রতের আলোচনার সঙ্গে সায় দিয়ে চলেছিল। এমন সময় চায়ের পেয়ালা নিয়ে কৃষ্ণা এল।

সত্যব্রত নিজের মনে কথা কয়ে চলেছিলেন, কিন্তু মেয়েদের চোখ এড়িয়ে গেল না। একমুঠো মমতা আর শঙ্কা ঝরে পড়ল কৃষ্ণার গলায়।

—কিরণদা, শরীর খারাপ নাকি আপনার।

—ও কিছু নয়, মাথা ধরেছে একটুখানি।

—মাথা ধরেছে?—সত্যব্রত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: একটা অ্যাসপিরিন জাতের কিছু—

—দরকার নেই, ওগুলো আমার ঠিক স্যুট করে না। চা খেলেই সেরে যাবে—কিরণ চায়ের পেয়ালা তুলে নিলে।

কিরণের দিকে দুটি আশ্চর্য সুন্দর চোখ মেলে কালো মেয়ে কৃষ্ণা চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর ডাকল, বাবা, শোনো?

—কী, মা?

—একটু উঠে এসো এদিকে।

সত্যব্রত চেয়ার ছেড়ে ঘরের দিকে চলে গেলেন। আর চায়ে চুমুক দিতে দিতে সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদে, কিরণের মাথাটা একটু একটু করে ঝুঁকে পড়তে লাগল টেবিলের ওপর। কপালে ঘাড়ে সেই তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাটা তাকে যেন একটা অচেতনার দিকে টানতে লাগল, বাইরে থেকে চাঁপার উগ্র সুগন্ধ যেন ক্লোরোফর্মের কাজ করতে লাগল।

ঠিক কতক্ষণ কাটল খেয়াল নেই হঠাৎ সত্যব্রতর গলার আওয়াজে সে চমকে উঠল।

—একি, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে আপনার:

চমকে কিরণ সোজা হয়ে বসল। বললে, সত্যব্রতবাবু, এবার তবে উঠি।

সত্যব্রত বললেন, এত রাত্রে না খেয়ে আপনাকে যেতে দিচ্ছে কে ?

—সে কি—খেয়ে যাব ?

সত্যব্রত হাসলেন ঃ কৃষ্ণার তাই হুকুম। আপনাকে আটকে রাখতে বলেছে।

—না—না, ওসবের দরকার নেই, আর একদিন হবে বরং।—কিরণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে ঃ অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি যাই।

সত্যব্রত কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বারন্দায় বেরিয়ে এল কৃষ্ণা।

—রাত হয়েছে, তাতে কী! খেয়ে এখানেই থাকবেন আজ।

—এখানে ?

যাবেন তো সেই মেসে, খাওয়া জুটবে কিনা তাও সন্দেহ। একটা রাত আমাদের এখানে থাকলে মহাভারত আপনার অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

—কিন্তু তোমাদের অসুবিধে করে—

—অসুবিধে আমাদের কিছুই নেই, বাড়তি ঘর আছে বাড়িতে। কিন্তু আপনার যদি কষ্ট হয়, সে কথা আলাদা।

সত্যব্রত বললেন, আর কষ্ট হলেই বা কী। এত রাতে অতদূরে যাওয়ায় চাইতে কোনোমতে একটা রাত এখানে কাটিয়ে দিন।

কিরণ প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু মাথার মধ্যে সেই যন্ত্রণা—সারা শরীরে সেই দুঃসহ অবসাদ। আবার ঝুপ করে সেই চেয়ারটার ওপর বসে পড়ে বললে, তবে তাই হোক—আজকে উপদ্রবই করা যাক আপনাদের ওপর।

॥ পঁচিশ ॥

যত্ন করে কী কী খাইয়েছিল কৃষ্ণা, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বাণীব্রতের মা চাপা গলায় সস্নেহে মধ্যে মধ্যে কি বলেছিলেন, খাওয়ার কিছু নেই বলে বারবার করে কী ক্ষোভ জানাচ্ছিলেন সত্যব্রত—কিরণ ভালো করে সেগুলো অনুভব করে নি, শুনতেও পায় নি। শুধু মাথার যন্ত্রণা আর খানিক বিস্বাদ ক্লান্ত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

তারপর শোবার পালা। বাণীব্রতর সেই ঘরটিতেই—যেখানে প্রথম দিন এসে সে বসেছিল। সেই কৃষ্ণার আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবি, শেল্‌ফে টেবিলে বইপত্র, সেই ডোম-শেপের টাইমপিস ঘড়িটা, কিরণের সম্মানে বিছানায় দুগ্ধশুভ্র একটি চাদর, বালিশে নতুন তোয়ালে।

কৃষ্ণা ঘরে এসেছিল কিরণের সঙ্গে। কিরণ শুধু একবার বলেছিল, আমি তো বাণীব্রতর ঘর দখল করলুম, ও এসে কোথায় শোবে?

—অনেক জায়গা আছে—কৃষ্ণা হেসেছিল: আপনাকে ভাবতে হবে না। রাতে আপনার জল লাগে কিরণদা? দিয়ে যাব?

—না।

—ঘরে আলো থাকবে?

—না। আলো থাকলে আমি শুতে পারি না।

—তা হলে আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন। কোনো দরকার হলে আমায় ডাকবেন।

—দরকার হলে ডাকব। কিন্তু দরকার হবে না।

কৃষ্ণা মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, জোর করে আটকে রেখে আপনাকে খুব কষ্ট দিলুম না, কিরণদা?

—হ্যাঁ, খুব কষ্ট দিয়েছ। কিন্তু এখন আর সেজন্যে দুঃখ করতে হবে না। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো গে—যাও।

কৃষ্ণা একটু হাসল। বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, দরজা বন্ধ করে আলোটা নিবিয়ে দিন।—নিজেই কপাট দুটো টেনে দিয়ে চলে গেল।

আড়ষ্ট পায়ে এগিয়ে কিরণ আলোটা নিবিয়ে দিলে, দরজার খিল তুলে দেবার উৎসাহও সারা শরীরের সে আর খুঁজে পেল না। তারপর টলতে টলতে এসে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়।

তলিয়ে গেল একটা ঘোরের মধ্যে।

কিন্তু আচ্ছন্নতার ভাবটা বেশিক্ষণ থাকল না। অচেনা জায়গা অচেনা বিছানা—একটু একটু করে কিরণ সজাগ হয়ে উঠতে লাগল। মাথার যন্ত্রণাটা খানিক কমেছে—আধো-ঘুম আধো ঘুম-জাগার মাঝখানে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল সে।

চোখের পাতাটা মধ্যে মধ্যে খুলে যাচ্ছিল, অন্ধকার ঘরে টাইম-পিসটার জ্বলন্ত নীলচে ডায়াল আর কাঁটা দুটো ঝকঝক করে উঠছিল একমুঠো জোনাকির মতো। ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো মনে হচ্ছিল আর পুরোদমে ঘুমন্ত পাখাটা একটানা শোঁ শোঁ শব্দ করছিল—কিরণ থেকে থেকে অনুভব করছিল যেন সে অন্ধকার একটা সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনে তার নিরবচ্ছিন্ন ঢেউয়ের গজরানি।

সেই সমুদ্রের ওপর ফুটে উঠল ভবেশদার মুখ। তাঁর মৃত্যুর ছবি। একবারের জন্যে কিরণ নিজেকে প্রশ্ন করল, এরপর ভবেশদার স্ত্রী ছেলেমেয়ের কী হবে, কে খেতে দেবে তাদের? সারা জীবন ধরে ভবেশদা নিজের সাহিত্যের সত্যে অবিচল ছিলেন বলে দেশের মানুষ নিশ্চয় কৃতজ্ঞ হয়ে একটা ফাণ্ড তৈরি করবে আর উদ্যোগী হয়ে চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কার কার কাছে যাওয়া যাবে প্রথম? তারাশঙ্কর? প্রেমেন্দ্র মিত্র? বনফুল? গোপাল হালদার? বিষ্ণু দে?

ছবিটা বদলে গেল। অন্যমনস্ক জীবনানন্দ ট্রাম লাইনের পাশে পাশে ঘাসের ওপর পা ফেলে চলেছেন। তাঁর মগ্ন চোখের তারায় আশ্চর্য আলো জ্বলছে একটা।

'জয় অস্ত সূর্য, জয়, অলখঅরুণোদয়, জয়।'

একটা ট্রাম ছুটে আসছে পেছন থেকে—জীবনানন্দ দেখতে পাচ্ছেন না—ধাক্কা লাগল, ছিটকে পড়ে গেলেন। কিরণ চিৎকার করে উঠল—দেখা গেল, আর একদিক থেকে হাহাকার করে ছুটে আসছেন শর্মিলা।

একটা তীব্র আঘাত যেন তারও মাথায় এসে লেগেছে এমনি-ভাবে চমকে, সম্পূর্ণ জেগে উঠল কিরণ। জীবনানন্দের মৃত্যু, ভবেশদার মৃত্যু। ভবেশদা জীবনানন্দের মতো বড়ো নন—কিন্তু সব নিষ্ঠাবান শিল্পী-সাহিত্যিকের মৃত্যুই কি একই অপঘাত ধারায়? দুটো চোখকে সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে, একমুঠো জ্বলন্ত জোনাকির মতো ঘড়িটার নীলচে ডায়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বোবা যন্ত্রণায় কিরণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

এর মধ্যে শর্মিলা এল কোথা থেকে? জীবনানন্দের সঙ্গে সঙ্গে কি বাংলা রোমান্টিক কবিতারও সমাপ্তি? কৃষ্ণচূড়ার দিনগুলোর সঙ্গে 'শঙ্খমালা'র কোথাও কি কোনো মিল আছে?

'এ পৃথিবী একবার পায় তারে,
পায় নাকো আর?'

'শঙ্খমালা' শুধু একবারের জন্যেই আসে, তারপর চিরদিনের মতো হারিয়ে যায় নীল সমুদ্রের অতলে। ভালোই হল, শর্মিলার সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি।

এতক্ষণে আর একটা উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠল কিরণের। মাথার সামনে খোলা জানালা দিয়ে দুটো জিনিস একসঙ্গে এসেছে ঘরের ভেতরে। খানিকটা শীর্ণ জ্যোৎস্না আর মদির চাঁপার গন্ধ। পাখার হাওয়ায় জ্যোৎস্নাটা যেন একটু একটু করে কাঁপছে, আর

চাঁপার গন্ধের উচ্ছ্বাস ঢেউয়ের মতো তার চারদিকে এসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

আরো কিছুক্ষণ জীবনানন্দ, ভবেশদার মৃত্যু, চাঁপার গন্ধ আর বনলতা সেন তার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। যেন একটা স্বচ্ছ-জল পাহাড়ী নদীর তলায় বালির ওপর শবের মতো শুয়ে আছে —আর তার ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে একটা স্রোত—তাতে তারার ছায়া, আকাশের ছায়া, রাত্রিচর পাখির ডানার ছায়া, ডাঙা থেকে ঝুঁকে পড়া একটা ফুলন্ত গাছের আধফোটা মঞ্জরীর ছায়া। তারপর চেতনাটা অরো স্পষ্ট হয়ে উঠল, শরীরে মনে সেই বিস্বাদ অনুভূতিটা আবার ফিরে এল, বোবা-যন্ত্রণায় কপালের রগ দুটো দপদপ করতে লাগল, কিরণ উঠে বসল।

না—ঘুম তার আর আসবে না।

টাইমপিস্ ঘড়িটায় রাত আড়াইটে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কৃষ্ণা জল রেখে যেতে চেয়েছিল, এক গ্লাস থাকলে ভালোই হত। কিরণ বিছানা ছেড়ে নেমে এল। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

এখানে জ্যোৎস্না উদার, চাঁপার গন্ধ আরো উতরোল। বাইরেটা নিঃশব্দ, সামনের ছাড়া-ছাড়া নোংরা মাঠ আর দূরের তালগাছগুলো এখন মায়াময়। দরজার বাইরে পা দিয়ে কিরণ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওই দিকটাতেই ভবেশদার বাসা। বড়ো ছেলেটি তো শ্মশানে গেছে—বাকি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভবেশদার স্ত্রী কী করছে এখন?

—আপমি ঘুমোন নি কিরণদা?

কিরণ চমকে উঠল। বারান্দার ওদিকে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে। পরনে সেই ডুরে শাড়িটি—দুটি কানে, হাতে ঝিকমিক করছে সোনার বিন্দু। এই রাত্রে, এই জ্যোৎস্নায়, তার ক্ষীণ শরীরটি বাইরের পৃথিবীর চাইতেও মায়াময়, আরো, অনেক বেশি অবাস্তব।

কিরণ নিজেকে সামলে নিলে তৎক্ষণাৎ। বললে, তুমিও তো জেগে আছো দেখছি।

—একেবারে জেগে নেই। ঘুমিয়ে নিয়েছি একটু। তারপরে মনে হল, বাণী এখনো শ্মশান থেকে ফেরে নি, এসে ডাকাডাকি করবে, তাই বারান্দায় এসে বসেছি। কিন্তু আপনার কী হয়েছে বলুন তো ?—কৃষ্ণা কাছে এগিয়ে এল, মমতা ঝরে পড়ল স্বরে : সেই মাথার যন্ত্রণার কষ্ট হচ্ছে এখনো ? ঘরে গিয়ে শোবেন চলুন, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

কিরণ আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণার দিকে তাকালো। বাড়ি ঘুমে নিঃসাড়, কোথাও একটি মানুষ জেগে নেই, অথচ কত সহজে—কত বিশ্বাসে কৃষ্ণা কথাটা বলতে পারল। মনে পড়ল কৃষ্ণার দেওয়া সেই রাইটিং কেসটি, তার সেই স্কেচ, তলায় ছোট করে লেখা : 'লহো প্রণাম।' এমনভাবে প্রণাম করতে পেরেছে বলেই তো এত সহজে এই সেবাটুকু সে দিতে চাইল।

কৃষ্ণা আবার বললে, খুব কষ্ট হচ্ছে, না কিরণদা ?

—না, কোনো কষ্ট হচ্ছে না।—কিরণ হাসল : আমি বেশ আছি। বোসো, বাণীব্রত না আসা পর্যন্ত দুজনে মিলে গল্প করা যাক।

—কিন্তু রাত জেগে আপনার শরীর খারাপ করবে না ?

—লেখককে বহু রাতই জাগতে হয়। ফ্লোব্যারের কথা জানো ?

কিরণ একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিল। কৃষ্ণা চামড়া বাঁধানো একটা বেতের মোড়া নিয়ে বসল তার পাশে। জ্যোৎস্নায় তার সরল-উজ্জ্বল চোখ দুটো আরো গভীর হয়ে উঠল : ফ্লোব্যারের নাম শুনেছি, কিছু পড়ি নি। আপনি বলুন আমাকে।

বাইরের কুশ্রী ন্যাড়া মাঠ, শকুন-বসা দিনের বীভৎস তালগাছ-গুলো, এই জ্যোৎস্নায় আর চাঁপার গন্ধে এখন আর এক পৃথিবীতে চলে গেছে। এই রাত্রির সঙ্গে কৃষ্ণচূড়ার সে স্বপ্ন-জাগরের কিছু

মিল আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মিল নেই। এই রাতে কিরণ আর এক নারীর স্পর্শ পেল। শ্রদ্ধা যাকে অপরূপ করে তোলে, যার চোখের সামনে নিজের সমস্ত তুচ্ছতাকে বিসর্জন দিয়ে মহৎও মহীয়ান হয়ে ওঠবার আকুলতা জাগে। শর্মিলার ক্ষেত্রে কি ভুল করেছিল কিরণ? আকাঙ্ক্ষার রঙ দিয়ে কৃষ্ণচূড়াকে আরো বেশি রাঙাতে গিয়েই কি সে তাকে হারালো? শর্মিলার শ্রদ্ধা থেকে সরে গিয়ে নেমে এল এক প্রবঞ্চকের ভূমিকায়? নইলে কৃষ্ণা আর শর্মিলার চোখ একাকার হয়ে যেত?

কৃষ্ণা আবার বললে, কী ভাবছেন কিরণদা?

মাথার একগোছা চুলকে একবার সজোরে নাড়ে কিরণ, যেন সমস্ত অসংলগ্ন চিন্তা আর বিকারকে সে সংযত করতে চাইল। তারপর বললে ফ্লোব্যারের সব চাইতে বিখ্যাত উপন্যাসের কথা জানো? মাদাম বোভারী।

—নাম শুনেছি, পড়ি নি।

—ফ্লোব্যার ছিলেন স্টাইলের মাস্টার। লেখায় কোথাও একতিলও খুঁত থাকে, সে তিনি সইতে পারতেন না। উপন্যাসটা লিখতে লিখতে হয়তো একটি মনোমত শব্দ তিনি খুঁজে পেলেন না। ব্যস, রইল রাত্রের বিশ্রাম, রইল ঘুম—সারাটা রাত জেগে একটি শব্দের জন্যে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন।

কৃষ্ণা বললে, একেই তো বলে সাধনা।

—হ্যাঁ, এই হল সাহিত্যের তপস্যা। আর আমরা বাংলা দেশে—

কথার পরে কথা, আলোচনার পরে আলোচনা। একটি মুগ্ধা শ্রোত্রীর কাছে স্বগতোক্তির মতো নিজের চিন্তা, উপলব্ধি, সাহিত্যিক সত্যের কথাগুলো বলে যাওয়া। শর্মিলার কাছে এমন করে বলা যেত না—সেখানে শর্মিলাই বাধা হয়ে উঠত, তার উপস্থিতি ছড়িয়ে যেত রক্তের ভেতর, আকাঙ্ক্ষা এসে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ধরত,

এক মুহূর্তের জন্যেও ব্যক্তিমানুষ শর্মিলাকে ভোলা যেত না। কিন্তু কিরণের কাছে কৃষ্ণার কোনো ব্যক্তি-পরিচয় নেই—শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের সে যেন একটি একান্ত প্রতীক ; আর সেই প্রতীকের সামনে কিরণের শরীর-ব্যক্তিত্বও সম্পূর্ণ মুছে গেছে ; চিন্তায় কল্পনায়, সৃষ্টিতে সাহিত্যিক কিরণের সম্পূর্ণ সত্তা বাইরের জ্যোৎস্নার মতোই অবারিত ঔদার্যে মুক্তি পেয়েছে।

এ এক নতুন নারী—নতুন অনুভব—নতুন মুক্তি। যেন বহুকাল পরে অনেক অন্ধকার, অনেক গোলোক-ধাঁধা, অনেক জটিল বিশৃঙ্খলার চোরা-গলি পার হয়ে সে এক সূর্য-ওঠা সমুদ্রের পারে এসে দাঁড়ালো।

তারপর জ্যোৎস্নার রঙ আরো পাণ্ডুর হল। চাঁপার গন্ধ যেন ক্লান্ত শ্বাস ফেলতে লাগল। তখন শ্রদ্ধায়. বিশ্বাসে মুগ্ধতায় কৃষ্ণার চোখ-জোড়া দুটি নক্ষত্রের মতো কিরণের মুখের ওপর এসে স্থির হল।

কৃষ্ণা বললে, ইচ্ছে করে সমস্ত জীবন আপনার পায়ের কাছে বসে এ-সব কথা শুনি।

একটা মুক্ত প্রসন্নতা নিয়ে কৃষ্ণার দিকে তাকালো কিরণ।

—আমি আর কতটুকু জানি! আশীর্বাদ করছি দিকপাল অধ্যাপকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক, যে তোমাকে বুঝবে,তোমাকে সত্যিকারে সম্মান দেবে, তোমাকে—

কথাটা শেষ হল না। সেই বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় কিরণ দেখল, এক বারের জন্যে থর থর করে কেঁপে উঠল কৃষ্ণা, তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকল। একটা রুদ্ধ চাপা স্বর শোনা গেল, আপনার ও আশীর্বাদটা কোনো কাজে লাগবে না কিরণদা, আমার—আমার বিয়ে কোনোদিন হবে না।

কিরণ চমকে উঠল। জ্যোৎস্নার সমস্ত মায়া যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

—কেন কৃষ্ণা, কেন? তুমি কি বিয়ে করতে চাও না?

দু'হাতের ভেতরে মুখ গুঁজে তেমনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কৃষ্ণা। তারপর ধীরে ধীরে আবার মাথা তুলে তাকালো। চোখের ওপর তখন ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

—অপেনাকে সব বলতে পারি কিরণদা, আপনাকে বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই।—একবার থেমে প্রায় নিঃশব্দ স্বরে কৃষ্ণা বললে, ডাক্তার বলেছে, আমি—আমি কোনো দিন মা হতে পারব না। হতে গেলে আমি আর বাঁচব না।

কৃষ্ণা আর মুখ ঢাকল না। মাথাটা ধীরে ধীরে নুয়ে এল মাটির দিকে। আবার বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল তার চাপা গলার স্বর: না হলে অলক—

কথাটা আর শেষ হল না।

কে অলক, এ-কথা কিরণ আর জিজ্ঞেস করল না, জিজ্ঞেস করবার কোনো দরকারও ছিল না। শুধু বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় এই কালো মেয়েটির ক্ষীণ শরীরের দিকে তাকিয়ে রাশি রাশি স্নেহে আর করুণায় তার সমস্ত মন মন্থর হয়ে উঠল।

শুধু অস্পষ্ট স্বরে কিরণ বললে, তুমি সুখী হও কৃষ্ণা, তুমি সুখী হও। আমি চিরদিন এই কামনাই মনে মনে করব।

দূরে অনেকগুলো মানুষের ছায়া পড়ল, কানে এল কথার শব্দ। বাণীব্রতরা শ্মশান থেকে ফিরে আছে। কিরণ ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, এগিয়ে গেল ঘরের দিকে।

॥ ছাব্বিশ ॥

তিনমাস পরে অরবিন্দের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল কিরণ। সঙ্গে সঙ্গে এল অরবিন্দ।

ফুটপাথে নেমে অপরাধীর মতো অরবিন্দ বললে, তুমি কি আমায় ভুল বুঝলে সাহিত্যিক ?

কিরণ শীর্ণভাবে হাসল : না, দাদা।

বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশে একটা গাছের নীচে এসে দুজনে দাঁড়ালো।

সারাটা দিনের দারুণ গুমোটের পর দক্ষিণের হাওয়া ক্লান্ত অবসন্ন কলকাতার জ্বলন্ত শরীরে এখন বঙ্গোপসাগরের স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্য। গাছের পাতায় পাতায় খুশির কলতরঙ্গ। ছায়া-আলোর ঝিলিমিলি দুলতে লাগল দুজনের ওপর।

অরবিন্দ সিগারেট ধরালো একটা। কাশল বারকয়েক।

—তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা ওকে বোঝাতে ত্রুটি করি নি।

—জানি।

—মেয়েদের মন ঠিক—অরবিন্দ একটু থামল : ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। র‍্যাদার আন্‌ফ্যাদমেবল। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমার এই বোন প্রব্লেম চাইল্ড—ওর মেজাজের কূল-কিনারা কখনো পাওয়া যেত না। একটু বড়ো হলে অনেকটা শুধরে নিয়েছিল, মনে হয়েছিল, ভালো হয়ে গেছে। বাট দেয়ার ওয়াজ দ্য সীড—

—আজ আর এ-সব কথা আলোচনা করার কোন মানে হয় না, অরবিন্দদা।

—মানে হয়। ইউ হ্যাভ বীন চীটেড। আমরাই তোমাকে সুখী হতে দিই নি।

কিরণ বললে, উল্টো দিক থেকেই দেখা ভালো, অরবিন্দদা। আমার মেসে-মেসেই চিরটা কাল কেটেছে—নিজের মতো করে একা থাকার একটা অভ্যেসও হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রতিমারই। আমি ওকে সুখী করতে পারলুম না। অপরাধ আমার ভেতরেই ছিল, তাই। আমাকে সহ্য করতে পারল না।

অরবিন্দ কী বলতে যাচ্ছিল, বাস এসে পড়ল।

—আজ তা হলে চলি দাদা।

—এসো। কিন্তু খবর নিও মাঝে মাঝে, একেবারে ভুলে যেয়ো না।

—না—না।

বাসের দোতলায় উঠে পড়ল কিরণ। একেবারে সামনের দিকেই বসবার জায়গা পাওয়া গেল।

কলকাতার পথঘাট স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে দু'পাশ দিয়ে। একটা রাত্রি স্টিমারের মতো মনে হয়। পাকিস্তান হওয়ার আগে একবার ঢাকায় গিয়েছিল কিরণ—তারই স্মৃতি ভেসে উঠল। দু' ধারে গাছপালা, তীর, গ্রাম, মাঠের ছবি, থেকে থেকে জেগে উঠছে সার্চলাইটের আলোয়। দক্ষিণের হাওয়া এসে কিরণের চোখেমুখে আছড়ে পড়তে লাগল। এই কলকাতা যদি আজ রাত্রে পদ্মা হয়ে যেত।

সমুদ্র দূরে। পদ্মা আরো দূরে।

সেই পাহাড়ী নদীটির কাছে কি যাওয়া চলে আর? বিকেলের সোনা মুছে গিয়ে লালের রঙ পড়ল, লাল নিবে গিয়ে কাকের বুকের পালকের মতো সন্ধ্যা নামল। ওপারের বন ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। সেই লোকগুলো—যারা হাঁটুজল ভেঙে ওপারে কোন-দিকে চলে গেল, এখানো মাদলের শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের। এপারে একটি মেয়ের কি ক্যাকটাস খোঁজা এখনো শেষ হল না?

—টিকেট?

সেই নির্ভেজাল কণ্ডাক্টার। পয়সা বের করে দিয়ে অভ্যস্থ জবাব : কলেজ স্ট্রীট।

যে ক্যাকটাস খুঁজছে—সে খুঁজুক। কিরণ তাকে সন্ধ্যার আভায় একটুখানি দেখেছিল। চিনতে পারে নি; কৃষ্ণচূড়ার রঙ সকালের রোদে তার ছবি দেখিয়েছিল তাকে দেখতে দেয় নি। সেই ছবি তার প্রচ্ছদপট, সে নয়; সেই সন্ধ্যা তার আভাস—সে নয়। তার সম্পূর্ণ পরিচয় নিয়ে যে অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল, সেখান থেকে সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

একবার শুধু ভাগ্যের কৃপণ মুঠোটা—ভাগ্য? ওকথা কিরণ স্বীকার করে না। তবুও ভাগ্য ছাড়া কী আর? কৃষ্ণচূড়া থেকে অনেকদূরে সে তার মুঠিটা খুলে দিতে চেয়েছিল কিন্তু খুলল না। ভালোই হলো। কাছে পেলেও কি শর্মিলাকে সে দেখতে পেত? যা ছবি—যা ছায়া, মন কখনো কখনো তাকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারে। কিন্তু কাছে থেকেও যে অজানা থেকে যায়, তাকে না বোঝবার দুঃখের শেষ কোথায়?

এই-ই ভালো। সব ভালো।

জীবনটা স্রোতের মতো চলছিল—চলে যাবে। তার একটা বাঁকে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছিল ফুটুক; একটি বাঁধা ঘাটে সমস্ত রাত চাঁপার গন্ধ উঠেছিল, উঠুক। আর স্রোত এগিয়ে যাক সেই সমুদ্রের দিকে—যার কথা এখনো কেউ জানে না।

প্রতিমাও আর আসবে না।

চেতনা-অচেতনের গোধূলিতে সে বার বার হাতে চেপে রাখতো কিরণের: যেতে দেব না, কিছুতেই তোমায় যেতে দেব না। তুমি আমায় ছেড়ে গেলে আর এক মুহূর্তও বাঁচব না আমি।' তারপর যখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন—

তখন প্রতিমার মন আবার সেই বিরূপতার দিকে বয়ে চলল। কিরণকে সে আর সহ্য করতে পারে না।

অনেক বুঝিয়েছেন অরবিন্দের স্ত্রী। অরবিন্দও চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

'না—আর আমি ওখানে ফিরে যাব না।'

'কেন?'

'আমার ভয় করে?'

'কিসের ভয়?'

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকেছে প্রতিমা। বলেছে, আমি জানি না।'

'কিন্তু কিরণের যে কষ্ট হচ্ছে—'

'তা আমি কী করব?

'ওর জন্মে তোর কি কোনো—'

'না—ওর জন্যে আমার কিছু মনে হয় না।'

'তুই বাকি জীবনটা এ-ভাবেই কাটাবি?'

'কেন তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে?'—প্রতিমার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে একবার: আমাকে দুমুঠো খেতে দিতে বুঝি তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে দাদা? তা হলে আমায় তাড়িয়ে দাও, আমি যেদিকে খুশি চলে যাব, দরকার হলে পথে পথে ভিক্ষে করে খাব!

এর ওপর কোনো কথা চলে না। স্বাভাবিক হয়েও যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়, যার মনের সামনে এখনো সারি সারি ছায়ামূর্তির আনাগোনা, তাকে বেশি বিরক্ত করতে ভয় করে। সেই অচেতন জগতের সীমারেখাটা থেকে প্রতিমা এখনো বেশিদূরে এগিয়ে আসে নি। যে-কোন মুহূর্তে সে সেটা আবার পার হয়ে চলে যেতে পারে, পৌঁছে যেতে পারে তার সেই অন্ধকারের নিঃসঙ্গতায়।

অরবিন্দের স্ত্রী বলেছেন, 'কিরণের সঙ্গে একটু কথা বলবি নে?'

'কোন দরকার নেই।'

'এসে বসে আছে যে বেচারী।'

'থাকুক।'

'একবারটি বরং ডেকে দিই না তাকে ? তারও তো কিছু বলবার থাকতে পারে ?'

'আমার শোনবার কিছু নেই।

'তবু—'

'ও যদি এ ঘরে আসে তা হলে আমি রাস্তায় বেরিয়ে চলে যাব। নইলে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ব নীচে।

নিষ্ঠুরতম ঘৃণা কালো গ্রানিটের মতো স্থির হয়ে আছে। কিরণের জন্যে এতটুকু রন্ধ্র পর্যন্ত কোথাও নেই।

অরবিন্দ বলেছে, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলুম, গেট এ ডিভোর্স। এখন স্বচ্ছন্দে তুমি ওটা করে নিতে পারো। প্রতিমাও হয়তো আপত্তি করবে না। তোমার দিক থেকে সিমপ্যাথির কোনো কারণ নেই—দেখাই যাচ্ছে ম্যাল-আড্‌জাস্টমেণ্ট।'

কিরণ জবাব দেয় নি।

অরবিন্দ আরো বলেছে, এখন ও নর্ম্যাল হয়ে গেছে।—

নর্ম্যাল ? কিরণ হেসেছে একটুখানি। না—প্রতিমা স্বাভাবিক হয় নি। অথচ ওকে স্বাভাবিক বলে যে মনে হয় সেইটেই এর সব চাইতে নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি।

কিরণ বলেছে, 'না, ডিভোর্সের এখন দরকার নেই।'

'কী করতে চাও তাহলে ?'

'অপেক্ষা করব।'

'তুমি আশা করো, প্রতিমা একদিন তোমাদের কাছে ফিরে যেতে চাইবে ?'

'আশা করতে দোষ কী অরবিন্দদা ?'

'না, দোষ নেই, কিন্তু—' এই পর্যন্ত বলেই অরবিন্দও চুপ করে গেছে। 'কিন্তু'র উত্তর সে নিজেও আর খুঁজে পায় নি। এখন সব কিছুর জবাব এক প্রতিমাই দিতে পারে। কিন্তু কবে যে দেবে কেউ জানে না।

বাস বৌবাজারে এসেছে। কিরণ যেন এতক্ষণ মাথা নীচু করে ঝিমিয়ে চলেছিল—এইবার সোজা হয়ে উঠে বসল। চোখে পড়ল, পাশের সীট থেকে এক জোড়া চোখ সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে আছে। প্রকাশক ভদ্রলোক একজন।

—ঘুম ভাঙল কিরণবাবু?

—ঘুমোই নি।—কিরণ অপ্রতিভভাবে হাসল: ভাবছিলুম।

—ভাবছিলেন—চোখ বুজে? আমি সেই ভবানীপুর থেকে উঠেছি, দেখতেও পান নি।

কিরণ চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন, আপনাকে একটা খবর দিই। ভবেশদার সেই উপন্যাসটার কথা আপনার মনে আছে? 'নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা' যেটা আমরা ছেপেছিলুম?

—জানি। পড়েছি আমি। ভবেশদা দিয়েছিলেন আমাকে।

—বইটা খারাপ নয়—তবু একবারে চলে নি। কিন্তু একটা সিনেমা কোম্পানী ওটা কিনেছে তিন হাজার টাকায়।

কিরণের আচ্ছন্ন আড়ষ্ট মনটা খুসি হয়ে উঠল।

—এতো খুব ভাল খবর।

—ভালো খবর বইকি। টাকাটা আবার পুরো অ্যাডভান্স করে গেছে বৌদিকে। অথচ ভবেশদার লাকটা দেখুন—প্রকাশক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: বেঁচে থেকে কোনোদিন ভালো করে তুটো পয়সার মুখও দেখতে পেলেন না। ছ'মাস আগেও যদি এ টাকাটা পেতেন হয়তো এ যাত্রা তুঃখে কষ্টে বিনা চিকিৎসায় এমন করে মারা যেতেন না।

তা হলে বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চা করেও ভবেশদার কিছু আর্থিক স্বীকৃতি শেষ পর্যন্ত এল। কিন্তু বড্ড দেরিতে। তারপরেই কিরণের মনে হল, তাই কি? বেঁচে থাকলে কি গল্পটা বিক্রি হত? ভবেশদা হয়তো গোড়াতেই চটাচটি বাধিয়ে দিতেন, বলে বসতেন, সিনেমার নাম করে আমার গল্প নিয়ে যা খুশি করবেন, তা চলবে

না। আমি যে-ভাবে লিখেছি, সেই ভাবেই ছবি করতে হবে, একটা অক্ষরও ও থেকে বদলাতে পারবেন না।

হয়তো ভবেশদা না থেকেই ভালো হয়েছে। এই দুঃসময়ে বৌদির হাতে কিছু টাকা এল। জীবনে কে কতটা অপরিহার্য? মানুষ নিজের কাছেই নিজে মূল্যবান, তার থাকা-না-থাকার লাভ-ক্ষতি বিচার করবার ক্ষমতা অন্তত সে নয়। ভবেশদার মৃত্যুতে পরিবারটা পথে বসবে বলে মনে হয়েছিল, অথচ দেখা যাচ্ছে সেই মৃত্যুটাই পরিবারের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এল। সিনেমায় যদি বইটা উতরে যায়, তাহলে হয়তো আরো দু-একটা উপন্যাস ভবেশদার বিক্রি হয়ে যাবে। অথচ, ভবেশদা বেঁচে থাকলে তাঁর সিনিক রূঢ়তার সামনে কেউ হয়তো এগোতেই চাইত না।

প্রকাশক বললেন, আমাদেরও লাভ হল। ছবি হলেই বইয়ের কাটতি বাড়ে—কী বলেন?

—বাড়ে বইকি!

কিরণ উঠে দাঁড়ালো: চলি, নামতে হবে এবার। নমস্কার।

—নমস্কার-নমস্কার। সময় পেলে আসবেন আমাদের ওদিকে। একটা-আধটা বই যদি আমাদের—

—দেখব।

ঘরের দরজা খুলে দুখানা খাম পেলো কিরণ।

একখানা হিরন্ময়ের। সাংসারিক খবরাখবর। 'বৌমা এখন কেমন আছেন? তাঁহাকে বাড়িতে আনা যাইবে না? আমি ও তোমার বৌদি তাহাকে দু'-তিনখানা চিঠি দিয়াছি, জবাব পাই নাই।' 'চিঠির শেষে' 'সস্তায় কিছু ধানীজমি কিনিবার সুযোগ পাইয়াছি। যদি হাজার দুই টাকার ব্যবস্থা করিতে পারো—'

আর একখানা খামে ছোট একটি ফুলের স্কেচ। তার নীচে লেখা: 'আজ আমার জন্মদিন। আপনাকে প্রণাম পাঠালুম। কৃষ্ণা।'

॥ সাতাশ ॥

কিরণ লিখছিল।

'এখন রাত একটা। ডাকবাংলোটার সামনে যে তিনটে বড়ো বড়ো আমগাছ রয়েছে, দেখেছিলুম তাতে নতুন মুকুল এসেছে। তখন ভালো করে লক্ষ্য করি নি, এখনো আবছা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। এক টুকরো চাঁদ উঠেছে, তার আলোয় বাইরের সবটা গগনেন্দ্রনাথের সাদা-কালো ছবির মতো অপরূপ রহস্যময়। আজকে জানলা দিয়ে দেখা বাইরের জগৎটা একালের জটিল মনের মতো একরাশ সরীসৃপ রেখা নয়, বিকৃত অ্যানাটমির আতঙ্ক—এ সব মিলে একখানা ইমপ্রেশ্যনিস্ট ছবি। সেই ছবিটাকে আরো নিবিড়, আরো, আরো ঘন করে তুলছে আমের মুকুলের গন্ধ। নস্টালজিয়া! এমনি রাত্রি—এই গন্ধ—এই রাত জেগে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখা—ছেলেবেলার ছবি জাগিয়ে আনে—মাকে মনে পড়িয়ে দেয়।

আমের মুকুলের গন্ধ আসছে। আর একটা রাতের কথা মনে পড়ল। ভবেশদার মৃত্যু। একটা বিফল সন্ধ্যা। নার্ভের ওপর কী বীভৎস উৎপীড়ন! সেদিন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে চাওয়া স্নায়ুগুলোকে নিয়ে—চাঁপার উগ্র গন্ধে আমি কৃষ্ণাকে দেখেছিলুম। আমাকে সে শ্রদ্ধা করে। সেদিন রাত্রের সেই দুর্বল অবসরে মনে হয়েছিল প্রতিমা রইল সেই দুর্বোধ্য বেদনার আড়ালে, শর্মিলা মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার আকাশে—এই কালো রোগা মেয়েটিকে কি আমি বলতে পারি না—তুমি এসো, আমার ঘরে প্রদীপ জ্বালাও? কিন্তু দেখলুম, সে হয় না। মা হতে পারা না-পারা হয়তো বড়ো কথা নয়, কিন্তু বুঝতে পারলুম—শ্রদ্ধা যতই বড়ো হোক, অত ভার তার সইবে না। তা ছাড়া অলকদা—

কৃষ্ণা সুখে থাকুক। ছবি থাকুক, গান থাকুক। অলকদাও হয়তো ফিরে আসবে। বুঝবে, সন্তানের মা পাওয়ার চাইতেও কৃষ্ণাকে পাওয়া ঢের বড়ো। কিন্তু ও-সব কথা আমি ভাববার কে? পৃথিবীতে ক'জনের জন্যে আমি ভাবতে পারি?

আজ রাতে চাঁপার গন্ধ আমার হয়তো মনে আসত না; আমের মুকুল রাত্রির বাতাসকে যতই ভরে তুলুক, আমি ঘুমুতে পারতুম। সভাসমিতি আমার ভালো লাগে না, বক্তৃতা দেবার নামে গায়ে জ্বর আসে, তবু এরা জোর করেই টেনে আনল। সারা দিন সেই ঝঞ্ঝাটেই কেটেছে। ওরা সঙ্গ ছাড়ল রাত সাড়ে দশটায়। থাকার জায়গা দিয়েছে ভালো, বাংলোতে আজ আর কেউ নেই—ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিতে পারতুম কয়েক ঘণ্টা। আর ঘুমটাও দরকার ছিল, কারণ, কাল বেলা সোয়া সাতটার ট্রেনেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব।

তবু আমার ঘুম এল না। আজ আবার আমের মুকুলের সঙ্গে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, মহাকাল পাহাড়ের মাথায় সেই অচেনা হলুদ ফুলের রাশ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে হয়তো নামটা বলতে পারতেন)—সব মিশে একাকার হয়ে গেল। আবার এই বসন্তের বাতাস নেই কষায় গন্ধের উচ্ছ্বাস বয়ে আনল।

কতদিন কেটেছে? দু'বছর হতে চলল। আজ এখানে এমন করে শর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে জানত!

সভা শেষ হয়েছে। মফস্বলের যে-সব ছেলেমেয়ের কাছে লেখক-মাত্রেই সাহিত্যিক, তারা আমাকেও ঘিরে ধরেছিল অটো-গ্রাফের জন্যে। এমন সময় খবর এল, একজন ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ভদ্রমহিলা? এখানে কে আসতে পারেন? আশ্চর্য হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

হলের সামনে নিয়নের উজ্জ্বল নীলচে আলোয় শর্মিলা দাঁড়িয়ে।

ভুল হওয়ার কারণ নেই, তবু নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। শর্মিলাই আজ কৃষ্ণচূড়া হয়ে দেখা দিয়েছে। পরনে লাল শাড়ি, কপালে সিঁদুরের রক্তবিন্দু। মনে পড়ল, হলের মধ্যে প্রথম সারিতেই যেন এই লালের আগুন আমি দেখেছিলুম। কিন্তু তখন অনেক মানুষের ভিড়ে আমি ভালো করে চেয়ে দেখি নি, ভাবতেই পারি নি।

কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারলুম না। দেখলুম, শর্মিলার মুখ মাটির দিকে, সারা শরীরের সেই লালের আভা গালেও পড়েছে। বুঝতে পারলুম, খেয়ালের ঝোঁকে আমায় ডেকে পাঠিয়ে এখন লজ্জার চোখ তুলে চাইতে পারছে না।

বললুম, নমস্কার মিসেস—

বলেই ইচ্ছে করে থেমে গেলুম। শর্মিলা এবার জোর করে মুখ তুলল দু'গালে লালের আভা আরো ঘন হল। চাপা গলায় বললে, মিসেস ভৌমিক।

অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ চারদিক থেকে চেয়ে আছে জেনেও আমি বললুম, ভারি খুশি হয়েছি। তা হলে এখন এখানেই আছেন?

—হাঁ এখানেই উনি পোস্টেড।

—চাকরি?

—ছেড়ে দিয়েছি। ওঁর অসুবিধে হয়। তবে একটা থীসিসের কাজ করছিলুম—সেটা প্রায় শেষ করে এনেছি।

—খুব ভালো।—এই পর্যন্ত বলেই আমি থামলুম। আর কী বলা যেতে পারে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কি খুব দুঃখ পেলুম? না—মনের দিক থেকে সেই মুক্তিটা আমার আরো সহজ হল। যন্ত্রণা আমার যে ছিল না তা নয়, কিন্তু যে-সন্ধ্যায় কলকাতায় কথা দিয়েও আমি শর্মিলার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি, যন্ত্রণার শেষ পালা সেইদিনই তো আমার সারা হয়ে গেছে। তা ছাড়া নিজেকে আমি শর্মিলার আলোয় আর কৃষ্ণার শ্রদ্ধায় বারে বারে

যাচাই করে দেখেছি। প্রতিমা আমার জীবনে এসেও এল না —কোথা থেকে একটা অন্ধকারের দুর্গ এসে তাকে ঘিরে ধরল ; কিন্তু তবু প্রতিমার কাছে থেকে আমি দূরে যেতে পারি না। তার একটা অদৃশ্য বন্ধন আছে যাকে অনুভব করা যায় না, অনেক-খানি পর্যন্ত তাকে ছাড়িয়ে যাওয়াও চলে, কিন্তু তারপরেই প্রতিমার আকর্ষণ কঠিন হয়ে ওঠে—নাড়ীতে নাড়ীতে টান পড়ে। প্রতিমা পাথরের প্রতিমার মতোই মৃত-নিষ্ঠুর হয়ে থাকুক, তবু আমাকে ঘুরে-ফিরে তারই কাছে চলে আসতে হবে।

না হলে, অরবিন্দদার ডিভোর্সের প্রস্তাব আমি রাজী হই নি কেন ? কোথায় আমার বাধছিল ? এ এক অদ্ভুত কেতুক, জীবনের কৌতুক। একে ট্রাজেডী বলব, না কমেডী বলব জানি না।

এখন আমি কী বলব শর্মিলাকে ? কী আলাপ করব তার সঙ্গে ? কোনোদিনই কি তার সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলুম ? সেই যে মাটিতে প্রকৃতি তার খেয়ালী ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়, যেখানে দু' টুকরো রঙিন মেঘ ভেসে উঠেছিল—দুটো স্বপ্ন এসে মিলেছিল মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে। তারপর মেঘ মিলিয়ে গেল আকাশে—স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন হল জীবনের জাগরণে। তা-ই হয়।

আমি আর কী বলতে পারি শর্মিলাকে ? কী আমার বলবার আছে ?

আরো সহজ হয়ে উঠলুম। মনে পড়ল, ভদ্রতার ব্যাপারটা এখনো সম্পূর্ণ সারা হয় নি।

বললুম, শ্রীযুক্ত ভৌমিক কোথায় ? আলাপ করিয়ে দিলেন না তাঁর সঙ্গে ?

—উনি এখানে নেই। —শর্মিলার চোখ দুটো যেন একবার আলো হয়ে উঠলো, কিন্তু তার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। শর্মিলা বললে, ট্যুরে গেছেন।

—ওঃ!

—আমি জানতুম না—আমার না বোঝা সেই আলোটা চিক চিক করে শর্মিলার দু' চোখে জ্বলতে লাগলঃ এখানে আপনি সাহিত্য-সভায় আসছেন। ঘর থেকে বিশেষ আমি বেরুই না। হঠাৎ বিকেলে দেখলুম, বাইরের সামনে দেওয়ালে একটা পোস্টার পড়েছে। আপনার নাম। তাই বক্তৃতা শুনতে চলে এলুম।—একটু থেমে বললে, বেশ বলেছেন।

আমি হাসলুমঃ বেশ বলি নি। বক্তৃতা আমার আমার আসে না। তবু কমপ্লিমেণ্টটা নিলুম।

—কমপ্লিমেণ্ট? —শর্মিলা যেন একবারের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর বললে, বক্তৃতা শুনতে আমি তো আসি নি। লেখককেই চিনতে এসেছিলুম। তা পেরেছি।

—চিনেছেন?

—আগেই চিনতুম। তবু নতুন কিছু পেলুম। এতক্ষণে শর্মিলা হাসলঃ দেখলুম রুক্ষ নিষ্ঠুরতার ওপর একটুখানি মমতার ছায়া নেমেছে।

আমি চমকে উঠলুম। আবার বুকের মধ্যে ঢেউ উঠল, মন বলতে চাইল, তুমি জানো না—এ তোমারই ছায়া, তুমিই রোদে-পোড়া একরাশ নিষ্ঠুর মাটির ওপর কৃষ্ণচূড়ার ছায়া দুলিয়েছো। হয়তো কিছু বলেও ফেলতুম, এমন সময় অ্যামপ্লিফায়ারের ঘোষণা শোনা গেলঃ এইবারে আমাদের জলসা আরম্ভ হচ্ছে। প্রথমেই আপনাদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতগেয়ে শোনাচ্ছেন কলকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী—'

কর্মকর্তাদের দু-একজন এগিয়ে এলেন সামনে।

—ভেতরে যাবেন না কিরণদা? গান আরম্ভ হচ্ছে।

—তোমরা যাও, আমি আসছি।

করিডোর খালি হয়ে খেল। জলসার আকর্ষণে সবাই ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে। এখন আমি আর শর্মিলা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত,

আগেকার চঞ্চলতা আমার দূর হয়ে গেছে। যে কৃষ্ণচূড়ার রঙ একদিন দুজনকে অনেক কাছে টেনে এনেছিল, আজ শর্মিলার বেশে-বাসে সেই রঙই আমাদের দুটো সমুদ্রের দু'পারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন আমি আর শর্মিলা নির্জনে মুখোমুখি দাঁড়ানোর আর কোনো মানে নেই, কোনো মানে থাকতে নেই।

শর্মিলা বললে, আপনি অনেক রোগা হয়ে গেছেন।

বললুম, বয়েস বাড়ছে।

—শুধু বয়েসের জন্যে?—সেই মেয়েদের চিরকালের কণ্ঠস্বর: নিজের শরীরের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না!

—আমি বেশ আছি।

অ্যামপ্লিফায়ারে হার্মোনিয়ামের অল্প অল্প আওয়াজ আসছে। গানটা চেনা-চেনা ঠেকছে, এখনো সম্পূর্ণ ধরতে পারছি না। শর্মিলা আবার চোখ নামালো: একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—নিশ্চয়।

—আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

—অনেকটা সেরে উঠেছেন।—এর বেশি কী আর আমি বলতে পারি। আর বলেই বা কী হবে?

—তাই বুঝি?—শর্মিলা আবার আমার দিকে চাইল, সান্ত্বনা আর সহানুভূতিতে ভরে উঠল চোখ দুটো: এতো খুব ভালো কথা। এবার আপনি সুখী হবেন।

—দুঃখ আমার কোনদিনই নেই।

—নেই? —শর্মিলা চুপ করে রইল। বুঝতে পারলুম আমার কথা ও বিশ্বাস করে নি। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! আমি সুখী না দুঃখী, সে খবর তো নিজেও জানি না!

অ্যাম্প্লিফায়ারে অনুশীলিত মধুঝরা কণ্ঠের গান উঠল:

'আমার পরান যাহা চাই তুমি তাই,
তুমি তাই গো—'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গানটা আমরা শুনতে লাগলুম। শর্মিলা কী ভাবছিল জানি না, কিন্তু এই সহজ সরল রোমান্টিক গানটা আমার বুকের ভেতরে কেঁপে কেঁপে বেড়াতে লাগল।

'আমি তোমাবে পেয়েছি হৃদয়-মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো—'

শর্মিলা যেন হঠাৎ জেগে উঠল। হাতের দিকে চেয়ে বললে, আটটা। একটু দূরে আমাদের বাসা, যেতে রাত হয়ে যাবে। আর একটা কথা বলব ?

—নিশ্চয়, বলুন।

—কাল সকালে আমাদের ওখানে চা খেতে আপনার আপত্তি আছে ?

—আপত্তি ছিল না, কিন্তু সোয়া সাতটার ট্রেনে আমি কলকাতায় ফিরব।

—চা আমি ছ'টাতেই রেডি করে দেব।

হাসলুম ঃ কী দরকার কষ্ট করে ?

—কষ্ট ? —শর্মিলা হাসল ঃ ওটা তো ভদ্রতার দোহাই। কিন্তু কয়েকটা কথা বোধ হয় আমার জানবার ছিল। শর্মিলার স্বর গভীর হয়ে এল ঃ হয়তো খানিকটা ভুল বোঝা—

বললুম, ভুল আমি বুঝি নি। যা জানবাব আমার মন আগেই জেনেছে। এই তো ভালো হল সব চাইতে।

—কে বলতে পারে, কী ভালো হল ! আমি যে কেন—

শর্মিলা আবার থেমে গেল। ভেতর থেকে গান আসছে ঃ

'তোমারি বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস—'

নিজের কথা আর শেষ করল না শর্মিলা। বললে, আমি যাই।—তারপরেই নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল।

আমি বললুম, একি—একি !

লাল শাড়ি, লাল সিঁদুরের কথা একবারের জন্যে ভুলল শর্মিলা। মাথা তুলে, দু'চোখে সেই আশ্চর্য আলো ছড়িয়ে বললে, তোমায় কিছু দিতে পারি নি—সাহস ছিল না। তুমি আর এক পৃথিবীর মানুষ। তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

বললুম, শর্মিলা, আমিও ভুলব না।

শর্মিলা আর দাঁড়ালো না। দেখলুম বড়ো বড়ো পায়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে লন পেরিয়ে। অ্যাম্প্লিফায়ারে বাজতে লাগল ঃ

'তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও
আমি যত দুখ পাই গো—'

তারপর আমি গানের জলসায় এসে বসলুম।

চাঁদ অস্ত গেছে। রাত ক'টা এখন? চারটে? বাইরে থেকে ভোরের হাওয়ায় আমের মঞ্জরীর গন্ধ স্নিগ্ধ আর কোমল হয়ে এল। দুঃখ? দুঃখ আমি পাই নি। আমার কঠিন রৌদ্রজ্বলা মাটিতে কৃষ্ণচূড়ার ছায়া কেঁপে তাকে শীতল করে দিয়েছে। নইলে কি কৃষ্ণাকেই আমি চিনতে পারতুম? নইলে কি আমি অপেক্ষা করতে পারতুম প্রতিমার জন্যে বুঝতে পারতুম তার যন্ত্রণার রূপ?

আমি একখানা উপন্যাস লিখব, 'কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।' জানি না, এ যুগে তার পাঠক আছে কি না। তবু সে উপন্যাস আমায় লিখতেই হবে।

নিজের মুক্তির জন্যেই আমি লিখব॥'